সাহিত্য ও শিল্পলোক

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ



এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড.

SAHITYA O SILPALOK
An up-to-date Discussion on Art & Literature
By Prof. Dwijendra Lal Nath

Price : Rs. 5/- (Rupees five) only

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৮
মূল্য টা. ৫·০০ (পাঁচ টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট :
শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা

মুদ্রাকর :
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড্ আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

পরম বিদ্যোৎসাহী

নীরব সাহিত্য ও শিল্পরসিক

শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর রায়

শ্রীচরণেষু—

"There is no better deliverance from the world of strife 'than through art' "

—*Goethe*.

"Life is art, art life."—*Rabindranath*.

ভূমিকা

সাহিত্য ও শিল্প-জিজ্ঞাসা মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা। সভ্যতার আদি যুগ থেকে এ পর্যন্ত প্রশ্নমনস্ক মানুষের মনে এ সম্পর্কে নিত্য নতুন জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছে। সে জিজ্ঞাসার উত্তরও তাঁরা খুঁজেছেন শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায়। এ সমস্ত আলোচনার ফলে শিল্প ও সাহিত্যের স্বরূপ এবং আদর্শ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এলেও এ বিষয়ে শেষ কথা এখনও উচ্চারিত হয়নি—কোনদিন হবে কিনা তাও বলা যায় না। এর কারণ শিল্প ও সাহিত্যের উৎস মানুষের মনে এবং সমাজ-ক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণাও পরিবর্তিত হয়। যুগ-সমস্যা এসে শিল্পী ও সাহিত্য-স্রষ্টার মনকে বিব্রত করে। চির যুগের মানব-জীবনের রহস্যের অতলে প্রবেশ করবার শক্তি হারিয়ে স্রষ্টার খণ্ডিত দৃষ্টি তখন সাময়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। সৃষ্টির মান এভাবে স্বভাবতই নিম্নাভিমুখী হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আপাত-সমৃদ্ধির অন্তরালে এ অবতরণের চিহ্ন অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। সেজন্য এ গ্রন্থের 'শিল্পলোক' অধ্যায়ে শিল্পের মান কি হওয়া উচিত আলোচনার সাহায্যে তা নির্ণয় করবার প্রয়াস পেয়েছি। 'সাহিত্য' বিষয়ক আলোচনা পর্যায়ে আমার ধারণাকে আরো স্পষ্ট করে তুলবার চেষ্টা করেছি। আমার মতামতের সঙ্গে সকলে যে একমত হবেন—এমন আশা করিনা। তবে 'নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বী'র দিকে দৃষ্টিপাত করেই আমি একটি যুক্তিসিদ্ধ ধারণায় পৌছাতে চেষ্টা করেছি। আমার চিন্তার যদি কোন সত্য মূল্য থাকে তা পাঠক-পাঠিকার চিন্তাকে নিশ্চয়ই জাগ্রত করবে—এ ভরসা আছে বলেই এ পুস্তক প্রকাশে সাহসী হয়েছি।

দীর্ঘকাল ব্যাপী এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীদীপক চৌধুরী এবং শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। নানাভাবে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত, অধ্যাপক শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং তরুণ অধ্যাপক গোবিন্দ দাস। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে মামুলি ধন্যবাদ দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

কবি শশাঙ্কমোহন সেনের পত্নী শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন তাঁর 'স্বামীকথার' পাণ্ডুলিপি এবং শশাঙ্কমোহনের জীবন-সম্পর্কীয় কতগুলো উপকরণ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন বলে তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থের সব ক'টি রচনাই বাঙ্‌লা দেশের এবং বাঙ্‌লা দেশের বাইরের কয়েকটি বিখ্যাত সাহিত্যপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সে সমস্ত পত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীবিমলেন্দু গুহ তৎপরতার সঙ্গে আমার প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করেছেন বলে তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সানন্দে এবং সাগ্রহে এ গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ না করলে এবং এ. মুখার্জী কোম্পানীর বিচক্ষণ কর্মী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায় মুদ্রণ কার্যকে ত্বরান্বিত না করলে এ বই এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করত কিনা সন্দেহ। এঁদের দুজনকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এ পুস্তকে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেল—সেজন্যে পাঠক পাঠিকার নিকট মার্জনাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকে সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত করবার চেষ্টা করব—একথা বলাই বাহুল্য।

৬।২ ডব্লু। ১এ উমাকান্ত সেন লেন,
কলিকাতা-৩০

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৮ : ৫ই জুলাই, ১৯৬১

বিষয়-সূচী

শিল্পলোক

১

শিল্পসৃষ্টির উৎস ও শিল্পের স্বরূপ

মানুষ বাস করে দুই জগতে। এক—বস্তুবিশ্ব; দুই—অন্তর্জগৎ। বস্তুবিশ্বে মানুষ জৈব প্রয়োজনে অর্জন করে, ভোগ করে, ক্ষতি স্বীকার করে, নতি স্বীকার করে। নিরন্তর সংগ্রাম-প্রয়াসের মধ্যে সেখানে মানুষের পরিচয় প্রত্যক্ষ। প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম শুধু পশুর নয়, মানুষেরও জীবনধর্ম। সম্ভোগলিপ্সাতেও মানুষ পশুধর্মী। এদিক দিয়ে মানুষ ও পশুতে তফাত খুব কমই দেখা যায়। জৈব প্রয়োজনবোধকে যে মানুষ জীবনে প্রাধান্য দেয়, স্থূল ভোগাকাঙ্ক্ষার জগতে সে পশুর মতোই বেঁচে থাকে, আবার মৃত্যুতেও পশুর মতোই হারিয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে, মানুষের সকল কর্মের উৎস মুখ্যতঃ তিনটি। প্রথম—মানুষের আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয়—আবেগ, তৃতীয়—জ্ঞান। আকাঙ্ক্ষা মানুষকে শক্তিমান করেছে অভিপ্রেত বস্তুলাভের আশায়, আকাঙ্ক্ষা মানুষকে করেছে কর্মোন্মাদ। এই কর্মচঞ্চলতার প্রধান প্রেরণা মানুষের প্রচ্ছন্ন যৌনতৃষ্ণা। কিন্তু আবেগের বাস মানুষের হৃদয়ে, মানুষের রক্তের সচলতায়। মানুষের অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষার যৌথ জৈবিক অভিব্যক্তি এই আবেগ। অপর পক্ষে বুদ্ধির আশ্রয় মানুষের মস্তিষ্ক। এই বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ লাভ করে। বুদ্ধি যে শুধু স্থূল আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক তা নয়, বুদ্ধি মানুষের মনের বিকাশেরও সহায়ক হতে পারে।

এই তিনটি প্রবৃত্তিই মানুষের মধ্যে বর্তমান। তবে ব্যক্তিবিশেষে এই বিভিন্ন প্রবৃত্তির প্রাধান্য দেখা যায়। সমাজের মধ্যে এমন লোক দেখা যায়, তারা যেন আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। সঞ্চয়ের নেশায় তাদের জীবন সদাচঞ্চল, ঐহিক সমৃদ্ধি-লাভের জন্য তারা আত্মনিমগ্ন, বাহ্য আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং বিলাসের মোহে তাদের মন যেন জ্বলতে থাকে। প্লেটোর মতে কারুশিল্পজগতে (industry) যাঁরা আধিপত্য করেন এবং সে জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা এই শ্রেণীর লোক। আর এক শ্রেণীর

লোক দেখা যায় যাঁরা স্বভাবতঃ আবেগপ্রবণ ও সাহসী। জীবনযুদ্ধে তাঁরাও সংগ্রামতৎপর, কিন্তু তাঁরা জানেন না তাঁদের সংগ্রামের লক্ষ্য কী। জয়পরাজয় তাঁদের কাছে অর্থহীন, শুধু সংগ্রামেই তাঁদের আনন্দ। সঞ্চয়প্রবৃত্তি তাঁদের নেই, শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মাদনার মধ্যেই তাঁরা জীবনের সার্থকতা খোঁজেন। পৃথিবীর জলে স্থলে যাঁবা যুদ্ধকর্মে লিপ্ত তাঁরা হলেন এই শ্রেণীর মানুষ। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের লক্ষ্য জ্ঞানসঞ্চযে ও ধ্যান-তন্ময়তায়। বস্তুসঞ্চয় বা জয়ের দিকে তাঁরা লক্ষ্যহীন। কেনাবেচার জগৎ বা যুদ্ধক্ষেত্রেব দিকে না ঝুঁকে নির্জন চিন্তায় তাঁবা থাকেন আত্মনিমগ্ন। ক্ষমতা-অর্জনে তাঁরা উদাসীন, তাঁদেব প্রযাস হল সত্যলাভ। প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের জগতে তাঁবা অনাবশ্যক—এঁরা হলেন জ্ঞানী মানুষ।

রাজনীতি-দর্শন আলোচনায় প্লেটো মানবপ্রকৃতিব এই ত্রিবিধ উপাদানের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিভাগ কবলেও, বাজনীতি-নিবপেক্ষ সমাজ-জীবনেও এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দেখা যায়। প্লেটো-বর্ণিত যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামী মানুষ ছাড়া সমাজে আব এক শ্রেণীব আবেগপ্রবণ মানুষ দেখা যায়—তাঁবা হলেন শিল্পী। তাঁরাও সংসাবে জযপবাজয়ের প্রতি উদাসীন, জগৎকে দেখেন তাঁরা নিজেদেব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে। সেই জগৎ ও জীবন তাঁদের স্পর্শকাতর মনের উপব যে ছাযা ফেলে, সেই ছাযায় তাঁরা আনন্দেব মায়ালোক সৃষ্টিতে ব্যস্ত। এই মায়ালোক একদিকে ইন্দ্রিযনিভব, আব একদিকে ইন্দ্রিয়াতীত। কায়া ও ছায়ায় মিশ্রিত এই আনন্দময় জগৎ-ই হল আর্টেব বা শিল্পেব জগৎ।

প্লেটোব শিষ্য আবিস্টটল শিল্পসৃষ্টিব উৎস নির্ণযের প্রযাস পেয়েছেন মনঃসমীক্ষাব সাহায্যে। আরিস্টটল বলেন, মানুষেব সৃজনধর্মপ্রবণতা এবং আবেগধর্মী প্রকাশব্যাকুলতা থেকেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হযেছে। বাস্তবিকই, বাস্তবেব অনুকৃতিতেই তো শিল্প রূপ লাভ করে। শিল্প হল স্বভাবেবই দর্পণ। স্বভাবের অনুকরণ করে মানুষ আনন্দ পায়, এই প্রবৃত্তি নিম্নশ্রেণীব প্রাণীদেব মধ্যে নেই। তবে স্বভাব-অনুকৃতি-প্রসঙ্গে একটা জিনিস স্মরণযোগ্য : শুধুমাত্র বাইরের রূপপ্রকাশেই শিল্পের সার্থকতা নয়, শিল্পেব প্রধান লক্ষ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থকে ফুটিয়ে তোলা। কারণ বস্তুসত্যেব প্রকাশ—বস্তুব বাইবের আকৃতিতে বা খুঁটিনাটি-পরায়ণতায় নয়, বস্তুর আসল পবিচয় তার অন্তর্নিহিত অর্থে।

শিল্পের উৎস ও স্বরূপ সম্পর্কে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায় শেলিং-এর (Schelling, ১৭৭৫—১৮৫৪) দর্শনে। শেলিং বলেন, বিষয় এবং বস্তুদৃষ্টি যখন

একাত্মতা লাভ করে তখনি হয় শিল্পের জন্ম। মন্ময়তার সঙ্গে তন্ময়তা, অনুভবের সঙ্গে যুক্তি, অবচেতনের সঙ্গে চেতনকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত করে শিল্প। অতএব শিল্প জ্ঞানলাভের একটা প্রকৃষ্ট উপায়ও বটে। কিন্তু শিল্পসৃষ্টিকে সম্ভব করেছে মানুষের সৌন্দর্যদৃষ্টি। এই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কি? শেলিং বলেন, সীমার মধ্যে সীমাহীনের অনুভূতিতেই সৌন্দর্যের প্রকাশ। শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যও হল সীমাতিরিক্ততা। এই সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্ভব শিল্পীর জ্ঞানে নয়, নৈপুণ্যে নয়, শিল্পীর অন্তরের সৌন্দর্যচেতনাই প্রেরণা দেয় শিল্পীকে সৌন্দর্যের মূর্তি-নির্মাণে।

শিল্পসৃষ্টির উৎস সম্পর্কে দার্শনিক ক্রোচের মতামত খুবই উল্লেখযোগ্য। ক্রোচে বলেন, শিল্প মূর্তিতে অভিব্যক্ত হওয়ার উপরেই নির্ভরশীল। স্রষ্টার কল্পনাই এই শিল্পসৃষ্টির মূলে। কল্পনাপ্রিয় মানুষ বহির্বিশ্বে যে দৃশ্য দেখে সে-দৃশ্যই হল শিল্পরচনার উপাদান। কল্পনা শিল্পরচনার নিয়ন্ত্রী শক্তি, চিত্র শিল্পের সম্পদ। বস্তুবিশ্লেষণ শিল্পের কাজ নয়, বস্তুকে সত্য বা কাল্পনিক বলে রায় দেওয়াও শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, বস্তুর গুণ নির্ণয় কিংবা সংজ্ঞা নির্ণয় করাও শিল্পসৃষ্টির এলাকার বাইরে। শিল্পের প্রধান পরিচয় হল বস্তুস্বরূপের অনুভব এবং শিল্পরচনার মাধ্যমে তার প্রকাশ। মানুষের মনে কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে আগে, চিন্তা পরে। বস্তু সম্পর্কে একটা কাল্পনিক ধারণায় আসার আগে সেই বিষয়ে চিন্তা জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব শিল্পকর্মকে বলা যায় মানসিক মূর্তিনির্মাণ-প্রক্রিয়া, এবং এই প্রক্রিয়া মানুষের যুক্তিনির্ভর বস্তুধারণার পূর্ববর্তী। মানুষের মনে যুক্তিবাদ সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্বে মানুষ কল্পনা করতে শিখেছে, এবং যখনই এই কল্পনাবৃত্তি মানবমনে জন্মলাভ করেছে তখনই মানুষ শিল্পীর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বস্তুকে তার স্বরূপে অনুভব করবার জন্যে যে দৃষ্টির প্রয়োজন, দার্শনিক ক্রোচে তাকে বলেছেন অন্তর্দৃষ্টি —Intuition। এই অন্তর্দৃষ্টিকে ক্রোচে Vision বলেও অভিহিত করেছেন। ক্রোচের মতে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় এই Intuition বা Vision-এর সাহায্যে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, কল্পনার সাহায্যে মানসিক মূর্তিনির্মাণ-প্রক্রিয়া যদি শিল্পের নিদর্শন হয়, তাহলে সে শিল্প মানুষ দেখবে কি করে, উপভোগ করবে কি করে? সেজন্য শিল্প-সমালোচকেরা প্রশ্ন করেছেন—"Does the essence of art lie only in the conception, and not in the externalization?" বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যায় মানুষের কথার চাইতে তার চিন্তা বা অনুভূতি অনেক বেশী সুন্দর। সুতরাং শিল্পীর অনুভূতি শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হবার পূর্বে মানুষ বুঝতে পারে

না সেই অনুভূতি সুন্দর কি অসুন্দর। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা খুবই সহজ, শিল্পের প্রকৃত পরিচয় মানুষের অনুভূতি বা কল্পনায় নয়, সেই অনুভূতি বা কল্পনার রূপপ্রকাশে।

শিল্পের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় টলস্টয়ের ধারণা খুব স্বচ্ছ। টলস্টয় বলেন : কথার দ্বারা মানুষ একে অপরের নিকট নিজের মনের ভাব বা চিন্তা প্রকাশ করে—এই কথার সাহায্যেই মানুষে মানুষে মিলন ঘটে। অনুভূতিশীল মানুষ যখন নিজের অনুভূতি অপরের অন্তরে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন তখনি হয় শিল্পের সৃষ্টি। অতএব শিল্পকে বলা চলে—Art of Transmission বা Communication। অন্তর্জগৎ বা বস্তুবিশ্বের অভিজ্ঞতা মানুষের মনকে আলোড়িত করে। সেই আলোড়িত মনে সৃষ্টি হয় অনুভূতি। এই অনুভূতি মানব-জীবনের সম্পদ। এই অনুভূতিকে মানুষ প্রকাশ করে কখনও অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে, কখনও রেখা ও রঙের সাহায্যে, কখনও শব্দের সহায়তায়, আবার কখনও বা বাক্যের মধ্য দিয়ে। যখনই এই সমস্ত উপায়ের মাধ্যমে একের অনুভূতি অপরের অন্তরে আবেদনের সৃষ্টি করে তখনই হয় শিল্পের জন্ম।

সেজন্য শিল্পকে টলস্টয় অভিহিত করেছেন 'human activity' বা মানবিক ক্রিয়া বলে। এই মানবিক ক্রিয়ার লক্ষ্য হল, কতগুলি চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্যে নিজের আন্তর অনুভূতিকে অপরের নিকট প্রকাশ করা। শিল্পীর সেই অনুভূতি যখন অপরের চিত্তে সংক্রামিত হয় এবং মানসিক অভিজ্ঞতার রূপ নেয় তখনি হয় শিল্পের সৃষ্টি।

মানবসভ্যতার আদিযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিল্পের উৎস ও স্বরূপ বিশ্লেষণে জগতের মনীষী ও শিল্পস্রষ্টারা ক্লান্তিহীন উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্প কী—এই জটিল প্রশ্ন তাঁদের সকলের মনকেই আলোড়িত করেছে। তাঁরা সকলেই নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো শিল্পের ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যায় শিল্পের স্বরূপ শিল্পামোদীদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু মানুষের অনুভূতিনির্ভর সূক্ষ্ম মানসক্রিয়া সম্পর্কে শেষ কথা এখনও বোধ হয় উচ্চারিত হয়নি। মানুষের অনুভূতিলোক এখনও যেমন মানুষের কাছে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি, তেমনি শিল্প-জিজ্ঞাসাও মানুষের অনন্ত-জিজ্ঞাসা। মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজিজ্ঞাসাও ব্যাপকতর এবং জটিলতর আকার ধারণ করেছে।

আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথও শিল্পের উৎস ও স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁর বহু বিচ্ছিন্ন রচনায়। তবে কোথাও তিনি শিল্পের সংজ্ঞানির্ণয়ে অগ্রসর হননি। শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর পরিণত চিন্তা অনুস্যূত হয়ে আছে—*Personality, Religion of Man, The Meaning of Art* (Dacca University Lecture, 1925), 'সাহিত্যের পথে' এবং 'যাত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থে। এই সমস্ত আলোচনায় শিল্পসৃষ্টিব উৎস ও স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন ব্যাপক, অপরদিকে তেমনি গভীব। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে আর্ট ও জীবন একই সূত্রে বিধৃত—Life is art, art life। অর্থাৎ জীবন হল সুসমঞ্জস সৃষ্টি, এবং যে সৃষ্টিতে সুসমতার পবিচয় আছে তাই হল শিল্প। ববীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষেব 'অহং' বা ব্যক্তিবোধ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ নয়। এই 'অহং' অদৃশ্য মিলনসূত্র রচনা করেছে রূপ ও অরূপের মধ্যে, আত্মবোধ ও বিশ্ববোধেব মধ্যে। এই প্রসাবিত 'অহং' বা ব্যক্তিবোধ যখন কোনো সৃজনধর্মী ক্রিয়ায অভিব্যক্তি লাভ করে তখনি হয় আর্টের সৃষ্টি।

আর্টের সৃষ্টি সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ আরও বলেন, মানুষের অনুভূতিলোকে যে আবেগ সঞ্চাবিত হয তার ভাণ্ডার এত অফুবন্ত যে তা অনেকসময প্রয়োজন-বোধের সীমা ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই প্রয়োজনাতিবিক্ত আবেগেব প্রাচুর্যকে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন—'Surplus in Man'। এই উদ্‌বৃত্ত আবেগের প্রেবণা থেকেই শিল্পেব জন্ম। শিল্পসৃষ্টির উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কবি-শিল্পী ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে একমত। ওযার্ডসওয়ার্থও বলেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত তীব্র অন্তবাবেগ যখন মুক্তিলাভেব জন্য অধীব হয়ে ওঠে তখনই হয় আর্টের সৃষ্টি—It is the spontaneous overflow of powerful feelings. শিল্পসৃষ্টিব উৎস যে emotional energy বা emotional force তার উদ্ভবতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্লেষণধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই মননশীল বিশ্লেষণ রবীন্দ্রমনকে যুক্ত করেছে জগতেব চিন্তাশীল শিল্পতাত্ত্বিকদেব মনের সঙ্গে। 'পারস্যনালিটি' গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন,—মানুষের আবেগময় শক্তির উৎস মনের সেই প্রদেশ যেখানে আমাদের সৃষ্টি এবং আনন্দ অনুভবের শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত এবং অর্ধসচেতন। এই স্বতঃস্ফূর্ত ও অর্ধসচেতন আনন্দানুভবের শক্তিকেই নন্দনতাত্ত্বিক ক্রোচে বলেছেন—অন্তর্দৃষ্টি বা vision।

শিল্পসৃষ্টির উৎস সম্পর্কে আর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বভাবশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে একটি অহেতুকী আনন্দানুভূতি থেকে হয় শিল্পের জন্ম। আর্ট বা শিল্পসৃষ্টিকে তাই তিনি বলেছেন 'অপ্রয়োজনের আনন্দ'। কাব্যোচ্ছ্বসিত ভাষায় শিল্পসৃষ্টিকে তিনি বলেছেন 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়', অর্থাৎ নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত অবকাশের মধ্যে শিল্পী আপন মনের ডানা মেলে দিয়ে সুর ও রূপের সাহায্যে সৃষ্টি করতে পারেন এক অপূর্ব মায়ালোক। এই মায়ালোকই হল আর্টের জগৎ, রসের জগৎ। শিল্পসৃষ্টিব উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা আধুনিক বস্তুবাদী সমালোচকদের নিকট যথেষ্ট সমালোচনাব কারণ হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, শিল্পসৃষ্টির উৎস সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথেব এই ধাবণাব ভিতর জগতের বাস্তব অবস্থা থেকে একটা অনুভূতিগ্রাহ্য সৌন্দর্যলোকে পলায়নী মনোবৃত্তিই সূচিত হয়েছে। তাঁদের মতে শিল্পীও সামাজিক জীব। সমাজেব উত্থান-পতনের সঙ্গে শিল্পীর জীবনও জড়িত। অতএব সমাজ-জীবনেব জাগ্রত সমস্যা শিল্পীর অনুভূতিকে জাগ্রত কবে নিত্য নব সৃষ্টিকর্মে। এই নবসৃষ্টিব জগৎ-ই হল শিল্পলোক। অন্য কথায শিল্পলোক হল তবঙ্গিত সমাজ-জীবনেবই বসরূপ। সমাজ-চিন্তাবিমুক্ত নির্লিপ্ত অবকাশের স্বপ্নে যে শিল্প রচিত হয়, সেই শিল্পে স্রষ্টাব মানসবিলাসেরই প্রাধান্য। সে শিল্প জীবননির্ভর নয়।

এ ধবনের সমালোচনার উত্তব পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথেব শিল্পব্যাখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, Art is expression. অর্থাৎ বহির্বিশ্ব মানবমনেব উপর নিত্যনিযত যে ছাযা ফেলে, তার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব শিল্প নয়। সেই জগৎ-চেতনা যখন বঙে বেখায় সঙ্গীতে ভঙ্গীতে বসরূপ লাভ কবে তখনি হয় শিল্পের সৃষ্টি। শিল্প হল সেই বস্তু যাব ভিতর 'মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপেব ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকে ফিরাইয়া দেখিতেছে' ('রূপ ও অরূপ')। সেজন্য 'পাবসন্যালিটি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'in art, man reveals himself, and not his objccts.' শিল্প হল মানুষের সেই আত্মপ্রকাশের বাহন। এই উদাব আত্মপ্রকাশের মধ্যেই মানুষ অনুভব করে নিজের সম্প্রসাবণশীল আত্মার অপরিসীম বিস্তৃতি। এই বিস্তৃতি বা মুক্তিতেই মানুষের আনন্দ। এই মানবিক আনন্দানুভূতিব সুষম অভিব্যক্তিকে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—Creation, আর এই মুক্তি ও আনন্দচেতনাহীন অপবাপর সৃষ্টিকর্মকে তিনি বলেছেন—Construction।

শিল্পের উৎস ও স্বরূপ সম্পর্কে এর চাইতে সুচিন্তিত ব্যাখ্যা এযুগে বোধ হয় আর দেখা যায়নি।

শিল্পের অভিমুখিতা

দার্শনিক কাণ্ট্ বহির্বিশ্বকে অনুভব করতেন নিজের চেতনা ও ধারণার সাহায্যে। ইচ্ছার প্রাধান্যটুকু বাদ দিলে সোপেনহাওয়ারের জগদ্বিষয়ক জ্ঞানও কাণ্টের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুণী উঠল রাঙা হয়ে'—রবীন্দ্রনাথের এই অনুভবের মধ্যেও জগতের সঙ্গে মানুষের মনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। সোপেনহাওয়ারের মতে জগতের পরিচয় রয়েছে যেমন মানুষের চেতনা ও ধারণার মধ্যে, তেমনি মানুষের পরিচয়ও অনুস্যূত হয়ে আছে মানুষের ইচ্ছাশক্তির (will) মধ্যে। ইচ্ছাভিত্তিক এই বাঁচা অবশ্য জীবন-চেতনাহীন পশুর মত তুচ্ছতার মধ্যে বাঁচা নয়, সে বাঁচা—বৃহৎ জীবনের সুবিপুল বিস্তৃতির মধ্যে, বৃহত্তর উপলব্ধির জগতে।

এই প্রসারিত জীবনচেতনা মানুষকে স্থূল আকাঙ্ক্ষামুক্ত করে উত্তীর্ণ করেছে প্রজ্ঞার (wisdom) জগতে। মানুষের এই প্রজ্ঞার পরিচয় মানুষের দর্শনে, প্রতিভায়, শিল্পে, ধর্মে এমনকি মানুষের মৃত্যু-সম্পর্কীয় ধারণায়। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি (will) তাহলে মানুষের জ্ঞানও মানুষের ইচ্ছাশক্তির আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে যায় একথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না। সোপেনহাওয়ারের মতে শিল্পের কাজ হল মানুষের জ্ঞানকে ইচ্ছাশক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, মানুষকে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিবোধ বা বস্তুজগতের স্বার্থবোধ-বিমুক্ত করে তার মনকে অভিপ্রায়হীন নির্বিশেষ সত্যোপলব্ধির ধ্যানে উত্তীর্ণ করা।

প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ শিল্পের অভিমুখিতা এই ধ্যানতন্ময় সত্যোপলব্ধির দিকে। বিজ্ঞানেরও লক্ষ্য সার্বজনীন সত্যলাভ, কিন্তু সেই সত্যের মধ্যে আছে বহু খুঁটিনাটির পরিচয়। শিল্পের লক্ষ্য বিজ্ঞানের প্রায় বিপরীত। বিশেষ কোন বস্তুর রূপ-প্রকাশে শিল্পের অভিব্যক্তি, কিন্তু সেই বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের পরিচয় উঠবে প্রত্যক্ষ হয়ে। শিল্পসৃষ্টি সেই পরিমাণে সার্থক যেই পরিমাণে তার মধ্যে থাকে প্ল্যাটোনিক আইডিয়া বা ব্যঞ্জনার পরিচয়। সেজন্যে মানুষের চিত্র অঙ্কনে শিল্পী অগ্রসর হবেন আলোকশিল্পীর বাস্তবানুগত্য নিয়ে নয়, বরং বিশেষ কোন

মানুষের চরিত্রে মানবজীবনের যে সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে সেই রূপের প্রতিফলনে। সাহিত্যেও দেখা যায় চরিত্রসৃষ্টি সেই পরিমাণে সার্থক যে পরিমাণে সে চরিত্রে নির্বিশেষ মানুষের পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। উদাহরণ স্বরূপ সোপেনহাওয়ার উল্লেখ করেছেন Faust এবং Marguerite অথবা Quixote এবং Sancho Panza-র চরিত্র।

প্রকৃতির দৃশ্য দেখে বা কাব্য পাঠ করে অথবা চিত্রশিল্প দর্শন করে আমরা মনে একটা অহেতুক আনন্দ উপলব্ধি করি। এই আনন্দের উৎস কোথায়? আমরা যখন ব্যক্তিগত অভিপ্রায় থেকে বস্তুবীক্ষাকে বিশ্লিষ্ট করে বস্তুকে তার স্বরূপে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি তখনি হয় আনন্দের সৃষ্টি। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করা যাক। একজন শিল্পী যখন গঙ্গার ধারে উপস্থিত হন তখন তাঁর সমস্ত চেতনা উদ্দীপ্ত হয় গঙ্গার নৈসর্গিক শোভা দেখে। গঙ্গার সচলতা বা উন্মুক্ত প্রসারের মধ্যে যে সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা আছে তা তাঁর কল্পনাকে জাগ্রত করে। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে একজন ভ্রমণকারীর নিকট স্রোতোমুখর গঙ্গা একটি প্রবল বাধাস্বরূপ। গঙ্গার ধারে উপস্থিত হয়ে গঙ্গার শোভা দেখে ভাবোচ্ছ্বসিত হবার তার অবকাশ নেই। সে সেই নদী দ্রুত অতিক্রম করবার জন্যে অনুসন্ধান করে একটা স্টীমলঞ্চ্ বা নৌকা। এ রকম কোন বাহন না পেলে সে অনুসন্ধান করে একটি সেতুর। এই তিনটির যে কোন একটি পেলেই তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়। এখানে গঙ্গার ধারে উপনীত ব্যক্তির লক্ষ্য সাক্ষাৎ প্রয়োজনসিদ্ধি-কামনা।

অপরপক্ষে শিল্পের অভিমুখিতা হল ব্যক্তিস্বার্থ-নিরপেক্ষ বস্তুবীক্ষায়। এরূপ দৃষ্টির ফলেই শিল্পীর মনে জাগে এমন একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি যার প্রভাবে সে পরিবেশকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে বস্তুর সৌন্দর্যধ্যানে তন্ময় হয়। একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক। সূর্যাস্তের দৃশ্য পরম রমণীয়। কিন্তু কারাগৃহে আবদ্ধ একজন অপরাধীর চোখে সেই মনোরম দৃশ্য কোন মোহের সঞ্চার করে না। প্রাসাদের ভোগতন্ময় মানুষের মনেও প্রকৃতির সে অনাবিল রূপতরঙ্গ বিশেষ কোন সুকুমার অনুভূতির সৃষ্টি করে না। কিন্তু সৌন্দর্যসচেতন শিল্পী কারাগৃহ থেকেই হোক কিংবা রাজপ্রাসাদ থেকেই হোক, যখনই সূর্যাস্তের এই অপরূপ রূপ ও রঙের খেলা দেখেন তখনই অন্তরে অনুভব করেন এক বিপুল উন্মাদনা। সেই রূপতরঙ্গকে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে চিরন্তন রূপ দেবার আগ্রহে তাঁর পরিবেশ তখন তাঁর কাছে

অর্থহীন। নির্লিপ্ত ধ্যানতন্ময় দৃষ্টি দিয়ে বস্তুকে স্ব-রূপে দেখে তার অনুভূতিগ্রাহ্য সৌন্দর্য আহরণ করাই তখন শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য।

(সোপেনহাওয়ার মনে করেন মানুষের এই ব্যক্তিগত ইচ্ছাবিমুক্ত অনুভবই (will-less perception) মোহমায়া বিস্তার করে অতীত ও সুদূরে অবস্থিত বস্তুর প্রতি এবং শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে দূরের বস্তুকে আমাদের নিকটে এনে দেয়। শুধু সুদূরের বস্তু কেন, অনেক বিরোধীভাবাপন্ন বস্তুকেও যখন আমরা ব্যক্তিগত ইচ্ছাবিমুক্ত ধারণা দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করি তখন সে বস্তুও আমাদের নিকট প্রিয়রূপে দেখা দেয়। ধরা যাক ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডির লক্ষ্য জীবনের বিষাদান্ত পরিণতি দেখানো। এরূপ পরিণতি দুঃখের অনুভূতিতে পূর্ণ। অথচ জীবনে আমরা কেউ দুঃখ পেতে চাইনে। কিন্তু আমরা যখন ট্র্যাজিক গল্প-উপন্যাস বা নাটক পড়ি কিম্বা রঙ্গমঞ্চে ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখি তখন অন্তরে অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করি। এর কারণ কী?

এর কারণ, ট্র্যাজেডি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত থেকে আমাদের মনকে মুক্ত করে আমাদের দুঃখানুভূতিকে স্থাপন করে জীবনের একটা বৃহত্তর পটভূমিকায়। ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তন এবং ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিশ্বমানবিকতার উপলব্ধির মধ্যেই আর্টের সার্থকতা। এই বৃহত্তর উপলব্ধিই মানুষের মনের গ্লানি মুছিয়ে দিয়ে মানবমনকে উত্তীর্ণ করে একটা উন্মুক্ত-প্রসার আনন্দময় জগতে। শিল্প-সৃষ্টির সান্নিধ্যে উপনীত মানবমনের বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন দার্শনিক স্পিনোজা: 'in so far as the mind sees things in their eternal aspect it participates in eternity.' মনীষী গেটেও তাঁর একটি রোমান্সে মানুষের মনের মুক্তি-প্রসঙ্গে শিল্পের ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: "There is no better deliverance from the world of strife 'than through art'.")

শিল্পের অভিমুখিতা সম্পর্কে দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের সঙ্গে স্পিনোজা ও গেটের মতামতও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

শিল্পোৎকর্ষের লক্ষণ

শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ নির্ভর করে মুখ্যতঃ শিল্পী-মনের সংক্রামণ শক্তির (power of infection) উপর। যে শিল্পের সংক্রামণশক্তি যত পরিমাণে বেশী সেই শিল্প

সে পরিমাণে সার্থক। শিল্পী-অন্তরের অনুভূতি যেমন বিচিত্র তেমনি সেই অনুভূতির গুণ ও পবিমাণগত প্রকারভেদও লক্ষণীয়। শিল্পী যাঁর অন্তরের যে অনুভূতি অপরেব অন্তরে সঞ্চাব করে দেন সে অনুভূতি খুব তীব্র হতে পারে, খুব মৃদুও হতে পারে, খুব গভীর হতে পারে, খুব তবলও হতে পারে; সূক্ষ্মও হতে পারে, আবাব স্থূলও হতে পারে। সেই অনুভূতির উৎসে থাকতে পারে শিল্পীর স্বদেশচেতনা বা আত্মপ্রীতি, নিযতি বা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ, প্রেমের উন্মাদনা (যেমন দেখা যায অনেক উপন্যাসে), উচ্ছৃঙ্খল সম্ভোগচেতনা (যেমন দেখা যায অনেক ছবিতে), দুর্দান্ত সাহসিকতা, আনন্দোল্লাস (যেমন নাচ দেখে), হাস্যরস (যেমন কৌতুকপূর্ণ গল্পে), সৌন্দর্যচেতনা বা বিস্ময়বোধ। কিন্তু কথা হচ্ছে শিল্পী-অন্তবেব কি ধবনেব এবং কোন্ অনুভূতি সার্থক রসসৃষ্টির সহায়ক?

এই প্রশ্নে এসে জগতেব শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সমালোচকেবা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন শিল্পসমালোচক বলেন, অনুভূতি গভীব হোক বা তরল-ভাবাপন্ন হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। শিল্পসৃষ্টিব উৎকর্ষ নির্ভবশীল অনুভূতির প্রকাশে। অর্থাৎ সার্থক শিল্পেব প্রধান পবিচয় তাব বিষযবস্তুতে নয়, তার রূপাঙ্গিকে, তাব উপভোগ্যতায়। এই বিষয়ে যে বিতর্ক আছে সে সম্পর্কে আলোচনায অগ্রসব না হযে বর্তমানে অনুভূতির উৎস সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। হৃদয়ের যে প্রদেশে অনুভূতি জন্মলাভ কবে সে উৎসে যদি একটা অনাবিল আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্তি না থাকে, সে অনুভূতিব উৎসে থাকে যদি একটা অস্থিবতা, অবিশ্বাস, চাঞ্চল্য,—তা হলে সে-অনুভূতিব প্রকাশে আনন্দতন্ময় শিল্পসৃষ্টি হবে কী করে?

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী টলস্টয় বলেন, যা মানুষের ধর্মচেতনা (Religious perception) থেকে উদ্ভূত হয় তাই হল অনুভূতি। ধর্মচেতনা বলতে অবশ্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মচেতনাকে লক্ষ্য কবেন নি। যে অনুভূতি মানুষের চিত্তে সৎ, চিৎ ও আনন্দের ভাব সৃষ্টি করে, তাই হল টলস্টয়ের মতে ধর্মচেতনা। শিল্পী-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র এবং ববীন্দ্রনাথও এ-সম্পর্কে টলস্টয়ের সঙ্গে একমত।

জীবন-শিল্পী টলস্টয় প্রকৃত শিল্পকর্মের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন এ-ভাবে: প্রথমতঃ, যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে শিল্প সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে স্রষ্টার থাকবে

একটা অন্তরঙ্গ মনের যোগ। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পকর্মের অঙ্গসজ্জা এবং সুষমা হবে চিত্তাকর্ষক। তৃতীয়তঃ, যে বিষয়কে শিল্পী শিল্পকর্মে রূপ দেবার প্রয়াস পাবেন তার প্রতি থাকবে তাঁর গভীর ভাবতন্ময় প্রীতি।

টলস্টয়-বর্ণিত শিল্পোৎকর্ষের এই সমস্ত লক্ষণের ভিতর সর্বজনীন সত্যের ইঙ্গিত আছে সন্দেহ নেই। তথাপি নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে দেখা যায়। টলস্টয় তাঁর সুবিখ্যাত '*What is Art ?*' গ্রন্থে তিনটি মুখ্য মতবাদের উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ, একদল শিল্পতাত্ত্বিকের মতে শিল্পকর্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে বিষয়ের গুরুত্বের উপর। অর্থাৎ যে বিষয় মানুষের কাছে কল্যাণধর্মী, নীতিপ্রদ এবং শিক্ষামূলক, শুধুমাত্র সে সমস্ত বিষয় নিয়েই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। উক্ত মতবাদীদের মতে ধর্মনীতি সমাজ এবং রাজনীতি-সম্পর্কীয় সত্যকে যখন চমৎকার চিত্তাকর্ষক সজ্জায় সজ্জিত করা হয় তখনি তাকে বলা যায় শিল্পকর্ম।

শিল্পোৎকর্ষ সম্পর্কে দ্বিতীয় মতবাদীরা হলেন সৌন্দর্যতাত্ত্বিক বা কলাকৈবল্য-বাদী। তাঁদের মতে সত্যিকারের শিল্পকর্মের মূল্য নির্ভর করে আঙ্গিক-সৌন্দর্যের উপর। এঁরা মনে করেন, শিল্পের প্রকৃত শিল্পত্ব নির্ভর করে প্রকাশের মনোহারিত্বে। এই মতবাদীদের মতে শিল্পসৃষ্টির প্রধান উপকরণ হল শিল্পীর টেক্‌নিক। এই টেক্‌নিকের সাহায্যে শিল্পী এমন শিল্পমূর্তি সৃষ্টি করেন, যা দেখলে বা পড়লে পাঠকের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দর ফুল বা ফল, কোন নগ্নমূর্তি বা নৃত্যের দৃশ্য—যা দেখলে মানুষের মনে একটা তৃপ্তির ভাব আসে—তাই হল শিল্পকর্ম।

শিল্প সম্পর্কে তৃতীয় মতবাদীরা হলেন—বাস্তববাদী। এঁদের মতে শিল্পের প্রকৃত পরিচয় হল বাস্তবের যথাযথ রূপ-প্রকাশে। বাস্তবজীবনের প্রতিবিম্ব যখন কোন সৃষ্টিকর্মের উপর পড়ে তখনি তাকে বলা চলে প্রকৃত শিল্পকর্ম। এঁরা বলেন, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বা প্রকাশের সৌন্দর্যের উপর শিল্পসৃষ্টি ততটা নির্ভরশীল নয়, যতটা নির্ভরশীল বাস্তবের তথ্যনিষ্ঠ রূপ দেবার ক্ষমতার উপর।

উক্ত তিনটি মতবাদের মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে যে আংশিক সত্য নিহিত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই সমস্ত মতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, কারুশিল্পের মত চারুশিল্পও নিত্য-নিয়ত সৃষ্টি করা সম্ভব এবং বাস্তবক্ষেত্রে দেখাও যাচ্ছে উৎকর্ষের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হোক বা না হোক, শিল্পজগতের সৃষ্টির পরিমাণ

ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। শিল্পের আদর্শ সম্পর্কে উক্ত তিনটি মতবাদ এত বিরোধীভাবাপন্ন যে প্রকৃত শিল্পকর্মের সঙ্গে মূল্যহীন শিল্পসৃষ্টির বিভেদরেখা টানা সাধারণ শিল্পামোদীর কাছে শক্ত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বর্তমান শিল্পসৃষ্টিকর্মে এ-ও দেখা যাচ্ছে, শিল্পের সংজ্ঞা ও পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মূল্যহীন তুচ্ছ সৃষ্টিও যে শিল্পের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে তা নয়, অনেক অনিষ্টকর ভাব এবং বস্তুও শিল্পজগতে অনধিকার প্রবেশ করে সৌন্দর্যসৃষ্টির নামে শিল্পামোদীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এই মন্তব্য শুধু আধুনিক বাংলা বা ভারতের শিল্পজগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, সমগ্র বিশ্বের শিল্পলোকে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি দেখে সত্য কল্যাণ ও আনন্দবাদী বিবেকবান্ শিল্পস্রষ্টারা ভীত হয়েছেন।

এর পর প্রশ্ন ওঠে, তা হলে প্রকৃত শিল্পকর্ম কী? টলস্টয় বলেন, শিল্পকর্ম হল সেই ধরনের মানস-ক্রিয়া যা মানুষের অস্পষ্টভাবে অনুভূত ভাব বা চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তোলে—যার ফলে তা অপরের অন্তরে সহজেই সংক্রামিত হয়।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের শিল্পীদের একটা প্রবণতা হল স্বল্প-জানা বা সাধারণ মানুষের নিকট অজানা বা অচিন্তিতপূর্ব জীবনপরিবেশ ও তথ্যকে শিল্পকর্মের বিষয়ীভূত করে সেই সৃষ্টিকে পাঠক বা দর্শকের নিকট চমকপ্রদ করে তোলা। শিল্পসৃষ্টিতে এরূপ কৌশল অবলম্বনকে ঐন্দ্রজালিকের সস্তায় 'স্টান্ট' দেওয়ার প্রবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে। শিল্পের উৎকর্ষ চিন্তায় টলস্টয় স্রষ্টার উক্ত প্রবণতা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। টলস্টয় বলেন—"Though a work of art must always include something new, yet the revelation of something new will not always be a work of art." প্রবীণ শিল্পীর এই উল্লেখযোগ্য অভিমতটি আমাদের শিল্পবিলাসী তরুণ শিল্পীদের চিন্তার যোগ্য। তাঁদের এই নতুন জীবন-আবিষ্কারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সরস্বতীর কমলবনে মদমত্ত হস্তীর অস্থির পদক্ষেপ। তাঁরা তাঁদের অস্থির পদচারণা সংযত করে শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ সম্পর্কে জীবনশিল্পীর অভিমত কি শুনুন। টলস্টয় বলেন, প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির জন্য শিল্পীর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক:

প্রথমতঃ—যে নতুন ভাববস্তু নিয়ে শিল্পী শিল্পরচনায় অগ্রসর হবেন তা মানবজাতির পক্ষে মূল্যবান বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ—সেই ভাববস্তুর প্রকাশ স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন যাতে সাধারণ লোক তা সহজে বুঝতে পারে।

তৃতীয়তঃ—যে ভাবপ্রেরণা শিল্পীকে নবসৃষ্টিকার্যে অনুপ্রাণিত করবে তা যেন তাঁর অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই উত্থিত হয়, বাইরের কোন প্রলোভনের ফলে নয়।

নতুন তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ বা তত্ত্বের কচকচিকে ঠিক নবসৃষ্টি বলা চলে না। নবসৃষ্টি হল দ্রষ্টা শিল্পীর অন্তরোত্থিত মানবসমাজের প্রতি নবীন বাণী। টলস্টয় মনে করেন, যে সৃষ্টির মধ্যে জীবনদ্রষ্টার এই নবীন বাণীর পরিচয় নেই, সেই সৃষ্টিকে শিল্পকর্ম বলা চলে না। শুধু তাই নয়, অন্তরপ্রেরণার বশেও যদি শিল্পী তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বিষয়কে বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গীতে শিল্পকর্মে প্রকাশ করেন, সেই প্রয়াসকেও ঠিক শিল্পসৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায় না।

শিল্পসৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টির বাহুল্যের যুগে উক্ত মতটির সারবত্তা আমাদের নবীন শিল্পীদের অনুধাবনযোগ্য।

শিল্পের উৎকর্ষ আলোচনায় টলস্টয় আরও মনে করেন, শিল্পীর অকৃত্রিম হৃদয়ভাবের পরিচয় যতই থাক্ না কেন, শিল্পের প্রকাশ যদি অবোধ্য বা দুর্বোধ্য হয় তা হলে তাকেও ঠিক শিল্পকর্ম বলা চলে না (কথাটা আমাদের আধুনিক কবিদের ভাববার যোগ্য)। এ ছাড়া উক্ত জীবন-শিল্পীর মতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বা প্রকাশের স্বচ্ছতা সত্ত্বেও সে সৃষ্টিকে যথার্থ শিল্পকর্ম বলা চলে না যদি সেই সৃষ্টির প্রেরণা শিল্পীর গভীর অন্তরপ্রদেশ থেকে উত্থিত না হয়। এ ছাড়া কোন অভিসন্ধিপ্রণোদিত হয়ে শিল্পী যখন কিছু সৃষ্টি করেন তাকেও ঠিক শিল্পসৃষ্টি বলা চলে না। এরূপ অভিসন্ধিপরায়ণ শিল্পীকে আমাদের শিল্পীশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র তস্করের সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধা করেন নি।

প্রকৃত শিল্পকর্মের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে টলস্টয় বলেন: (১) শিল্পের বিষয়বস্তু শুধু অজ্ঞাতপূর্ব হলেই হবে না, সেই বিষয়বস্তু মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় হওয়াও প্রয়োজন; (২) শিল্পের প্রকাশ হবে স্বচ্ছ যা সকলের কাছে বোধগম্য হয়; (৩) শিল্পপ্রেরণার উৎসে থাকবে শিল্পীমনের কোন অন্তর্নিহিত সংশয়-সমাধান-প্রয়াস। টলস্টয় বলেন, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যে-সৃষ্টিতে আংশিকভাবেও বর্তমান তাকে বলা চলে শিল্পকর্ম, আর যে-সৃষ্টিতে এর একটি বৈশিষ্ট্যও অনুপস্থিত, তাকে ঠিক শিল্পকর্ম নামে অভিহিত করা চলে না।

শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের লক্ষণ নির্ণয়ে জীবন-শিল্পী টলস্টয় প্রকাশের স্বচ্ছতার উপরে যে বিশেষ জোর দিয়েছেন এই যুগের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পীমহলেও তা স্বীকৃত হবে না নিশ্চয়ই। শিল্পে মানবমনের যে ভাব ও ভাবনা রূপ পায় তা শুধু চেতন স্তরের নয়, অবচেতন স্তরেরও। এই অবচেতন মনের স্তরে মানুষের যে সমস্ত চিন্তা নিত্যনিয়ত ক্রিয়াশীল, তার রূপ মানুষের জ্ঞানের জগতে অস্পষ্ট, অ-স্বচ্ছ। সে অস্পষ্ট ভাব, অনুভূতি, অভীপ্সা বা বেদনা যখন শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে আত্ম-প্রকাশ করে, তখন সে শিল্পে অস্পষ্টতা আসতে বাধ্য। শিল্পে এই অস্পষ্টতার স্বীকৃতি ও অভিব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রতীকী আন্দোলনে (symbolist movement)। প্রাচ্যদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথও এই অস্পষ্ট প্রতীকী শিল্পের (symbolist art) সমর্থক। তাঁর কোন কোন সার্থক নাটকে (অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা, কালের যাত্রা প্রভৃতি) এবং মানবমনের সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনাময় কাব্যধর্মী কোন কোন উপন্যাসে (চতুরঙ্গ) আধুনিক শিল্পীর এই প্রতীকতাপ্রীতি প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেরই শক্তিমান বহু শিল্পী এবং বিদগ্ধ শিল্পসমালোচক প্রতীকী শিল্পকে রসোত্তীর্ণ শিল্পের নিদর্শন হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *'Personality'* নামক গ্রন্থে সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেছেন: "Clearness is not necessarily the only or the most important aspect of the truth." পাশ্চাত্ত্য মনীষী এড্‌মণ্ড বার্কও সত্যের অস্পষ্টতার সমর্থনে বলেছেন: "A clear idea is another name for a little idea." আমাদের যে অনুভূতি যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের জগতে সীমাবদ্ধ সেই অনুভূতির প্রকাশও স্বচ্ছ। কিন্তু যে অনুভূতির উৎস মানুষের ভাবনির্ভর অন্তর্লোক সে অনুভূতির প্রকাশও অস্পষ্ট—রহস্যময়। পাশ্চাত্ত্য শিল্পী-মনীষী জোশুয়া রেনল্ডস্ সেজন্য অস্পষ্টতাকে বলেছেন একপ্রকার মহৎ ভাবের অভিব্যক্তি। (Obscurity is one sort of the sublime)। যে সৌন্দর্য স্বরূপে প্রকাশিত সেই সৌন্দর্যের ভিতর মানুষের দৃষ্টি স্বচ্ছন্দবিহারের অবকাশ পায়, কিন্তু কল্পনা অবাধে পাখা বিস্তার করতে পারে না। অস্পষ্ট সৌন্দর্যের ভিতরই মানুষের কল্পনা-বিকাশের অবকাশ আছে। সেইজন্য আধুনিক সৌন্দর্যতাত্ত্বিকমাত্রই স্বীকার করেন রূপক এবং সাঙ্কেতিক শিল্পেই শিল্পের চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে।

জীবন-শিল্পী টলস্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম পরিচয় হল তার নৈতিক

আবেদনে। যে শিল্পের বিষয়বস্তু প্রয়োজনীয় এবং আবেদন সর্বলোকাশ্রয়ী সে শিল্প নীতিনির্ভর হতে বাধ্য। কিন্তু কলাকৈবল্যবাদীরা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন তুলবেন, সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন তুলে ব্যাপারটিকে ঘুলিয়ে তোলা হয়েছে, শিল্প তো নীতি-শাস্ত্রের কোড্ নয় যে তা নীতিমূলক হতে বাধ্য। শিল্পের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, এবং এই রস সৌন্দর্যসম্ভব। অতএব যে শিল্পকর্মে সৌন্দর্যের নিখুঁত প্রকাশ হয় সেই শিল্পই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কথা ওঠে, যে শিল্পের আবেদন দুর্নীতিমূলক সেই শিল্পকে সুন্দর সৃষ্টিকর্ম বলা চলে কিনা? আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী মনীষী। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—যা 'aesthetically beautiful' তাই সুন্দর। আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আর্টের অহেতুকী প্রেরণাকে স্বীকার করে নিয়েও শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে নীতিবোধের প্রেরণাকেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে দুর্নীতির আবেদন চিত্তের উত্তেজনায় এবং সুনীতির আবেদন চিত্তের প্রশান্তিতে। তিনি বলেন, 'উত্তেজনাকে আনন্দ ও বিকৃতিকে সৌন্দর্য বলিয়া ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক', কিন্তু 'সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই।' (সাহিত্য, পৃ. ৩৪)

শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবগভীর কথাটি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ সম্পর্কে উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণতার লক্ষণাক্রান্ত সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। প্রবীণ শিল্পী টলস্টয় একপেশে শিল্পসৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ করেছেন এভাবে:

ক. যে শিল্পকর্মে শুধু বিষয়বস্তুরই প্রাধান্য

খ শুধুমাত্র আঙ্গিক-সৌন্দর্যে যে শিল্প স্বতন্ত্র

গ. যে শিল্প শুধুমাত্র অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি প্রধান

শিল্পসৃষ্টির প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তরুণ শিল্পীদের শিল্পপ্রয়াসে হয়তো অকৃত্রিমতা আছে, কিন্তু তাদের বিষয়বস্তুতে গুরুত্বের অভাব, কিংবা কর্মে আপেক্ষিক সৌন্দর্যের অভাব। অপরপক্ষে প্রাচীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম বিষয়গৌরবে গৌরবান্বিত হলেও আঙ্গিক-সৌন্দর্যের হীনতায় ম্লান। আবার মৌলিক প্রতিভাহীন শিল্পীর রচনায় বিষয়গৌরব এবং অকৃত্রিমতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সাধারণতঃ আঙ্গিকসজ্জার চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য।

শিল্পসৃষ্টির চরমতম উৎকর্ষ সম্পর্কে শেষ কথা এখনও উচ্চারিত হয় নি, কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে বিভিন্ন যুগের শিল্পরচনার ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক যুগে শিল্পসৃষ্টি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে বিকাশলাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ক্লাসিক যুগের শিল্পরচনায় বিষয়বস্তুর মূল্য স্বীকৃত হত বেশী। পরবর্তীকালের শিল্পকর্মে স্পষ্টতা বা আন্তরিকতার দাবি যত প্রবল হয়ে উঠেছিল তা ছিল শিল্পসৃষ্টির প্রথম যুগে অনুপস্থিত। মধ্যযুগে দেখা যায়, শিল্পকর্মে সৌন্দর্যসৃষ্টির দাবি উঠছে প্রখর হয়ে, অথচ যে বিষয়গৌরব বা শিল্পিমনের অকৃত্রিমতা পূর্বযুগে শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হত তার মূল্য গেছে অনেক কমে। আবার বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের দাবি কেন্দ্রীভূত হয়েছে অকৃত্রিমতা ও বাস্তবধর্মিতার উপর। অথচ পূর্বযুগের শিল্পোৎকর্ষের মান হিসাবে যে সৌন্দর্য, বিশেষতঃ বিষয়গৌরবের যে দাবি মুখ্যতঃ স্বীকৃত হত—সেই মানের যথেষ্ট অবনতি দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের শিল্পকর্মে বিষয়গৌরব স্বীকৃত হলেও সে শিল্প ক্রমশঃ অস্পষ্ট, সঙ্কেতধর্মী এবং ভঙ্গীপ্রধান হয়ে উঠছে। এ ছাড়া এ যুগের বিশিষ্ট-রাজনৈতিক-মতবাদী শিল্পীদের মতে শিল্প সে পরিমাণে সার্থক যে পরিমাণে তা সমাজের প্রয়োজনের দাবি মেটাতে সমর্থ।

অনাগত ভবিষ্যতে সমাজচিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষের মান সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে আরও পরিবর্তিত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিল্পী ও শিল্প

আমাদের প্রাচীন পুরাণকারেরা কবি বা শিল্পীকে তুলনা করেছেন প্রজাপতি বা ব্রহ্মার সঙ্গে ('অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ')। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন এই বহির্বিশ্ব ও প্রাণিজগৎ। সেই বহির্বিশ্ব এবং প্রাণিজগৎকে—বিশেষ করে মানবজীবনকে কেন্দ্র করে শিল্পী সৃষ্টি করেন অনুভূতিনির্ভর একটি সৌন্দর্যলোক—যে জগতের সৌন্দর্য ও মাধুর্য মানুষের মনে এনে দেয় অনির্বচনীয়ের ইঙ্গিত। রূপকে অবলম্বন করে শিল্পীর যাত্রা কিন্তু রূপাতীত রসলোকে শিল্পীর যাত্রা শেষ। রূপলোকের সৌন্দর্য সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু রসলোকের সৌন্দর্য অস্ফুট, অব্যক্ত, অনুভূতিগ্রাহ্য—সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সেই লোক পর্যন্ত পৌঁছয় না। সে লোককে বলা হয় শিল্পলোক। যে-দৃষ্টির সাহায্যে শিল্পী সেই অস্ফুট সৌন্দর্যলোকের ছবি দেখেন, তাকে বলা চলে 'তৃতীয় নয়ন'। সেই তৃতীয়

চক্ষুর সাহায্যে শিল্পী যখন একটি অনির্বচনীয় জগতের দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর সত্তার উত্তরণ ঘটে : জগৎস্রষ্টার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন তিনি। দেশকালের সীমোত্তীর্ণ নিজের সেই দিব্যসত্তার দিকে চেয়ে শিল্পীর কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে পরম বিস্ময়ের বাণী :

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান॥
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি,
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিশিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি—
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥

প্রকৃত শিল্পি সত্তা সেই দিব্যসত্তা, শিল্পিমনের আনন্দ সেই দিব্যোন্মাদ।

যে শক্তির সাহায্যে শিল্পী এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন, সেই শক্তিকে বলা চলে প্রতিভা। প্রতিভাবান মানুষ মননশীল মানুষের মত শুধু বস্তুকে তার স্বরূপে দেখেই তৃপ্ত নন, বস্তুর মধ্যে বাস্তবাতীত মহিমা উপলব্ধিতেই তাঁর আনন্দ। প্রতিভাকে তাই আমাদের মনীষীরা বলে গেছেন 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'। জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারও প্রতিভার ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর সুবিখ্যাত "The World as Will and Idea" গ্রন্থে বলেছেন : "Genius holds up to us the magic glass in which all that is essential and significant appears to us collected and placed in the clearest light and what is accidental and foreign is left out"

প্রতিভার গোপনশক্তি নিহিত রয়েছে বস্তুর স্বচ্ছ ও নৈর্ব্যক্তিক ধারণায়। শুধু তাই নয়—বস্তুর অসার অংশকে বর্জন করে সারাংশ গ্রহণ এবং ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তার উপলব্ধিও প্রতিভার অন্যতম ধর্ম।

অহংবোধকে অতিক্রম করে বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এই চির-অতৃপ্তিই প্রতিভাবানকে অনেক সময় করে তোলে অসামাজিক, বাস্তবজ্ঞানবর্জিত এবং অদ্ভুত। বাস্তবের সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত হলে তাঁর মন হয়ে পড়ে অনেক সময় উৎক্ষিপ্ত। সোপেনহাওয়ারের মতে মানুষ যে পরিমাণে মননশক্তির দিক দিয়ে দীন এবং সাধারণতঃ বর্বররুচিসম্পন্ন (vulgar) সেই পরিমাণে সে সামাজিক। প্রতিভাবান মানুষ সাধারণতঃ নিঃসঙ্গ, সাধারণ মানুষের মত তিনি সামাজিক মানুষের সঙ্গসুখ লাভের জন্য নিত্য লোলুপ নন—কারণ তিনি বাস করেন প্রধানতঃ অন্তর্জগতে। এই ধরনের মানুষের মানসপ্রবণতা, আনন্দ এবং ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে সোপেনহাওয়ার বলেন : "The pleasure which he receives from all beauty, the consolation which art affords the enthusiasm of the artist,···enable him to forget the cares of life, and repay him for the suffering that increases in proportion to the clearness of conscience and for his desert loneliness among a different race of men."

ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তি সঙ্গিহীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হন, কোন সময় তিনি উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যান। এই সাময়িক উন্মত্ততা অবশ্য ভাবোন্মাদের অবস্থা। সীমাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা তাঁর অন্তরে বেদনাবোধের সঞ্চার করে। এই বেদনাবোধ তাঁর কল্পনা এবং অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। মনের এই স্পর্শকাতরতা প্রতিভাবানের মনকে সঙ্কীর্ণ বাস্তব পরিধিমুক্ত করে স্থাপন করে একটা উদার-প্রসার জগতে। আরিস্টটল মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"Men distinguished in philosophy, politics, poetry or art appear to be all of a melancholy temperament." প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যে কিয়ৎ-পরিমাণে উৎকেন্দ্রিক রুশো, বাইরন, আলফিয়ারি (Alfieri), সোপেনহাওয়ার প্রভৃতির জীবন তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ কথাও সত্য মানবসমাজে প্রকৃত আভিজাত্য দেখা যায় এই অর্ধোন্মাদ, প্রতিভাবানদের জীবনে।

প্রকৃত শিল্পীও জগতের সেই প্রতিভাবান মানুষদেরই শ্রেণীভুক্ত। তার স্পর্শকাতর মন যেমন জগতের সুখ-দুঃখ, উত্থানপতন এবং আনন্দ-বেদনার প্রতি সাধারণ মানুষের চাইতে বেশী সচেতন তেমনি মানসিক অনুভূতি ও জাগতিক সত্যকে সৃষ্টির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলবার জন্য তার হাতে যে যাদুদণ্ডটি আছে

সাধারণ মানুষ তার সন্ধান জানে না। চারিদিকের নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যেও এই যাদুদণ্ডের সাহায্যে শিল্পী আবিষ্কার করেন এক নতুন অর্থে পরিপূর্ণ জগৎ। শিল্পীর এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে অল্ডাস্ হাক্সলি তাঁর "Text and Pretext" গ্রন্থে বলেছেন—"An artist is a man equipped with better tools than those of common men Sometimes too, with a divining rod by whose aid he discovers, in the dark chaotic mass, veins of hitherto unsuspected treasure—new meanings and values."

শিল্প জীবনাশ্রয়ী। কিন্তু সে কোন জীবন? যে জীবনের সঙ্গে মঙ্গলসত্য বা অধ্যাত্মবোধ জড়িত সেই জীবনের প্রকাশে শিল্প একটা গভীর অর্থলাভ করে। কিন্তু শিল্পের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই অর্থপূর্ণ জীবনের রূপান্তরে নয়, সে কাজ হল তত্ত্বদর্শীর। মনীষী শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জীবনের এই মঙ্গলসত্য বা অধ্যাত্মবোধ যখন শিল্পীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে একটি অনির্বচনীয় সুন্দর রূপ লাভ করে তখনি শিল্পকর্ম হয় সার্থক—স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতে তখনি শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য দীপ্যমান হয়ে ওঠে। তাহলে বোঝা গেল, জীবননির্ভর সৌন্দর্যের প্রকাশে বা আবিষ্কারেই শিল্পের সার্থকতা। কিন্তু শিল্পীর যে যাদুদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হল সেই যাদুদণ্ড কি? অপর কথায় সৌন্দর্য সৃষ্টিতে শিল্পীর উপকরণ কি? এ সম্পর্কে মনীষী শ্রীঅরবিন্দ বলেন: 'Whatever is capable of being manifested as beauty is the material of the artist'. এর পরমুহূর্তে প্রশ্ন ওঠে সৌন্দর্য কি? এ বিষয়ে মনীষী শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বের যে দৃশ্য মানুষের চেতনাকে চঞ্চল করে বা দৃষ্টিশক্তিতে বিভ্রম ঘটায় তাকে ঠিক সৌন্দর্য বলা চলে না। সৌন্দর্যের প্রকৃত উৎস মানুষের হৃদয়ে, মানুষের মনে। যে ভাববস্তু মানুষের নীতিবোধ বা অধ্যাত্মবোধকে জাগ্রত করে কিংবা মানুষের মননশীলতার উপরে কল্পলোকের ছায়াপাত করে—তাই হল সৌন্দর্য। জগতের মহৎ শিল্পীমাত্রই তাঁদের শিল্পকর্মে রূপ দেবার প্রয়াস পান সেই মনননির্ভর এবং জীবনসম্ভব সৌন্দর্যানুভূতির।

এ পর্যায়ে এসে আধুনিক সমাজ-সচেতন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে জাগ্রত হয়েছে শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসা। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, জীবনের মহৎ এবং বৃহৎ সত্যকে সৌন্দর্যের প্রচ্ছদে প্রকাশ করাই কি শিল্পি-জীবনের চরম ও

পরম সার্থকতা? এর মধ্যে কি শিল্পীর সচেতন প্রচারধর্মিতা প্রকাশ পায় না? শিল্পীর ভূমিকা এবং প্রচারকের ভূমিকা কী এক?

আর্থার কোয়েস্‌লার এযুগের একজন বিদগ্ধ মননশীল ব্যক্তি। তাঁর বিখ্যাত "The Yogi and the Commissar" গ্রন্থে তিনি শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন, শিল্পজগতে মননবিহীন নিছক সৌন্দর্যচর্চা যেমন মানস-বিলাসের পরিচায়ক, শিল্পীর সচেতন প্রচারধর্মিতার মধ্যেও ঠিক সেই ধরনের মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পী যখন সচেতনভাবে কোন বাণীপ্রচারে ব্রতী হন, তখনি বুঝতে হবে তিনি তাঁর শিল্পিসত্তাকে বিসর্জন দিয়েছেন। এবং এই আত্মবিলুপ্তিকে কলাকৈবল্যবাদীদের পলায়নী-বৃত্তিরই সামিল বলা চলে। কলাকৈবল্যবাদীরা যেমন নিছক সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে মানস-বিলাসের রাজ্যে মুক্তি খোঁজেন, তেমনি প্রচারধর্মী শিল্পীর সচেতন শিল্পকর্ম আর এক ধরনের মানসবিলাস (dilettantism)—যে বিলাসের রাজ্যে শিল্পী জীবনের সকল সমস্যা এবং বিরোধের সহজ সমাধান অনুসন্ধান করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রকৃত শিল্পী নিঃসঙ্গ। সমাজনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তাঁর কর্ম নয়, তাঁর কাজ হল সেই সমস্যার শিল্পরূপ দানে। তাঁর প্রকৃত ভূমিকা প্রচারকের নয় বা আন্দোলনকারীর। শিক্ষাদান, বাণীদান, কিংবা সমস্যা-সমাধানের কাজ তিনি ছেড়ে দেবেন সমাজের অপর কর্মীর উপর। কিন্তু সমাজনেতার হাতে যে উপকরণের অভাব, সেই শিল্পোপকরণের সাহায্যে সামাজিক মানুষের মনে তিনি জাগিয়ে তুলবেন এমন তীব্র অন্তরাবেগ যার সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শিল্পী নিঃসঙ্গ হলেও তাঁরও একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আর্থার কোয়েস্‌লার তাঁর উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন কথাশিল্পীর কর্তব্য সম্পর্কে। কথাশিল্পী যখন উপন্যাস রচনা শুরু করেন তাঁর তখনকার অবস্থাকে তিনি তুলনা করেছেন সমুদ্রগামী যুদ্ধ জাহাজের একজন কাপ্তেনের সঙ্গে—যে কাপ্তেনের পকেটে রয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ ইতিকর্তব্য সম্পর্কে শিলমোহরাঙ্কিত একখানা নির্দেশনামা। সমুদ্রের বুকে উপস্থিত হয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করবার জন্য কাপ্তেন যখন চিঠিখানা খুললেন তখন তিনি দেখতে পেলেন সে নির্দেশ লিখিত আছে অদৃশ্য কালিতে (invisible ink)। সে নির্দেশনামাটি তিনি পড়তে পারলেন না সত্য, কিন্তু সব সময় তিনি সচেতন হয়ে

রইলেন যে, একটি সুনির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনই তাঁর জলযাত্রার উদ্দেশ্য। এ কথা তিনি এক মিনিটের জন্যও ভুলতে পারেন না যে, যে জাহাজের তিনি সর্বাধিনায়ক সেটি একটি প্রমোদতরী নয়,—সেটি হল যুদ্ধজাহাজ। এ ছাড়া তাঁর পকেটে তাঁর ইতিকর্তব্য সম্পর্কে যে অদৃশ্য সংকেত আছে সেই সংকেতই তাঁকে সর্বক্ষণ সচেতন করে রাখে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে।

শিল্পীর উপর সমাজের দাবি সেরূপ অদৃশ্য সংকেতে লেখা। যে-শিল্পী সেই দাবি সম্পর্কে যত বেশী সচেতন তাঁর শিল্পকর্ম তত বেশী সার্থক।

২

সৌন্দর্যবোধ ও রসসৃষ্টি

সৌন্দর্যানুভূতি পরিশীলিত চিত্তের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানবমনের এ প্রবৃত্তির বিকাশেই ঘটে রসের উদ্বোধন এবং বিভিন্ন শিল্পমূর্তির মধ্য দিয়ে হয় এ রসের জাগরণ। রস বস্তুটি ভাবদেহী হলেও প্রাচীন আলংকারিকেরা তাকে আনন্দের সঙ্গে অন্বর্থ বলে বর্ণনা করেছেন। সে আনন্দ অবশ্য বেদনাসম্ভব। এ যুগের রসিক কবি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন :

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ।

বাস্তবিকই যে পর্যন্ত সৌন্দর্যসচেতন রসিক ব্যক্তি আপন হৃদয়সংবেদনাকে রূপের মধ্যে ব্যঞ্জনা দিয়ে একটা অপূর্ব শিল্পশ্রীতে মণ্ডিত করতে না পারেন, সে-পর্যন্ত তিনি আত্মভোলা- উদাসীন। অবশ্য তাঁর এই সাময়িক আত্মবিলোপের মধ্যে রয়েছে চিরতরে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক উদগ্র কামনা। জাগতিক ধন মান, আপাতসুখের ক্ষুদ্র খণ্ড আকাঙ্ক্ষা প্রলুব্ধ করতে পারে না তাঁর চির-বুভুক্ষু অন্তরকে, দৃষ্টি তাঁর সূর্যমুখীর মত ঊর্ধ্বে—বহু ঊর্ধ্বে,—অমরত্বের দুর্লভ আসনখানি যেখানে সার্থক শিল্পীর জন্য সংরক্ষিত। কল্পনা তাঁর সুদূরপ্রসারী, মানস-দৃষ্টি তাঁর বিশাল, অনুভূতির বিস্তৃতি তার দেশকালের সীমোত্তীর্ণ। তিনি চান অমৃতের আস্বাদন, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের উপলব্ধিজাত 'মহাসুখ'। যশের আকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবতারাটিই কেবল তাঁর লক্ষ্য, নিষ্প্রভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলি মিট মিট্ করে তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না কখনও। স্থূল বস্তুধর্মী সামাজিকের চোখে তিনি ধনহীন, মানহীন, খেপা, খেয়ালী, রিক্ত—একেবারে রিক্ত, কিন্তু মনে মনে তিনি জানেন, ভাবরসের ঐশ্বর্যে তাঁর সহৃদয় অন্তরখানি মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত দীপ্ত।

অনুভূতিকে আশ্রয় করেই সৌন্দর্যচেতনা বিকাশ লাভ করে সহস্রদল পদ্মের

মত। যে শিল্পীর অনুভূতি যত বেশী গভীর ও বিস্তৃত তাঁর সৌন্দর্যচেতনাও তত বেশী তীব্র ও ব্যাপক। এ শ্রেণীর শিল্পীর সাধনায় শিল্প উত্তীর্ণ হয় জীবনশিল্পে। সৃষ্টির অনাদিকাল থেকেই জগতের সর্বত্র প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য তরঙ্গিত—কিন্তু সে সৌন্দর্য বহুকাল যাবৎ সাধারণ মানুষের স্থূল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেনি। মাধবীকুঞ্জে ভ্রমর ঘুরে মরে কেন, তরুকে আশ্রয় করে লতা লতিয়ে উঠে কেন, চাঁদের সঙ্গে চকোরের, বিদ্যুতের সঙ্গে মেঘের, সাগরের সঙ্গে তটিনীর, প্রভাতসূর্যের সঙ্গে কমলের, নতুন আষাঢের মেঘের সঙ্গে চাতকের কোন প্রকার আত্মিক সম্পর্ক আছে কিনা, সভ্যতাবিকাশের পূর্বে বহুদিন মানুষ তার কোন চিন্তা করেনি, চিন্তা করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। শুধুমাত্র জৈবিক প্রয়োজনের সীমায় মানুষের সকল জীবনপ্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল সেদিন। কিন্তু চাঁদের দিকে চকোর যখন উড়তে থাকত, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যখন খেলা করত, আষাঢের মেঘগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চাতকের আনন্দ-কলরব যখন ধ্বনিত হত, তখন সাধারণ মানুষের মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হোক বা না হোক, প্রথম অনুভূতিশীল কবিচিত্তে একটা আনন্দ-বেদনার সাড়া জাগল। সেই আদিমতাধর্মী যুগে স্থূলপ্রবৃত্তির মানুষ যখন প্রয়োজনের দাবি মেটাতে ব্যস্ত, অনুভবক্ষম কবি তখন :

মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া।
একা বসি কোণে জানিত না চিতে ঘনগম্ভীর মায়া ॥

অনুভূতিশীল কবি অন্তরের আলোছায়ার নির্জন খেলা ব্যর্থ হয়নি। প্রকৃতি-জগতের রহস্যলীলার নিগূঢ় অর্থ কবিহৃদয়ের সত্যোপলব্ধির বিদ্যুৎবিকাশে একদিন স্পষ্ট হয়ে উঠল। কবি বুঝতে পারলেন, বহিঃপ্রকৃতির ভেতরও যে এত রহস্য লুকিয়ে আছে, বস্তুজগতে একের সঙ্গে অপরের সান্নিধ্য কামনা যে এত তীব্র তার মনস্তত্ত্ব আর কিছুই নয়—সে হল পারস্পরিক ভালবাসা বা প্রীতির আকর্ষণ। শুধু বস্তুজগতে কেন, ভাবজগতেও এ প্রেমপ্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিলীলা অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত। কবি যখন তাঁর সুগভীর অন্তরানুভূতি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সাহায্যে এ রসপ্রস্রবণের সৃষ্টি করলেন তাঁর কাব্যে, গাথায় ও কাহিনীতে, তখন স্থূল প্রবৃত্তির সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেল তাঁর এ দিব্যদৃষ্টি দেখে। তাদের মত এ পৃথিবীর অন্নজলে পুষ্ট হলেও তারা কবির মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করলো সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে—জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করে কবির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হল প্রশংসার সোচ্চার বাণী।

রসপিপাসুর হৃদয়াসনে কবির স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল, কবির সাধনা সার্থক হল।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ, কান্না-হাসি, আনন্দ-বেদনা ও বিরহ-মিলনের মধ্যে যে এত বৈচিত্র্য এত সৌন্দর্য লুকিয়ে ছিল, তাই বা কে জানত? তার পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে হঠাৎ ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসে কেন, কোন দুর্বার শক্তির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে কক্ষহারা নক্ষত্রের মত সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়,—বহুদিন মানুষ তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সাহিত্যশিল্পী যেদিন অনুভূতিশীল মনের তুলির সাহায্যে কাব্যকাহিনীতে, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে সে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুললেন, দিব্যদৃষ্টির দ্বারা মানবভাগ্যের ওপর নিয়তির প্রভাবের কথা আবিষ্কার করলেন, সেদিন সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাঁর নিকট মস্তক অবনত না করে পারেনি।

শিল্পীর সার্থক শিল্পায়নের মৌলিক প্রেরণা হল তাহলে মানব-জীবনের প্রতি বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ, তীব্র সহানুভূতি ও গভীর সৌন্দর্যবোধ। এ সৌন্দর্যদৃষ্টি একদিকে বাস্তবনির্ভর, আর একদিকে বাস্তবাতীত। এ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির প্রেরণাতেই স্মরণাতীত কাল থেকে কথার জাল বুনে সার্থক সাহিত্য-শিল্পী যে সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন তা চিরকাল পাঠকের মন ভুলিয়েছে, রসিকচিত্তকে শিল্পের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ বিক্ষোভ ও প্রলয়দ্বন্দ্ব হয়ত মানুষের শুভবুদ্ধি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে, উত্তরকালে এ সমস্ত বিরোধের কাহিনী হয়ত ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুর গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু হোমার ভার্জিল দান্তে ট্যাসো হাইনে, সেক্সপীয়র কালিদাস ভারবি মাঘ—জয়দেব চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিশিল্পীর জীবনবেদনা-স্পন্দিত কাব্যগৌরব চিরদিন কাব্যজগতে অক্ষুণ্ণ থাকবে, সকল যুগের মানুষের মনে রসের জোগান দেবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও ইংরেজী ফরাসী নরওয়েজীয় রুশীয় আমেরিকান বাংলা প্রভৃতি নানান সাহিত্যের গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে মানব মনের এবং জীবনের বিচিত্র ও বিভিন্ন দিক নিয়ে যে অপূর্ব সৌন্দর্য ও নিবিড় রসসৃষ্টি হয়েছে তা বর্তমান ভাববিক্ষুব্ধ রাজনীতির যুগেও মানুষের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও তৃপ্তি এনে দিচ্ছে।

নীরস ও নির্জীব পাথরের ভিতরও যে এত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের উৎস লুকিয়ে আছে তাও কি সাধারণ মানুষ আগে বুঝতে পেরেছিল? শিল্পী যেদিন আপন

সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও একাগ্র সাধনায় দিনের পর দিন সে রূপহীন পাথর কুঁদে একটি অপূর্ব-সজীব মূর্তির সৃষ্টি করলেন, তখন সাধারণ মানুষ সে শিল্পমূর্তির রহস্যময় দৃষ্টি ও বাঁকা হাসি দেখে বিমুগ্ধ না হয়ে পারেনি। মোনালিসার মুখে সে হাসিটি ফুটিয়ে তুলতে, মাতৃত্বের স্নেহরসে সিক্ত ম্যাডোনার সেই অপূর্বসুন্দর বাৎসল্যরস সৃষ্টি করতে, প্রেমভাবে বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গিম বঙ্কিম ঠামটির রূপ দিতে, তথাগত বুদ্ধ এবং প্রেমপাগল চৈতন্যের মুখে একটি স্বর্গীয় ও শান্ত শ্রী বিকাশ করতে শিল্পীকে যে কত দিন কত রাত্রি নির্জনে তপস্যা করতে হয়েছিল তার খবর কে রাখে?

সার্থক শিল্পসৃষ্টির মূল রহস্য হল শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতাবোধ। তাদাত্ম্য না হলে শিল্পীর শিল্পরচনা কখনও জীবনশিল্পে রূপান্তরিত হতে পারে না। গ্রীস দেশের প্রাচীন কাহিনীগুলির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, শিল্পী কিভাবে তাঁর সৃষ্ট নারীমূর্তির দেহের লীলায়িত ভঙ্গী ও চোখের যাদুকরী দৃষ্টি দেখে সে মূর্তির সঙ্গে নিজেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর আবেগ বিহ্বল অন্তরের তীব্র সৌন্দর্যপ্রীতি দেখে প্রেমের দেবতা এপোলো সে পাষাণ-প্রতিমার ভিতর প্রাণ সঞ্চারিত করেছিলেন। কাহিনীটি প্রতীকতাধর্মী সন্দেহ নেই। সৌন্দর্যচেতনার গভীরতার ফলে শিল্পের সঙ্গে শিল্পী যে একাত্ম হয়ে যান তার চমৎকার ব্যাখ্যা উক্ত গ্রীক কাহিনী।

প্রাণহীন কঠিন প্রস্তরখণ্ড থেকেও সৌন্দর্যবোধের সাহায্যে যে চিরন্তন রসসৃষ্টি করা সম্ভব তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেলে লুভরের মিউজিয়মে সংরক্ষিত প্রাচীন গ্রীক মডেলের মূর্তিগুলি দেখলে। ভাস্করশিল্পীর এই সৌন্দর্যচেতনার অভিব্যক্তি শুধু কতগুলি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনসাধ্য শিল্পপ্রচেষ্টা যাতে চিরতরে লুপ্ত না হয়ে যায়, সেজন্য তারা পাহাড়ের গায়ে কঠোর পাথর কুঁদে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিকে চিরন্তন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশের অজন্তা-ইলোরার গুহাগুলিতে এরূপ শিল্প-প্রয়াসের চমৎকার নিদর্শন মিলে। প্রাচীন গ্রীসের শিল্পচেতনামুগ্ধ একজন আধুনিক রোমান্টিক কবি সে বিস্মৃত যুগের শিল্পী ও শিল্প-রচনার প্রতি যে বিস্মিত-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তা আজও রসিকজনের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করে। বাহুল্য ভয়ে 'On a Grecian Urn' থেকে সে চমৎকার অংশটি এখানে উদ্ধার করলাম না। স্থাপত্যশিল্পকে আশ্রয় করে মানুষের সৌন্দর্যবোধ যে কত গভীর

রূপসৃষ্টি করেছে, তার নিদর্শন মিলবে প্রাচীন মিশরের পিরামিডে, আমাদের দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগের মন্দির, চৈত্য, স্তূপ ও স্মৃতিসৌধগুলি দেখলে। কতগুলি অমসৃণ ও কর্কশ প্রস্তরখণ্ডে সুসমঞ্জস সমাবেশে যে কি মহান সৌন্দর্যসৃষ্টি হতে পারে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। যুগযুগ-ব্যাপী সৌন্দর্যবিলাসী কত কবি এই সৌন্দর্যের বেদীমূলে কত ছন্দে ও কত রূপে নিজের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। মানুষের রুচি ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখনও এ সমস্ত প্রাচীন শিল্পকীর্তি অনাদৃত বা উপেক্ষিত হয়নি। বরং এ যুগেও সে সমস্ত শৈল্পিক রীতির সার্থক ও অসার্থক অনুকরণ চলেছে দেশের সবত্র।

চিত্রশিল্পের মধ্য দিযে মানুষের যে সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে তা আরো সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। সে জন্য এ শিল্পের রসগ্রাহী চিরকালই স্বল্প ও নগণ্য। এ ধরনের শিল্পীর সাধনাও নির্জন সাধকের একাগ্র তপস্যা। এ জন্য এ ধরনের শিল্পীও জাগতিক মান যশের প্রতি একান্তভাবে উদাসীন। কোন্ স্থানে তুলির পোঁচ দিলে কোন্ ভাবটি গভীর ভাবে ফুটবে, কোন্খানে একটি রেখার টানে তার কল্পনার ভাবদেহটি লালায়িত হয়ে উঠবে—এই হল চিত্রশিল্পীর প্রধান আরাধ্য বস্তু। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে নিতান্ত লক্ষ্যহীন মনে হলেও বাস্তবিকপক্ষে তাঁর লক্ষ্যও স্থির এবং ধ্রুব। সার্থক চিত্রশিল্পীর মানসকল্পনার সামনে যে পযন্ত না সুন্দর রূপ ধরে দেখা দেয় সে পযন্ত তিনি অস্তস্তব্ধ মহাসাগরের মত।

চিত্রশিল্পের সাহায্যে রসসৃষ্টি বিষয়ে যাঁর ধারণা আছে তিনি জানেন, এ শ্রেণীর শিল্পের সার্থক বিকাশ হয় অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায়। শিল্পী দর্শকের কল্পনার জন্যে অনেকখানি ফাঁক রেখে দেন আপন শিল্পরচনায়। সে জন্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর শৈল্পিক অবদান শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কল্পনা নির্ভরও বটে। আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রশিল্পও ছিল ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অনুভূতিনির্ভর। এ যুগের অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি সার্থক শিল্পীও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি অনুসরণ করেই আধুনিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা নয়, খেয়ালী কল্পনাও তাঁর শিল্পপ্রয়াসে একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের ব্যঞ্জনা এত দুর্বোধ্য এবং সাধারণ শিল্পসমালোচকের বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয়। প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে চীনা জাপানী চিত্রশিল্পের ব্যঞ্জনা

বোধ হয় সূক্ষ্মতর। তাঁদের কবিতায় যেমন তাঁরা দুচারটি ছত্রে ও স্বল্প কথায় গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা দেন, তাঁদের চিত্রশিল্পেও অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বিচারে সিলার (Schiller) একটি চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন, 'An artist is best known by what he omits.' এ মন্তব্যটি সর্বযুগের সর্বদেশের সার্থক শিল্পী সম্পর্কে বোধ হয় সমভাবে প্রযোজ্য।

নৃত্যশিল্পীর মনে যে সৌন্দযবোধ জাগে তার রূপ দেন তিনি আপন দেহের লীলায়িত ভঙ্গিমায়। তবে এ শ্রেণীব শিল্পরচনাব উৎকর্ষ দেহ এবং মন উভয়ের উপরই সমানভাবে নির্ভরশীল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে নৃত্যশিল্পের যে ব্যাপক চর্চা ছিল তার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় কাব্যে বর্ণিত বেহুলা প্রভৃতির চরিত্রে। এ ধারণাব সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে কলিঙ্গ থেকে সুরু করে কন্যা-কুমারিকা পযন্ত মন্দিরগাত্রেব নৃত্যরত মূর্তির নিদর্শনগুলিতে এবং বৌদ্ধযুগের অজন্তা-ইলোরার গুহামূর্তি ও চিত্রগুলিতে। বর্তমান কালে উদয়শঙ্করের মত প্রতিভাবান শিল্পী ভারতেব নৃত্যশিল্পেব সে সুপ্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করে জগতের মধ্যে যশস্বী হয়েছেন। নৃত্যশিল্পে আমাদের ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য আদর্শের পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। প্রাচীনকালে দেবপূজার উপলক্ষ্যেই আমাদেব দেশে নৃত্যগীতাদিব অনুষ্ঠান হত বেশী, সেজন্যে আমাদের নৃত্যশিল্পে ভক্তির ভাবটাই যুগে যুগে প্রাধান্য লাভ করেছে। মুসলমান যুগের দরবারি নৃত্যে অবশ্য বিলাসের ভাবটাই প্রবল। পাশ্চাত্য দেশে নৃত্যানুষ্ঠান একটা সামাজিক ব্যাপাব, নিছক আনন্দ উপভোগই সে নৃত্যের প্রধান লক্ষ্য। পাশ্চাত্য জগতের নৃত্যশিল্পেব সঙ্গে সেজন্যে কিছুটা তুলনা চলে মুসলমানী দরবারি নৃত্যের। হিন্দুর নৃত্যশিল্পেব সঙ্গে সে নৃত্যের সাদৃশ্য তাই এতটা ক্ষীণ। পাশ্চাত্য ভোগবাদী নৃত্যেব জন্যে অবশ্য পাশ্চাত্য জাতিদের দোষারোপ করা চলেনা। এ শ্রেণীর নৃত্যশিল্পের আদর্শ তাদের জীবনেব সঙ্গে সুসঙ্গত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যপরিকল্পনায় ভক্তি ও ভোগবাদী দুটি জাতির জীবনাদর্শ চমৎকাব অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

নৃত্যশিল্পীর মত সঙ্গীতশিল্পীর যে বসসৃষ্টি তাও কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। তাঁব অন্তরে সৌন্দর্যবোধেব যে বেদনা জাগে তার রূপ দেন তিনি আপন কণ্ঠের সুর, লয় ও তানের সাহায্যে। শুধু কণ্ঠস্বরে নয়, যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমেও সঙ্গীতশিল্পী তাঁর অন্তরের ভাষাকে যে রসরূপ দেন তা রসগ্রাহী মাত্রেরই চিত্তে বহুবিস্তারী বেদনার আভাস এনে দেয়। আমাদের প্রাচীন পুরাণে দেখা যায়,

দেবর্ষি নারদের বীণার সুরে নাকি নারায়ণের দেহাংশ পর্যন্ত দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল। এ প্রতীকী উপাখ্যানের ভিতর প্রাচীন ভারতে যন্ত্রসঙ্গীতের উৎকর্ষই সূচিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক কাহিনীগুলিতেও দেখা যায় এ সুরের সাধনায় কত লোক বিবাগী পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু সেকালে কেন, একালেও সুরের সাহায্যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে বাঁধবার প্রত্যাশায় কতলোক যে গৃহছাড়া ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে দরদী ছাড়া তার খোঁজ কে রাখে ?

বর্তমান যুগ মুখ্যতঃ বিজ্ঞানের যুগ। এ বিজ্ঞান মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে বৈদ্যুতিক গতিশীলতা। লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতের দিকে মানুষের গতি আজ অব্যাহত। এ চঞ্চল জীবনপ্রবাহের মধ্যে শিল্পী আজও অচঞ্চল ভাবে সৌন্দর্যসাধনায় আত্মমগ্ন। তাঁর শিল্পরচনা অবশ্য যুগপ্রভাবে নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠছে, কিন্তু এও দেখা যাচ্ছে সার্থক শিল্পীর সৌন্দর্যসৃষ্টি যুগাতিশায়ী। বর্তমানের খণ্ডিত জীবনদৃষ্টি অতিক্রম করে সার্থক শিল্পী আজো অখণ্ড জীবনরহস্য অনুসন্ধানে তৎপর। সে রহস্যবোধ রসগ্রাহী চিত্তে এনে দিচ্ছে বিপুল শান্তি ও অপার তৃপ্তি। শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধকের সেই ত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। বাস্তবের সুকঠোর আঘাতে ম্লান পৃথিবী আজও শিল্পীর সৌন্দর্যসাধনায় সজীব। মানুষের মনোমরুভূমিতে শিল্পী আজও সৌন্দর্যের ফুল ফুটিয়ে চলেছেন। তাইত আধুনিক সভ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত মানুষ আজও মনুষ্যত্বের গৌরব নিয়ে বেঁচে আছে। না হলে এ যুগের মানুষের বাঁচা আদিম বর্বর যুগের বাঁচা হতে কোন অংশে পৃথক হত না।

৩

কথার মায়া

আমরা হামেশাই কথা বলি, কোন সময় কেজো কথা, কোন সময় বাজে কথা। কিন্তু কথার ভেতর যে অপূর্ব মায়া আছে, মোহ আছে, যার সোনার কাঠির স্পর্শে এক মুহূর্তে অপরের হৃদয় জয় করে নেওয়া যায় সে কথা যাই ভুলে। আপন হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে কথাকে রসায়িত করে বল্‌তে পারিনে বলে আমাদের কথাগুলো অনেক সময় বুদ্বুদের মত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, সৃষ্টির শতদলের মত ফুটে উঠে অপরের অন্তরে মাধুর্য বিস্তার করতে পারেনা। ধরুন ট্রেনে আপনি কলকাতা চলেছেন। আপনার দুপাশে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। দুজনের সঙ্গেই আপনার প্রথমে ভদ্রতা-সূচক আলাপ হয়েছে। দু'তিন স্টেশন পার হতেই দেখা গেল, আপনি আপনার ডানপাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে মশগুল হয়ে গেছেন, বাঁ-পাশের ভদ্রলোকের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, তাঁকে আপনি চা-পান-সিগারেট খাওয়াচ্ছেন—তারপর আপনার টিফিন কেরিয়ার খুলে পথের খাবারের অর্ধেক ভাগ করে দিচ্ছেন। শিয়ালদ' স্টেশনে পৌছবার আগে আপনি তাঁর সঙ্গে কলকাতার ঠিকানা বিনিময় করছেন। আর বাঁ-পাশের ভদ্রলোক শিয়ালদ' স্টেশনের জনারণ্যের মধ্যে কখন যে হারিয়ে যাচ্ছেন, তা আপনি টেরও পাচ্ছেন না।

এই যে পথের হঠাৎ পরিচয়ের আলোকে আপনার স্পর্শকাতর অন্তরটি আর একটি উষ্ণ হৃদয়ের সান্নিধ্যে এসে পড়ল তার কারণ কি? নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের কথার মধ্যে এমন একটা মোহ ছিল, যাতে ক্ষণিকের পরিচয়ে আপনি তাঁর বন্ধু হয়ে গেছেন। কথার মায়া এমনি জিনিস। ভাল করে বলতে পারলে তার মধ্যে লাগে পরশপাথরের স্পর্শ, প্রভাতের অরুণিমার আভা, সন্ধ্যার সূর্যাস্তের রঙ্‌।

যেখানে কথা হতে কথা আসেনা, ব্যথা হতে কথা আসে, সে কথার মূল্যই নাকি বেশী! কারণ সে কথা গভীর, ব্যঞ্জনাময়, মর্মস্পর্শী। কিন্তু

মানুষ যদি সব সময় গভীর সুরে কথা বলবার চেষ্টা করত, তাহলে জীবনটাই হয়ে উঠত অসহ্য, পরিবেশটা হয়ে উঠত থমথমে। স্বয়ং দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত "গভীর সুরে গভীর কথা" শুনিয়ে দিতে সাহস পাননি। বহুদিন ব্যথাগভীর কথা বলে বলে হঠাৎ তিনি নিজের ব্যথাটাকে হাল্কা করতে চেয়েছিলেন 'শুধু অকারণ পুলকে, ক্ষণিক গানের আলোকে, ক্ষণিকের গান গেয়ে'। তাইত রবীন্দ্রকাব্যের অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে লঘু-চপল ছন্দে লেখা 'ক্ষণিকার' কবিতাগুলো শুকতারার দীপ্তি নিয়ে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে। ক্ষণিকার যুগের পর দীর্ঘদিনের কাব্য সাধনায় কবির মনের ওপর আবার দার্শনিকতার ভূত চেপেছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি যে এ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল তাঁর শেষ বয়সে ছেলেমেয়েদের জন্য লঘু-তরল ছন্দে লেখা ছড়াগুলো। বুঝতে পেরেছিলেন তিনি, জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার গভীরতা কাব্যে রূপ পেয়ে তাঁর কাব্যকে করে তুলেছে সুদূর আকাশের নীহারিকাপুঞ্জের মতো অস্পষ্ট, ছায়াময়—অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের কাছে। তাইত সহজ আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন তিনি সবল প্রাণের অধিকারী শিশুদের—মানব সাহিত্যের আদি বাহন ছড়ার ছন্দে লিখে।

আসলে সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন সূক্ষ্ম শিল্প উপভোগ করতে গিয়ে মানুষ তার মধ্যে সমস্যার জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। মানুষের জীবনটাত এমনিই জটিল, সমস্যাসঙ্কুল, বিসর্পিত। তাই সুকুমার শিল্পের মধ্যে মানুষের মন খোঁজে একটি উদার মুক্তি। শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ কথা ত নয়ই—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সমস্যা নিয়ে কথার ঠাসবুনোনিও আজকাল কষ্টক্লিষ্ট মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সোজাসুজি নীতিগত কথা বল্‌তে গেলেত আজকালকার তরুণদের কাছে অর্ধচন্দ্র খাবার ভয় আছে। ডঃ জনসন, রাসকিনের কথা তাই য়ুরোপীয় সমাজে শুধু আজ কেন, বহু বছর আগে থেকে লোকে আর পড়েনা। চালাক লোক ছিলেন মন্তেই, বীরবোম প্রভৃতি য়ুরোপীয় সাহিত্যিক। লোকের মতিগতির এ পরিবর্তন তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, তাই তাঁরা হাল্কা চালে মানুষের মনভুলানো কথা বলে অত শীঘ্র পাঠক সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ইংরাজ সাহিত্যিকেরাও তাঁদের অনুসরণ করতে দেরী করেননি। হাল্কা চালে মনোময় মজলিসী কথা বলে Charles Lamb, Alpha of

the Plough, E. V. Knox, Hillaire Belloc প্রভৃতি রচনা-লেখক সাহিত্যের আসর মাৎ করেছিলেন। ইংরাজী রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের উপভোগ্য রচনার ধারা আজও বহন করে চলেছেন এ যুগের লেখকগণ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা-সাহিত্যিকেরা ছিলেন একটু ভারিক্কী চালের। তাই তাঁদের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো আজকাল লোকে ভুলে গেছে। তারপর বাংলা সাহিত্যে তীক্ষ্ণধী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। রচনাশৈলীর দিক দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইংরাজ-লেখক De Quinceyর সমগোত্রীয়। De Quincey লিখেছিলেন '*The Confessions of an English Opium-Eater*', আর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। উভয়েই এ কথা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, গভীর কথার ওপর হাস্যরসের আলোক বিকীর্ণ করে চিনির মোড়কে কুইনিন-এর মত করে না দিলে তাঁদের অর্থগূঢ় কথাগুলো কেউ গিলবে না। তাইত আমরা দেখি উভয় লেখকের নায়ক আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে জীবনের অনুভূত গভীর সত্য প্রকাশ করেছিলেন সরস সুন্দর ঝলমলে কথায়। 'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ'—এই প্রাচীন মনীষী-বাক্যকে সার্থক করেছেন দুই ভিন্ন দেশের দুজন কথা-রসিক।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথের লেখার কথা ধরা যাক্। তাঁর শ্রোতাকে 'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে সাহস' না করলেও আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ রচনায় তাঁর অন্তরের গভীর কথাগুলোকে গভীর সুরেই বলেছেন। তাইত এত বড় প্রতিভার অধিকারী হয়েও কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাসের মত আজো তিনি দেশের সর্বসাধারণের আত্মীয় হতে পারলেন না—এখনও সুদূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সাধারণ লোক বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে তার কথাগুলোর তারিফ্ করে, পণ্ডিতেরা সে কথার অর্থ নিয়ে গবেষণা করে—কিন্তু সে কথা সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব শ্রেণীর লোকের মনকে আকর্ষণ করতে পারে না।

রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও গভীর কথাকে সহজ সুরে বলে দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কথাকে প্রাণের সহজ ভাষার পর্যায়ে তুলে এনেছিলেন তিনি। তাইত দেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' আখ্যা দিয়ে।

সরস প্রাণবন্ত অথচ সূর্যালোকের মতো দীপ্ত শরৎচন্দ্রের কথাগুলোর উৎস ছিল হৃদয়ের গভীরে। তাই কথাশিল্পীর কথাগুলো ছিল সাধারণতঃ ব্যথাকরুণ—

স্যাঁতস্যাঁতে। এ ব্যথাকরুণ কথার বিরুদ্ধে 'বাজে কথার ফুলের চাষ' শুরু করেন শরৎচন্দ্রেরই সমসাময়িক আর একজন দুঃসাহসী বাঙালী কথাশিল্পী—আচার্য প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্যে আনন্দবাদের সমর্থক ছিলেন তিনি, আর বাচনভঙ্গীতে ছিলেন পুরোপুরি মন্তেই-পন্থী। নীতিধর্মী, করুণধর্মী এ দার্শনিক দেশে আনন্দের মুক্তধারা প্রবাহিত করে দিলেন তিনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, সরস, সতেজ কথা দিয়ে। তাঁর 'নীললোহিত'-কাহিনী, 'চারইয়ারী কথা' কি বাঙালী কোনদিন ভুলবে? প্রাণের অজস্রতায় খুশীমত কথা বলে শুধুমাত্র বিন্যাসের গুণে বাঙালীর হৃদয়-রাজ্যে অবিস্মরণীয় আসনের অধিকারী হয়ে রইলেন "বীরবল"।

আজকালও রম্যরচনার নামে "বাজে কথার ফুলেব চাষের" চেষ্টা চল্‌ছে দিকে দিকে। তবে দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "বাজে কথাই" বলা হচ্ছে বেশী—ফুলের চাষ আর হয়ে উঠছে না। এ প্রসঙ্গে কয়েক বৎসব পূর্বে বুদ্ধদেব বসুর লেখা—"হঠাৎ আলোব ঝল্‌কানি" বইখানির কথা মনে পড়ছে। তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর কথাকে মনোহব ভঙ্গীতে বলে লেখক সেদিন বাঙালী পাঠকেব মনে যে ঝিলিক লাগিয়ে দিয়েছিলেন আজো তা ভুল্‌তে পাবছিনা।

নির্জনে বসে থাকলে বাঙালী যে শুধু দার্শনিক চিন্তা করে তা নয়, ভ্রমণে বেরুলেও দার্শনিক চিন্তার ভূত তার কাঁধ থেকে নামে না। তাই বাঙালীব ভ্রমণকাহিনীগুলোও কেমন যেন গুরুগম্ভীর। সেগুলো পড়লে দেশবিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, আনন্দ পাওয়া যায়না। একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন সে কথাগুলো। ভ্রমণকথার ভিতবেও যে বিদ্যুতেব চমক আছে, আনন্দের দীপ্তি আছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির খেলা আছে তা হঠাৎ আবিষ্কাব কবেছিলাম অল্ডাস্ হাক্‌স্‌লির *Jesting Pilate* পড়ে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁব বিদ্রূপাত্মক কথাগুলো মনকে ক্ষণিকের জন্য বিষিয়ে তুল্‌লেও তাঁর সবস কথাবিন্যাস মনকে প্রফুল্ল করেছিল সেদিন। ভ্রমণের কথাকে তেমন সুন্দব কবে বাঙালী বল্‌তে পারবে কবে একথা ভাবছিলাম—এমন সময় হাতে এসে পড়লো অন্নদাশংকরের 'পথে প্রবাসে'। অন্তবাবেগেব তীব্রতায় উষ্ণ, বুদ্ধিতে দীপ্ত, হাস্য-পরিহাসের আলোকে উজ্জ্বল সে কথাগুলো। ভ্রমণ-কথা বলার ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হল বাংলা সাহিত্যে।

এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন দেবেশ দাসের 'ইউবোপা', 'রাজোয়ারা' ও 'রাজসী'। দিলীপ রায়ের 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী', কেদারনাথের 'চীনযাত্রী', দুর্গাবতী

ঘোষের 'পশ্চিমযাত্রিকী'ও মনে রেখাপাত করেছিল সেদিন। তাহলেও কথার মায়া দিয়ে তাঁরা আমাদের মনকে অতটা টেনে নিয়ে যেতে পারেননি তাঁদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পেরেছেন সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর বহু-আলোচিত 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থে। ইদানীংকালে খুব কম লেখকই শুধু মাত্র কথার জাল বুনে এতটা অন্তরঙ্গ হতে পেরেছেন পাঠকের কাছে। সাম্প্রতিক কালে লিখিত 'কালকুটের' 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' চিত্তস্পর্শী। কিন্তু ঘরোয়া ভঙ্গীতে কথা বলার গুণে আলোচ্য সময়ে সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য' নামক আধা-রোমান্টিক ভারত ভ্রমণ-কাহিনী।

বিঘ্নসংকুল দুস্তর ভ্রমণপথের কথার সঙ্গে রোমান্সের সাতরঙা রঙ্ মিশিয়ে ভ্রমণ-কথাকে যে এতটা লোভনীয় করে তোলা যেতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রকাশের আগে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী', রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা' এ ধারারই পুনরাবর্তন। 'যাযাবরে'র দৃষ্টিভঙ্গী উপরোক্ত কথা-রসিকদের চাইতে আরো একটু বিশ্লেষণাত্মক—যদিও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, বেগবান কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে সরলতার অভাব ঘটেনি কোথাও। অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' এ পর্যায়ের একখানি স্মরণযোগ্য বই।

আমাদের চারদিককার পরিবেশে সব সময় লোকে যা করছে বা বলছে তা যদি আমরা চোখ কান খোলা রেখে দেখি ও শুনি এবং সরস কথার ভঙ্গীতে নক্‌সার আকারে তা প্রকাশ করতে পারি তবে সে সব কথাও লোকের কাছে হয়ে ওঠে পরম আস্বাদ্য। উনবিংশ শতাব্দীর এ জাতীয় রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র বাস্তব আবেদনের কথা অনেকেই জানেন। ইদানীংকালেও কথার মারফতে নক্‌সা এঁকে আমাদের অজস্র হাসির খোরাক জুগিয়েছেন—'বিরূপাক্ষ', আর 'রূপদর্শী'। 'কালপ্যাঁচার' কথা যেন একটু ভারিক্কী চালের। 'আনন্দ-বাজারে'র 'কমলাকান্ত' ত অনেক সময়ই গম্ভীর। আর একজন কথাচিত্র-শিল্পী কিছুদিন পূর্বে আমাদের চিত্তাকাশে বিদ্যুতের ক্ষণিক দীপ্তি ছড়িয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন: তিনি হলেন পরিমল রায়। পারিপার্শ্বিকের ঘটনাস্রোতের প্রতি এমন সজাগ-সরস দৃষ্টি আমরা খুব কম কথা-রসিকের কথার মধ্যেই এ যুগে দেখেছি, যেমনটি দেখেছি তাঁর 'ইদানীং'-এ।

বিন্যাসের সৌকুমার্য বজায় রেখে জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাপুঞ্জকেও যদি সহজ সরল সরস কথায় বর্ণনা করা যায় তা হলে জীবনকাহিনীও হয়ে ওঠে উপন্যাসের মতো পরম উপভোগ্য। য়ুরোপায় সাহিত্যে এ ধরণের বই যে কতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে Emil Ludwig, আঁদ্রে মোরোয়া প্রভৃতি লেখকের জীবনীগ্রন্থ যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা তা জানেন। আমাদের দেশে ত কত স্মরণীয় দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন যুগে—কিন্তু তাঁদের জীবনের কথা Will Durant-এর মতো প্রকাশ করতে পেরেছেন কজন ?

নিজেদের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাগুলোকেও কেউ যদি সরস সরল ও স্বচ্ছন্দ কথার মারফতে প্রকাশ করতে পারেন, তবে সে কথাগুলোও হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক। মাঝে মাঝে চিন্তার স্ফুলিঙ্গ থাকলেও জীবন-কথার সহজ, সরল ও সার্থক প্রকাশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র' ও 'ছেলেবেলা' অনবদ্য। আত্মম্ভরী মানুষের অহংকৃত কথাও যে সরসতার গুণে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আবার শিল্পীর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে দেখলে সে জীবনকথা পরিণতি লাভ করে 'রম্যোপন্যাসে'—যেমন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত।

স্মৃতির গহনে অবতরণ করে নিজের জীবনের এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ঘটনাপুঞ্জকে বৈঠকী হাল্‌কা কথার ভঙ্গীতে প্রকাশ করে প্রায় দুই দশক পূবে আমাদের আনন্দ দিয়েছিলেন পরলোকগত সিভিলিয়ান চারুচন্দ্র দত্ত—তাঁর 'পুরোনো কথা' লিখে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীতে জীবন-কথা পড়ে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখিত একটি কবিতায়।

শুধু লৌকিক জগতের কথা কেন, আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর কথাগুলোকেও যদি হাল্‌কা ঝরঝরে কথায় প্রকাশ করা যায় সে কথা সংসারী লোকের মনেও আনন্দ দিতে পারে। শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত' এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আজকাল প্রবল নাস্তিকতার দিনেও এ ধরণের কথাকে সরসভাবে বলে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় কথা-রসিকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'-এ। শুধু কাব্যোচ্ছ্বসিত কথার বুদ্‌বুদ ছড়িয়ে ভাবপ্রবণ বাঙালী পাঠক সমাজে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমা প্রকৃতি সারদামণি' প্রভৃতি এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলো।

বর্তমান যুগ হল প্রবল বুদ্ধিবাদের যুগ। জগতের যা কিছু পুরাতন ও সনাতন, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তার পুনর্মূল্য নির্ধারণ করার চেষ্টা চলছে দিকে দিকে। সহজ সরলভাবে কথা বললে সে কথা শুনতে চায়না কেউ আজ। তাই সমস্ত জগতের কথা-রসিকদের কথাগুলো হয়ে উঠছে আজ ভয়ানক বাঁকা-চোরা, আর তীব্র, তীক্ষ্ণ স্যাটায়ারে ভরা। ছোট ছোট কথার ভেতর সে কী বিদ্যুতের দীপ্তি! খাপ-খোলা তলোয়ারেব মত সে কথার আঘাতে মানুষের পুরণো ধারণা, পুরণো সংস্কার যাচ্ছে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে—আর মানুষের চোখের সামনে জেগে উঠছে সংস্কারমুক্ত এক বিরাট বিপুল জগৎ। য়ুরোপে জর্জ বার্নার্ড শ, ইব্‌সেন ও অস্কাব ওয়াইল্ডের কথাব বিদ্যুৎঝলকের দীপ্তি কেউ কি কখনও ভুলতে পারবে? এই কথার মাবফতেই একটা নতুন, সংস্কারমুক্ত জগতের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁরা। এঁবা প্রধানতঃ নাটকীয় কাহিনীর মাধ্যমেই প্রকাশ কবেছেন তাঁদের নতুন কথাগুলো। কিন্তু তির্যক্ ভঙ্গীতে কথা বলে কাব্যকথায়ও নতুন ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে মনোজগতে নবযুগ সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছেন আধুনিক কোন কোন ইংরাজ কবি।

আমাদেব দেশের রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর অন্তরও কথা-জগতের এ নতুন ভঙ্গী-আন্দোলন থেকে পিছিযে থাকেনি। তাঁর 'শেষের কবিতা'র ঝলমলে বিদ্যুৎদীপ্ত কথাগুলো বাংলা কথাশিল্পের জগতে এক আকস্মিক আবির্ভাব। বাঁশরী নাটকেও স্যাটাযাবিক কথার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ। 'বাঙ্‌লার জি, বি, এস্',—প্রমথ বিশীব 'ঋণং কৃত্বা' ও 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকেও আধুনিক কৃত্রিম জীবনেব প্রতি চমৎকাব স্যাটায়ারিক ভঙ্গী। তবে এদিকে আমাদেব দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক হলেন 'পরশুরাম'। আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে যা কিছু ভণ্ডামী দেখেছেন তাকেই আঘাত করেছেন তিনি হাস্যরস-সমুজ্জ্বল স্যাটায়ারিক কথায়। কাহিনীতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কবে, সংলাপের ভেতব বসসিঞ্চন কবে সহৃদয়ভাবে তিনি আঘাতকেও করে তুলেছেন মধুর। এই আনন্দোজ্জ্বল জগতের রূপ দেখি তাঁর 'কজ্জলী', 'গড্ডলিকা' ও 'হনুমানের স্বপ্নে'। তাঁর 'গল্পকল্প' ও 'ধুস্তুরিমায়ার জগৎ' একটু সূক্ষ্মভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের স্যাটায়ারিক কথাগুলো আগের মত তেমন রসসৃষ্টি করতে পারেনি—অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের কাছে। তবু পরশুরাম বাংলা দেশে অন্বর্থনামা—তাঁর স্ব-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথা-রসিক।

সোজাভাবে কথা না বলে কথার মারপ্যাঁচ খেলে প্রতিকূল প্রতিবেশকেও যে অনুকূল করে তোলা যায়, তার প্রমাণ সার্থক রাজনীতিজ্ঞের ও আইনজ্ঞের বুদ্ধিদীপ্ত কথা। Shakespeare-এর *Julius Caesar* নাটকে Antony শুধু কথার মারপ্যাঁচের সাহায্যে কিভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন সে কথা কি কেউ ভুলতে পারবে? সামাজিক জীবনেও রাজনৈতিক জগতের মত সুন্দর কথার প্রভাবের উদাহরণ অফুরন্ত। এ ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও দেখি, যে ব্যক্তি হাল্কা-চালে সরস সুন্দর কথা বলতে পারেন, তিনি এক মুহূর্তেই মানুষের হৃদয় জয় করে হয়ে ওঠেন সকলের প্রিয়।

সাহিত্য

১

রোমান্টিক সাহিত্যের ভূমিকা

সাহিত্য আলোচনায আমবা রোমান্টিক শব্দটি হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু বোমান্টিক সাহিত্যেব স্বরূপ-লক্ষণ কী এ কথা জিজ্ঞেস কবলে সাধারণ পাঠক কেন, সাহিত্যের অধ্যাপককেও অনেক চিন্তা করে উত্তব দিতে হয়। চিন্তা কবে উত্তব দিলেও সাহিত্যে বোমান্স-ধর্মেব অর্থ অনেকটা ভাসা-ভাসা থেকে যায। শ্রোতা বা পাঠকেব চোখেব সামনে সাহিত্যের এ বিশেষ প্রবণতাটিব একটা সামগ্রিক ও স্পষ্ট রূপ হঠাৎ ভেসে ওঠে না। ইংবেজী সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্বে রোমান্স-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এ ধবনের আলোচনাব অপ্রতুলতা সহজেই চোখে পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থেব সীমাবদ্ধ পবিসবে আমি সাহিত্যেব এই বিশেষ ধর্মটি সম্বন্ধে আলোচনা কবব।

সাহিত্যে রোমান্টিক আদর্শেব আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাসিক আদর্শ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধাবণা কবে নেওযা প্রযোজন। কাবণ সাহিত্যেব এই উভয় আদর্শ পরস্পববিরোধী। বোমান্টিক শিল্পী জগৎ ও জীবনকে দেখেন একান্তভাবে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আব ক্লাসিক শিল্পীব আদর্শ একেবারে নৈর্ব্যক্তিক। প্রকাশভঙ্গীব দিক দিয়ে ক্লাসিক শিল্পীব বচনা কতকগুলো নিযমনির্ভর, আর বোমান্টিক শিল্পীর সৃষ্টি খেয়ালী, কল্পনাশ্রযী। চিন্তার শৃঙ্খলা, নিয়মেব কঠোর বন্ধন, বিন্যাসে পাবম্পর্য অনুসবণ এবং প্রকাশেব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ক্লাসিক শিল্পীর আদর্শ, আব কল্পনার উদ্দামতা, নিয়মকে উল্লঙ্ঘন, যুক্তিব পারম্পর্যকে অস্বীকার এবং প্রকাশেব ক্ষেত্রে আলোআঁধাবি সৃষ্টি বোমান্টিক শিল্পীব বৈশিষ্ট্য। স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দৃষ্টি দিযে ক্লাসিক শিল্পী দেখেন ব্যক্তি, সমাজ, দেশ বা বিশ্বেব যথাযথ রূপ; আর বোমান্টিক শিল্পী এ নিবাভবণ রূপ দেখে তৃপ্তি লাভ কবতে পাবেন না বলে খেয়ালী কল্পনাব পাখায় ভর কবে উড়ে বেড়ান কক্ষ হতে কক্ষান্তবে—একটি সুন্দর জীবন ও জগৎ সৃষ্টির প্রত্যাশায়।

আরও বিস্তৃততব বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের এই উভয ধর্মেব বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করা যাক।

Classic শব্দের আভিধানিক অর্থ হল—কালের বিচারে যা উৎকর্ষ অর্জন করেছে বা যাকে আদর্শ হিসেবে নেওয়া যায় বা যে সৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যিক-অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে (of allowed excellence, cited as a model, often referred to as standard, having literary associations, Oxford Dictionary)। আর classical শব্দের আভিধানিক অর্থ হল—যে রচনা সহজ, সুসমঞ্জস, সমন্বিত, এবং সংযত,—যা একদা বিদগ্ধ প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন লেখকদের রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল (of the standard Greek and Latin authors (of education) based on these ; in the simple, harmonious, proportioned, restrained style characterising classical writers and artists.—Oxford Dictionary)।

তা হলে classical সাহিত্যের মোটামুটি লক্ষণ হল যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং সংযত ভাবসম শান্ত বর্ণনা। ইংরাজ সমালোচক Walter Pater ক্লাসিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

"What is classical comes to us out of the cool and quiet of other times as a measure of what a long experience has shown us will, at least, never displease us."

ক্লাসিক সাহিত্যের উদাহরণ স্বরূপ Walter Pater উল্লেখ করেছেন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্যের, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর Dryden ও Johnson-এর যুগের রচনার। বাংলা সাহিত্যেও ক্লাসিক-ধর্মী রচনার উদাহরণের অভাব নেই। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গদ্য-প্রবন্ধ ক্লাসিক আদর্শ চিহ্নিত।

সাহিত্যের ক্লাসিক-ধর্মের উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা রোমান্স-ধর্ম ও রোমান্টিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

Romance শব্দের আভিধানিক অর্থ হল :

Tale with scenes and incidents remote from ordinary life, this class of literature, episode or love-affair suggesting it, atmosphere characterising it, tendency to be influenced by it, sympathetic imagination, exaggeration or picturesque falsehood, etc.

আর Romantic শব্দের আভিধানিক অর্থ হল :

Marked by or suggestive of or given to romance, imaginative, visionary, fantastic, unpractical (r. scene, story, adventure, girl, project), (of literary and artistic method etc.) preferring grandeur or picturesqueness, or passion or irregular beauty to finish and proportion, subordinating whole to parts or form to matter (opposed classic, classical)—Oxford Dictionary.

আভিধানিক অর্থের মধ্যেই সাহিত্যে বোমান্টিক ধর্মের পবিচয় কতকটা ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। যে কাহিনী, দৃশ্য বা ঘটনা বর্ণিত হয় এমন কিছুকে অবলম্বন করে যা আমাদেব সাধারণ জীবনে সহজলভ্য নয়, যে রচনা কল্পনাধর্মী, স্বপ্নচাবী, বা কোন অদ্ভুত ঘটনাকে কেন্দ্র কবে লিখিত, যে রচনার বিষয়বস্তু বাস্তব-সম্পর্কহীন কিংবা যে বচনায আডম্বরপ্রিয়তার দিকে ঝোঁক বেশী, চিত্রধর্মিতা বেশী, আবেগের তীব্রতা বেশী, কিংবা যে বচনায় মাত্রাতিবিক্তভাবে অস্বাভাবিক সৌন্দযসৃষ্টিব (irregular beauty) প্রযাস বর্তমান, যার ফলে অংশবিশেষের নিকট বচনাব সামগ্রিক রূপ কিংবা (form) সাহিত্যেব বহিরঙ্গ ভাববস্তুর (matter) নিকট গৌণ হযে যায তাকে বলা যায় romantic.

তা হলে দেখা গেল, সাহিত্যের বোমান্স ধর্ম ক্লাসিক-ধর্মের প্রায বিপরীত।

এই তো আভিধানিক অর্থে বোমান্সেব অর্থ। এখন সাহিত্যে এই বোমান্স-ধর্ম কি ভাবে আত্মপ্রকাশ কবে তাই আমাদেব বিবেচ্য।

সাধারণভাবে বলতে গেলে লেখকেব চেতনা যখন তীক্ষ্ণভাবে এবং কল্পনা যখন উদ্দামভাবে বিচ্ছুরিত হয তখনি বলা হয সাহিত্যে বোমান্সেব স্পর্শ লেগেছে। Walter Pater শিল্প-কর্মে বোমান্সেব স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, রোমান্স হল "the addition of strangeness to beauty", অর্থাৎ কিনা সৌন্দযসৃষ্টিতে যখন অদ্ভুতেব সমাবেশ হয তখনি হয বোমান্সেব জন্ম। Pater আবো বলেন, যে কোন শিল্পকর্মে সৌন্দর্যসৃষ্টি হল মূল প্রেরণা, এই সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে যখন কৌতূহল মিশ্রিত হয তখনি বুঝতে হবে সে সৃষ্টিপ্রেরণা রোমান্সেব খাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

তা হলে বোঝা গেল কৌতূহল-বোধ ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ এ উভয়ই হল রোমান্স-ধর্মের মৌল প্রেরণা। বোমান্সের অভিব্যক্তির সঙ্গে এ দুটো বৈশিষ্ট্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এর মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য মননধর্মী, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

আবেগধর্মী। এ প্রেরণার বশেই রোমান্টিক শিল্পী তাঁর রিক্ত, রুক্ষ, বিবর্ণ পারিপার্শ্বিকতা থেকে পলায়ন করেন এমন একটা সৌন্দর্যময় জগতে—যে জগৎকে কলঙ্কিত করেনি বাস্তবতার সুকঠোর অভিশাপ। উদাহরণের সাহায্যে এ বক্তব্যকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রথমতঃ বাস্তবলাঞ্ছিত জগৎ থেকে একটা স্বপ্নময় সুন্দর জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ইংরাজ রোমান্টিক কবি Keats-এর আবেগময় ভাবোচ্ছ্বাস দেখুন :

Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies ,
Where but to think is to be full of sorrow
And laden-eyed despairs,
Where beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new love pine at them beyond to-morrow.

Away ! away ! for I will fly to thee,
Not charioted by Bacchus and his pards,
But on the viewless wings of Poesy,
Though the dull brain perplexes and retards ,
Already with thee ! tender is the night,
And haply the queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays ;
But here there is no light,
Save what from heaven is with the breezes blown
Through verduous glooms and winding mossy ways.

[*Ode to Nightingale*]

আবার এই প্রেরণার প্রভাবে স্বপ্নচারী কবি রবীন্দ্রনাথ পরিক্রমণ করেন বিস্মৃত অতীত যুগে সৌন্দর্যের সন্ধানে :

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহু দূরে পথ চিনে চিনে [স্বপ্ন, কল্পনা]

কিংবা সৌন্দর্যচেতনায় বিমুগ্ধ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সৃষ্টি করেন একটি অনুভবযোগ্য সুন্দর জগতের :

আজি ফাগুনী চাঁদের জ্যোছনা আলোতে
ভুবন ভাসিয়া যায়—
তোরা তারালোক হতে পরী বিহঙ্গী
পাখা মেলে উড়ে আয়,—
এই শ্যামল কোমল ঘাসে
এই শিশির-ভেজানো কাশে
এই বনমল্লিকা বাসে
এই ফুরফুরে মলয়ায়—
তোরা তারালোক হতে পরী বিহঙ্গী
পাখা মেলে উড়ে আয়।

এদিকে আধুনিক সৌন্দর্যবিলাসী কবি জীবনানন্দ দাশ প্রবল কৌতূহলের বশে তাঁর কল্পনার নায়িকার সৌন্দর্যের তুলনা খুঁজে ফেরেন সুদূর অতীত জগতে :

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে "এতদিন কোথায় ছিলেন?"
পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

[বনলতা সেন]

এখানেই রোমান্টিক শিল্পীর ভাবপ্রকাশের আদর্শ ক্লাসিক শিল্পীর আদর্শ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ক্লাসিক শিল্পীর চিন্তা যেখানে সংযত, প্রকাশের ভঙ্গী যেখানে সংহত ও স্পষ্ট, রোমান্টিক শিল্পীর ভাবাবেগ সেখানে উদ্দাম, কল্পনার বিস্তার সেখানে সুদূরপ্রসারী এবং সৌন্দর্যরচনার উপাদানও সেখানে অলঙ্করণবহুল।

কিন্তু এ লক্ষণগুলিই রোমান্টিক সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় নয়। রোমান্সের ব্যঞ্জনা আরও বহুবিস্তৃত এবং বৈশিষ্ট্য আরও জটিল। কাজেই সাহিত্যে রোমান্স-ধর্মের মর্মে প্রবেশ করবার চেষ্টা করা যাক।

ইংরেজী সাহিত্যের জনৈক বিখ্যাত ইতিহাসকার তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে

রোমান্সের যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, আমাদের মনে হয় রোমান্সের মর্ম উপলব্ধিতে সেগুলো খুবই সহায়ক। তাঁর মতে (১) সূক্ষ্ম রহস্যবোধের চেতনা, (২) মননপ্রধান উদ্দাম কৌতূহলবোধ, এবং (৩) জীবনের মৌলিক সরলতার প্রতি একটা সহজ মমত্ববোধ (a subtle sense of mystery, an exuberant intellectual curiosity and an instinct for the elemental simplicities of life)—এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যকে প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক পদবাচ্য করে তোলে।

সাহিত্যে প্রকাশিত রোমান্সের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে এখন আমরা বিশ্লেষণ করব এবং এ সমস্ত প্রবণতা সাহিত্যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা দেখবার চেষ্টা করব।

(১) লেখকের অন্তরে এই সূক্ষ্ম রহস্যবোধের চেতনা (subtle sense of mystery) সৃষ্টির প্রক্রিয়া কি? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অজানার সম্মুখীন হয়ে স্রষ্টার অন্তরাবেগ যখন জটিলতা প্রাপ্ত হয়, অথবা জানা বস্তুকে স্রষ্টা যখন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখেন, কিংবা যে কোনও বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখে স্রষ্টার অন্তরে যখন অতুলনীয় ভাবে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় তখনি স্রষ্টার অন্তরের চেতনা একটা বিস্ময়ের আকারে দেখা দেয়। Theodore Watts-Dunton স্রষ্টার এই মানসিক অবস্থাকে অভিহিত করেছেন—The Renascence of Wonder বলে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাস্তববাদী শিল্পী সাধারণতঃ যা চিন্তা করেন বা অনুভব করেন বা যে সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসমস্যাকে রূপ দেবার জন্য আগ্রহান্বিত হন, রোমান্টিক শিল্পী ঠিক সে রকম চিন্তা বা অনুভব করেন না, এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে চিন্তা বা অনুভূতির রাজ্যে একটা তির্যক্ পথে বিচরণ করে থাকেন। অনুভূতির ক্ষেত্রে এই বিশিষ্টতার জন্য ইংরেজ-শিল্পী মার্লোর দৃষ্টি একদিন জগৎকে বিচলিত করেছিল, আর স্কটের ভাবকল্পনা মধ্যযুগের সৌন্দর্য আহরণে ব্যাপৃত হয়ে সে যুগের ইংরেজী সাহিত্যে রসপিপাসুর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল।

জীবন সম্পর্কে শিল্পীর এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বাংলাসাহিত্যেও যুগান্তর উপস্থিত করেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমের রচনায়। সুদূর অতীত ইতিহাসের স্বপ্নাচ্ছন্ন পথে বিচরণ করে রোমান্টিক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র যে সৌন্দর্যময় জগতের সৃষ্টি

করেছিলেন সে জগতের মাধুর্য একদিন অতর্কিতে বিস্ময়ান্বিত করেছিল বাঙালী পাঠককে।

রোমান্সসৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান fantastic ও bizarre অর্থাৎ একটা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এ ধরনের পবিবেশ-সৃষ্ট পাঠকেব অন্তরে কৌতূহলেব সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভাবরসের সঞ্চার করে। সমালোচক মোহিতলাল এ উপন্যাসে রসসৃষ্টির উৎস বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন :

"ইহাব প্রধান বোমান্টিক কাব্যরস হইয়াছে সেই বস্তু ইংবাজীতে যাহাকে বলে grotesque ও bizarre, একটা দুর্জ্ঞেয় ভীষণ অনৈসর্গিক ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে, ওই তান্ত্রিক কাপালিক ও তাহাব ক্রিযাকলাপে সেই বস সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাও লক্ষণীয যে এই কাহিনীর আবম্ভ হইযাছে যেরূপ ভীষণ-গম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশেব মধ্যে, শেষও হইয়াছে সেরূপ অনুরূপ পরিবেশে।"

বোমান্স-ধর্মের উপাদান বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে উক্ত ইংবেজ লেখক আব একটি বৈশিষ্ট্যেব দিকে সাহিত্যিকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। তিনি বলেন, একটা অদ্ভুত, অবাস্তব জগতের বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বোমান্সসৃষ্টি শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা পবিণতি লাভ করে প্রাত্যহিক জীবনের শান্ত ক্ষুদ্র কলধ্বনির মধ্যে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সাহিত্যের রোমান্স-ধর্ম ব্যাপক অর্থে একেবাবে বাস্তব-পবিপন্থী নয়। বরং এ কথা বলা চলে যে, একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিস্তৃত অনুভূতিব সাহায্যে বাস্তব যখন রূপান্তরিত হয় বাস্তবাতীত অপর একটি সত্তায তখনি হয প্রকৃতপক্ষে বোমান্সের সৃষ্টি। বোমান্সেব এই গভীরতব ব্যঞ্জনার কথা স্মবণ কবে Compton-Rickett ইংবেজ ঔপন্যাসিক Scottকে বোমান্স-প্রবণতা সত্ত্বেও বাস্তবধর্মী ঔপন্যাসিক বলে অভিহিত কবেছেন।* তাঁব মতে সাহিত্যে বোমান্স ধর্মেব এই ব্যাপক ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই স্কট তাঁব রোমান্টিক উপন্যাসে স্কটল্যাণ্ডের জীবনধাবাব যথাযথ পবিচয় দিতে পেরেছিলেন।

* In other words, Romanticism is not opposed to Reality ...In the deep sense of the word, Marlow and Scott are realistic because of their Romanticism Scott realised it perfectly in his faithful pictures of Scottish life and character.—*A History of English Literature*,—The Romantic Revival, Pp 298.

তা হলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে রোমান্সের ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ: সংকীর্ণ অর্থে রোমান্স হল সেই ধরনের সাহিত্যিক প্রকাশ, চমৎকারিত্ব-সৃষ্টিই হল যার প্রধান উদ্দেশ্য, জীবনের কুৎসিত দিক থেকে যা চোখ ফিরিয়ে নেয়; জীবনের চারিদিককার বাস্তব পরিবেশ থেকে স্রষ্টার দৃষ্টি যখন পলায়ন করে উত্তীর্ণ হয় এমন একটা রাজ্যে যেখানকার নায়ক-নায়িকা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চেনা নায়ক-নায়িকা থেকে অনেক বেশী সুন্দর ও মহৎ, আর যে রাজ্যে জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিও আমাদের জীবনের চাইতে অনেক বেশী সম্পূর্ণ। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ রোমান্টিক শিল্পীর রচনাই এরূপ তরল ভাবালুতার আশ্রয়স্থল।

ব্যাপক অর্থে রোমান্সের ব্যঞ্জনা গভীরতর ও বহু-বিস্তৃত। এ অর্থে বিচার করলে দেখা যায়, জীবনেব বাস্তবতার মধ্যেও বোমান্সের ফুল ফুটছে। তবে সে বাস্তবতা শুধু মানুষের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; যে বাস্তব বিস্তৃত হয়ে আছে মানুষেব অভিজ্ঞতাব জগতের ভিতরে ও বাইরে—সর্বত্র। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে Romantic Revival যুগের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কবা যেতে পারে। এ যুগে দেখা যায় ইংবেজ-শিল্পীরা তাঁদের কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও চিত্র-শিল্পে গ্রীসীয়-বোমীয় ক্লাসিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবে এমন একটি সুন্দব জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, যে জগতের সৌন্দয ও মাধুর্য ব্যাপ্ত হয়ে আছে পৃথিবীর ধূলিপুঞ্জ থেকে আকাশের গ্রহতারকা পর্যন্ত। অবশ্য এই বহুবিস্তৃত জীবনেব বহুবিচিত্র উপাদান নিয়ে সাহিত্যে সার্থক রোমান্স সৃষ্টি করা একটি গভীরতর দৃষ্টি ও সৃষ্টি-প্রতিভা সাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য।

ইংরেজ সমালোচক Earnest Raymond তাঁর *Through Literature to Life* নামক গ্রন্থে বোমান্সের এই বহুবিস্তৃত অর্থ-ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

Romance lies behind everything in this world—everything from the largest to the smallest, from the sublimest to the most ridiculous, from the loveliest to the ugliest, from the firmament of stars on this cloudless night to the speck of lamp-dust that has fallen on my paper as I write.

আসলে দৃষ্টি যেথানে উদার, মন যেথানে উন্মুক্ত, সেখানে পৃথিবীর যে কোন বস্তুর মধ্যে রোমান্সের মাধুর্য খুঁজে পেতে দেরি হয় না। ভাবুকতা যেথানে তরল,

দৃষ্টি যেখানে সংকীর্ণ সেখানে দর্শক শুধু চাঁদের আলোর সুষমার মধ্যে কিংবা তরুণ-তরুণীর প্রেমোচ্ছ্বাসের মধ্যে রোমান্সের উপাদান খুঁজে থাকেন। দৃষ্টির গভীরতার অভাবে তাঁরা প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে কিংবা কদর্যতার মধ্যে রোমান্টিক সৌন্দর্যের আভাস পান না। সাহিত্যে রোমান্স-ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে Schopenhauer-ও ঠিক এ রকম কথাই বলেছেন :

If the subject be in a receptive mood, almost everything now falling within his apperception will begin to speak to him, *i.e.* to create in him a vivid, penetrating and original thought. Hence at times the aspect of an unimportant object or event has become the germ of a great and beautiful work.

গভীরতর অর্থে রোমান্সের স্পর্শ সেই সোনার কাঠির স্পর্শ যার ছোঁওয়া লাগলে লোহাও সোনা হয়ে যায়।

এখন রোমান্সের উপাদান বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম রহস্যবোধের চেতনা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। জীবনের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে থাকে তার সৌন্দর্য-মাধুর্যের আবেদন তৎক্ষণাৎ শিল্পি-মনে সাড়া জাগায় না, যেমন সাড়া জাগায় বর্তমান জীবন-পরিবেশ থেকে বহু দূরবর্তী জীবনধারার কাল্পনিক সৌন্দর্য। সেজন্য রোমান্টিক শিল্পী সৌন্দর্য রচনার উপাদান খোঁজেন প্রাচীন গাথা কাহিনী কাব্য এবং ইতিহাসের বহুবিচিত্র জীবনধারার মধ্যে। মধ্যযুগের জীবনধারার রহস্য-মধুর রূপ ইংরেজী সাহিত্যে Romantic Revival যুগের শিল্পীদের মনের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, কবি হাইনে (Heine) সাহিত্যের এই বিবর্তনের ভেতর শুধু সে যুগেব জীবনের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেয়েছিলেন। ইতিহাসের নীরস কঙ্কালময় ঘটনার সঙ্গে রোমান্টিক মাধুর্য যুক্ত করে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এক অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন শক্তিমান লেখক Chateaubriand এবং Scott ; আর বাংলা সাহিত্যে সেই স্বপ্নময় জীবনের প্রেরণায় এক অপূর্ব রূপজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ এবং রাখালদাস।

শুধু উপন্যাসের বিস্তৃততর পটভূমিকায় নয়, লিরিক কবিতার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও এই সূক্ষ্ম রহস্যবোধের চেতনা ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করেছিল তা যে কোন সন্ধানী সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। কাব্য-

সৃষ্টিতে Romantic Revival যুগে এই রহস্যবোধের চেতনা অবশ্য ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছিল। এ যুগের রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলী এমন কি আরও পরবর্তীকালের কবি টেনিসনের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর এ রহস্যবোধের চেতনা একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছিল। কারণ এঁদের নিসর্গ-প্রীতি পূর্বযুগের লেখক শেক্‌স্‌পীয়রের চাইতে একেবারে আলাদা। শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য-নাটকে আমরা দেখি প্রকৃতির বাস্তব রূপ তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত। আর রোমান্টিক যুগের কবিরা যেন প্রকৃতির মর্মে প্রবেশ করে তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতি দেখা দিয়েছে শান্তরসাস্পদ চিন্তার বাহনরূপে ; আর শেলীর কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা উদ্দীপনাময় ও প্রেমের প্রবর্তনায় গভীর। এক কথায় প্রকৃতি তাঁদের চোখে শুধু জড় বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ মাত্র নয়—প্রকৃতি একটি সজীব সত্তা এবং মানবমনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব অসামান্য। শেক্‌স্‌পীয়র শুধু সুন্দর ফুলের মাধুর্য বর্ণনা করেই নীরব থাকেন, আর টেনিসন সুন্দরী প্রকৃতির পটভূমিকায় মানব-অন্তরের বিচিত্র ভাবাবেগকে চিত্রায়িত করে আনন্দ পান। সমকালীন ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র ভালবেসেছিলেন প্রকৃতিকে। প্রশ্ন করেন নি কোথাও তিনি এ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের উৎস কোথায় এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপের বিকাশেরই বা রহস্য কি ? আর টেনিসন তাঁর যুগের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি দিয়ে মানুষের ভাবপ্রবণতার মূল্য যাচাই করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমান বিজ্ঞান প্রকৃতির ঐশ্বর্যময় ভাবনির্ভর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে এই রহস্য-চেতনার ক্রমবিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় টমসনের প্রকৃতি-বিষয়ক *Seasons* কাব্যের যুগ থেকে ব্লেকের গীতিকাব্যের যুগ পর্যন্ত। এ বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি এ সমস্ত কবির অন্তরঙ্গ ভাবোচ্ছ্বাস ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছে প্রকৃতির ঐন্দ্রজালিক রহস্যের বিরুদ্ধে একটা তীব্র বিমুখিতায়।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যেও প্রকৃতি ও মানবজীবনকে অবলম্বন করে এই রহস্যবোধের চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে বিচিত্র ভঙ্গীতে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের (বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের) কাব্যে এই রহস্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও গভীর। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে

এই রহস্যবোধের চেতনা বাঙালী কবির কাব্যে অপ্রত্যক্ষ। কবি শুধু প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করেই নীরব, এই রূপ বর্ণনার ভেতর রূপাতীতের আবির্ভাব-ব্যঞ্জনা নেই (দ্রঃ ঈশ্বরগুপ্তের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতায় এ রহস্যবোধের চেতনা থাকলেও তা খণ্ডিত, অস্পষ্ট। বাংলা কাব্যে এ রহস্যবোধের প্রথম সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় বিহারীলালের কাব্যে। বস্তুতপক্ষে বিহারীলালকেই বলা চলে বাংলা কাব্যে Romantic Revival-এর প্রথম কবি। নব ভাবপ্রবাহের প্রথম কবি বলেই বোধ হয় বিহারীলালের কাব্যে এ রহস্যবোধের চেতনা কবি-অন্তরেই সীমাবদ্ধ, জগতের বিচিত্র রূপের মধ্যে সে চেতনা আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায় নি। বিহারীলালের রোমান্টিক কবিমানস সম্পর্কে সমালোচক মোহিতলালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "বিহারীলালের একনিষ্ঠ কবিহৃদয় এই বিচিত্ররূপিণীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই, তিনি তাঁহার 'অন্তরব্যাপিনী' হইয়াই আছেন।" —("বিহারীলাল চক্রবর্তী", 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য')।

এই রহস্যবোধের চেতনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলালের ভাবশিষ্য হলেও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রবৃত্তি বিহারীলাল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এর কারণ বোধ হয় এই যে মানসিকতার দিক দিয়ে বিহারীলাল আত্মবিস্মৃত কবি ; আর রবীন্দ্রনাথ হলেন পুরোপুরি আত্মসচেতন। সেজন্য বিহারীলাল বাস করেন নিজের অনুভূতিসৃষ্ট একটা অস্পষ্ট ভাবমণ্ডলে, আর প্রকৃতি ও মানবজীবনকে একই বৃন্তে বিধৃত দেখে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন রূপ ও রসে পরিপূর্ণ এক বিচিত্র জগৎ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মোহিতলাল বলেন : "তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী শুধু 'অন্তর মাঝেই একা একাকী' নহেন—জগতের মাঝেও তিনিই 'বিচিত্ররূপিণী'।...বিহারীলাল এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী ; রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ; মন ও প্রাণ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তিনি মনকেই প্রশ্রয় দিলেও সর্বত্র প্রাণের একটি সূক্ষ্ম আবরণ রক্ষা করিয়াছেন ; বিহারীলাল মনকে বড় একটা আমল না দিয়াই প্রাণকেই প্রামাণ্য করিয়াছেন।" —(দ্রষ্টব্য, "বিহারীলাল চক্রবর্তী",—'আধুনিক বাংলা সাহিত্য')।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-পরবর্তী বহু রোমান্টিক কবি এই রহস্যবোধের চেতনায় যে উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি করেছেন তা পৃথিবীর যে কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যের গৌরবের বস্তু বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে বিংশ শতাব্দীতে

দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধাক্কায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রসারে এবং সাম্প্রতিক কালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও কবি-চিত্তের অস্থিরতার ফলে অত্যাধুনিক বাঙালী কবির রহস্যবোধের চেতনা স্তিমিত এবং দৃষ্টিভঙ্গী যে খণ্ডিত হয়ে পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু জীবনের পীড়নে তাঁদের অন্তরের সুন্দরের স্বপ্ন আজ অন্তর্হিত; তাই বোধ হয় তাঁদের বাক্‌ভঙ্গীও বক্রোক্তিতে পূর্ণ। কিন্তু একটু সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে এই ক্ষীয়মাণ জগৎ ও জীবনপ্রবাহের রূপায়ণে তাঁদের স্পর্শকাতর মন যেভাবে সাড়া দিয়েছে তাতে তাঁদের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে নব্য-রোমান্টিক বলতে বোধ হয় আপত্তি হবে না। এই নব্য-রোমান্টিকতার প্রথম সূচনা দেখা যায় 'মরু-কবি' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে, আর পরিণতি দেখা যায় সমর সেন, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায়। অতি-সচেতন বাস্তববাদী আধুনিক কবি যখন 'পূর্ণিমার চাঁদের' ভেতর 'ঝলসানো রুটি'র স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর দৃষ্টিকে রোমান্টিক দৃষ্টি ছাড়া আর কি বলা যায়?

(২) এবার আমরা রোমান্টিক সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ—একটা মননপ্রধান উদ্দাম কৌতূহলবোধ (an exuberant intellectual curiosity) সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মানুষের বিস্ময় ও সৌন্দর্যবোধের চেতনা যখন বর্ধিত হয়, কল্পনাবৃত্তিতে যখন চমক লাগে তখন তার মনন-শক্তির ওপরেও যে সে প্রভাব অনিবার্যভাবে বিস্তৃত হবে তা খুবই স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য দেশে Romantic Revival যুগের শিল্প সাহিত্য এমন কি দর্শনের ওপরেও এই মনন-প্রধান সৌন্দর্যচেতনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

প্রথমে পাশ্চাত্য শিল্পরচনার ক্ষেত্রে এই মনন-প্রধান উদ্দাম কৌতূহলবোধ Romantic Revival যুগে (যাকে Gothic Revival ও বলা হয়) কি ভাবে একটি নবযুগ সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় দেওয়া যাক। এ যুগের শিল্পীদের সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণার উৎস ছিল সাহিত্যিকদের মতই মধ্যযুগ এবং তাঁদের সৌন্দর্যচেতনার বিকাশ হয়েছিল দুটো প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে। বিস্মৃতপ্রায় মধ্যযুগের শিল্পকর্মগুলি এক দিকে যেমন করেছিল তাঁদের আবেগধর্মী বিস্ময়বোধের চেতনাকে উদ্দীপ্ত, আর একদিকে তেমনি করেছিল তাঁদের মননধর্মী কৌতূহল-বোধকে তীব্রতর। এ যুগের শিল্পরচনার রীতি ছিল প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম।

শিল্পকর্মে সৌন্দর্যের সমাবেশ ছিল শিল্পীর লক্ষ্য ; প্রচলিত শিল্পরচনার নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করাতেই ছিল এ যুগের শিল্পীদের আনন্দ। অতীতাশ্রয়ী সৌন্দর্যরচনার ভিত্তিতে একটা রমণীয় রূপ-জগৎ সৃষ্টির ওপরেই নির্ভর করছিল তাঁদের শিল্পি-মনের মুক্তি। মধ্যযুগের প্রাণৈশ্বর্যকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার এ প্রচেষ্টার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে সমকালীন অনেক শিল্প-সমালোচক এ যুগের রোমাণ্টিক শিল্পীদের বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্প রচনার ক্রমবিবর্তনের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন, মধ্যযুগের প্রতি উদ্দাম কৌতূহলবোধই করেছিল মননপ্রধান Pre-Raphaelite শিল্পিগোষ্ঠীর সৃষ্টি—যাঁদের তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যচেতনা মনন-শীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য শিল্পরচনার ক্ষেত্রে একটা নবযুগ সৃষ্টি করেছিল।

আমাদের দেশের শিল্পরচনার ক্ষেত্রে এই Romantic Revival-এর অভ্যাগম অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও তার ইতিহাসও প্রায় অনুরূপ। এই মননপ্রধান কৌতূহলবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তো শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ বাঙালী শিল্পিবৃন্দ প্রাণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ আমাদের দেশের অতীত জীবনকে শিল্পরচনার মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন এবং আমাদের দেশের শিল্পি-সমাজকে অনুকরণের মোহ থেকে মুক্ত করে একটা রসমধুর বিস্মৃত সৌন্দর্যময় জগতের সন্ধান দিয়েছেন।

এই মনন-প্রধান উদ্দাম কৌতূহলবোধের প্রেরণায় মধ্যযুগের বিচিত্র জীবন-ধারা নিয়ে অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছেন স্কট তাঁর *Ivanhoe* উপন্যাসে, আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক রোমান্সে। উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথও এই পথেই বিচরণ করেছেন বঙ্কিমের রোমান্সের রাজপথ অনুসরণ করে (দ্রষ্টব্য, বৌঠাকুরাণীর হাট)। ইংরেজী সাহিত্যে প্রাচীন গাথাকাব্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেও রয়েছে একই প্রবৃত্তির প্রেরণা।

স্রষ্টার এই প্রবৃত্তি অবশ্য সব চাইতে বেশী সাহায্য করেছে Romantic Revival যুগে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের মেজাজ পরিবর্তনে। এ পরিবর্তনের প্রথম আভাস পাওয়া যায় এ যুগের প্রারম্ভে প্রাচীন কবিদের কাব্যরীতির বহিরঙ্গের অনুকরণে। অবশ্য এ যুগের কবিরা ক্রমে ক্রমে এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র আঙ্গিকের অনুসরণ দ্বারা কাব্যের প্রাণে কখনও সজীবতার সঞ্চার করা যায় না। কাব্য বা যে কোন শিল্পসৃষ্টির আত্মায় নবীন

চেতনার ছোঁয়া লাগাতে হলে প্রয়োজন প্রাচীন শিল্পের ভাবাদর্শ ও প্রবণতার পুরোপুরি আত্মসাৎকরণ।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ডে প্রকাশিত Percy-র *Reliques of Ancient English Poetry* এ প্রসঙ্গে একটি স্মরণযোগ্য কাব্য-সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে Percy প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের প্রাচীন বীরগাথা সঙ্গীত এবং আরও অনেক প্রাচীন ইংরেজী কবিতা। এই কবিতাগুলির ভাবসম্পদই অনুপ্রেরণা দিয়েছিল Romantic Revival যুগের ইংরেজ কবিদের একটা নতুন রূপজগৎ ও ভাবজগৎ সৃষ্টি করতে। এ কাব্যগুলির ছন্দোবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে এ যুগের শক্তিমান কবি কোলরিজ ও কীট্‌স্ সৃষ্টি করেছিলেন এক শ্রেণীর নতুন কবিতা—যার মাধুর্য তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট করেছিল সমসাময়িক কাব্যরস-পিপাসু পাঠকসমাজকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবি-মানসের ওপর এ সমস্ত কাব্য-কবিতার প্রভাব গভীর না হলেও স্কট রসেটি উইলিয়ম মরিসের কাব্যপ্রচেষ্টায় এ সমস্ত প্রাচীন কবিতার প্রভাব অবিসংবাদিত। Percy-র *Reliques* ছাড়া Romantic Revival যুগে কবিদের মননপ্রধান কৌতূহলবোধকে জাগ্রত করেছিল আর একখানি কাব্যগ্রন্থ—সেখানি হল Macpherson-এর *Ossian*। এই কাব্যখানির ভাবব্যঞ্জনা ও ছন্দোগরিমার প্রভাব Percy-র *Reliques*-এর মত এত সর্বব্যাপী না হলেও প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের মূল্যকে নতুন করে উপলব্ধি করতে এ কাব্যখানিও এ যুগের কবিদের সাহায্য করেছিল প্রচুর।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি এই মননপ্রধান কৌতূহলবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ অবগাহন করেছিলেন আমাদের ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক কাহিনীতে বৌদ্ধ জাতকে বৈষ্ণব কাব্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ও নানা দেশীয় গাথা-কাব্যে। এই সমস্ত প্রাচীন কাহিনীর সৌন্দর্যরসে আপ্লুত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনী-কাব্যগুলিতে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যের জগৎ উদ্ঘাটিত করেছিলেন তা শুধু রবীন্দ্র-কাব্যের গৌরব বাড়িয়েছে তা নয়—তাঁর সমসাময়িক বহু কবিকে একই সূত্র অবলম্বন করে রোমান্টিক কাব্য রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বৈষ্ণব-কবির রোমান্টিক সৌন্দর্য-জগৎ-মুগ্ধ তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথমে শুধুমাত্র বৈষ্ণব কবিতার (বিশেষ করে বিদ্যাপতির কবিতার) বহিরঙ্গের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে সে রূপ ও রসের রোমান্টিক চেতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হয়ে তাঁর কাব্যকে

যে বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছিল তার প্রমাণ হল কবির 'গীতাঞ্জলি' ও বৈষ্ণব-ভাবরসাত্মক বহু গান ও কবিতা। উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস ও গাথা-কাব্যাশ্রিত কাহিনীগুলিতে তিনি যে নতুন সৌন্দর্যের ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাও তাঁর মননপ্রধান উদ্দাম কৌতূহল-বোধেরই ফল।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ এবং শেলীর কবিতা আলোচনা করলে আমরা দেখি তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাব্যে সুদূরপ্রসারী কল্পনানুভূতির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের কাব্যকে প্রকৃতপক্ষে উৎকর্ষ দান করেছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং সবল মননশক্তি। রবীন্দ্রকাব্যেও আমরা দেখি সুদূরপ্রসারী কল্পনার সঙ্গে তীব্র সৌন্দর্যচেতনা এবং গভীর মননধর্ম যুক্ত হয়ে কবির অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে (দ্রষ্টব্য "বসুন্ধরা", "সমুদ্রের প্রতি", "অহল্যার প্রতি", "বর্ষশেষ" প্রভৃতি)। রবীন্দ্র-কবি-জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতেও অবশ্য জগৎ জীবন ও সৃষ্টিরহস্যকে কেন্দ্র করে গভীর মননধর্মিতার পরিচয় মেলে। কিন্তু এ কবিতাগুলি সম্পর্কে এ মন্তব্য বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয় যে প্রবল সত্যদিদৃক্ষার ফলে এ সমস্ত কাব্য-কবিতায় রোমান্সের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। সে জন্য সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলেও এ পর্যায়ের কবিতাগুলি সাধারণ রবীন্দ্র-কাব্যপাঠকের চিত্তে সহজ রস-সংবেদনার সৃষ্টি করতে পারে নি। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে মনন-প্রধান উদ্দাম কৌতূহলবোধের প্রেরণায় মানব-জীবনকেন্দ্রিক স্বপ্ন রোমান্টিক সৌন্দর্যলোক উদ্ঘাটিত করেন অমিয় চক্রবর্তী সুধীন দত্ত বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবি তাঁদের কাব্য-কবিতায়।

রোমান্সের উপাদান হিসেবে আবেগপ্রধান উদ্দাম কৌতূহলবোধের সঙ্গে মননের সংমিশ্রণ কথাটা আপাততঃ অসংলগ্ন ও স্বতোবিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে এতে অসংলগ্নতা বা স্বতোবিরোধিতার কিছুই নেই। উদাহরণস্বরূপ শেলীর বিখ্যাত কবিতা The Cloud বা The West Wind বা রবীন্দ্রনাথের "সমুদ্রের প্রতি", "বসুন্ধরা" বা "বর্ষশেষ" কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণ পাঠক এ সমস্ত কবিতার ভাববস্তুতে হয়তো অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে ভাবের বিস্তার দেখে নিরাশ হবেন, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ সমস্ত কবিতায় কবির বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুসরণ ও সত্য আবিষ্কারের নিষ্ঠা দেখে চমৎকৃত হবেন সন্দেহ নেই। Romantic Revival

যুগের ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা গদ্য-সাহিত্যের ওপরেই অবশ্য এই মননপ্রধান রোমান্সের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বেশী।

মননধর্মী রোমান্টিক প্রবৃত্তি Romantic Revival যুগের ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে যে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল সে কথা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই জানেন। এই বিশিষ্ট সৃষ্টি-প্রেরণার প্রভাবে এ যুগের সমালোচনা সাহিত্যস্রষ্টারা ছিদ্রান্বেষণ কার্য থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন কার্যে ব্যাপৃত হন। কবিমানসের সৃষ্টিমূলক রূপ দিতে এ যুগের সমালোচকেরা মুখর হয়ে ওঠেন। এ যুগের কবি-সমালোচক কোলরিজ সমালোচনার যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সে পদ্ধতি সমালোচনা-জগতে বিশৃঙ্খল বাগ্‌বিস্তারের স্থলে বিশ্লেষণ-পদ্ধতির শৃঙ্খলা আনয়ন করে; সমালোচ্য বিষয়কে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে এই নব্য সমালোচনাপদ্ধতি পূর্বযুগের একতরফা রায়-দান প্রবৃত্তিকে বর্জন করে। এই নব্য সমালোচনার মাপকাঠি-রূপে বিবেচিত হয় সমসাময়িক সাহিত্যিক সংস্কার ও সাহিত্যাদর্শ। সাহিত্য-সমালোচনায় এই অভিনব পদ্ধতির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এ যুগের মূল্যবান ব্যঞ্জনাময় সমালোচনা-সাহিত্য—যা আজও ইংরেজী সাহিত্যের গৌরবের বস্তু বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। রোমান্টিক কল্পনার প্রভাবেই এ যুগের সমালোচনা একাধারে মননধর্মী ও ভাবকল্পনা-উদ্দীপনকারী। রূপের (form) দিক দিয়ে এ সময়কার সমালোচনা মননধর্মী, কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপক ও গভীর মর্ম উদ্‌ঘাটনে এ সমালোচনা নিঃসন্দেহে কল্পনাশ্রয়ী। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গেও বোধ হয় একই মন্তব্য প্রযোজ্য। মননগ্রাহ্য বিশ্লেষণশক্তি ও হৃদয়গ্রাহ্য রোমান্টিক প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন ভাবব্যঞ্জনাময় সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে তার উৎকর্ষ এখনও আমাদের দেশে স্বীকৃত।

(৩) এখন আমরা রোমান্সের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জীবনের মৌলিক সরলতার প্রতি একটা সহজাত মমত্ববোধের ফলে স্রষ্টার মনে যে একটা রোমান্টিক চেতনার সৃষ্টি হয়—সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

জীবনের মৌলিক সরলতার প্রতি সহজাত মমত্ববোধের ফলে রোমান্স-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় Romantic Revival যুগের ইংরেজী কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে। সাহিত্যে এ প্রবৃত্তি-সঞ্চারের পুরোধা ছিলেন অবজ্ঞ মনীষী

দার্শনিক রুশো। মানবতার মহিমা উপলব্ধি ও মানবীয় প্রেমের শক্তির জয়গানে তাঁর লেখনী ছিল ক্লান্তিহীন। পরবর্তীকালে Edward Carpenter ও William Morris প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদীদের রচনায় বর্তমান জটিল নাগর-সভ্যতার বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তার সূচনা দেখা যায় রুশোর রচনাতে।

সৃষ্টির আদিম সারল্যের প্রতিমূর্তি হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতির প্রতি স্রষ্টার একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী Romantic Revival যুগের সাহিত্যকে একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সভ্যতার চাপে মানুষ সংস্কারান্ধ হয়ে তার জীবনের মৌলিক সারল্যকে যে ভুলে গেছে তার প্রতিবাদস্বরূপ যেন এ যুগের কবি-সাহিত্যিকেরা তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে একেবারে প্রকৃতির মর্মে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। স্রষ্টার মনের এই প্রবৃত্তি জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক হবার বৃহত্তর প্রচেষ্টার একটা দিককেই সূচিত করে মাত্র। এর ফলে দেখা যায় এ যুগের বিশিষ্ট কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর ব্লেক শৈশবের স্বপ্নময় দিনগুলিকে নিয়ে সৌন্দর্যরচনায় বিভোর হয়ে আছেন। আর আধুনিক সভ্যতার প্রভাবমুক্ত সহজ সরল প্রাণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ প্রকৃতির সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনে একাগ্রচিত্ত হয়েছেন কবি বার্ণস্‌ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর কোলরিজ। যে গভীর রহস্যবোধের চেতনায় এ যুগের কোন কোন কবি অতীতে মানসভ্রমণ করতে ভালবাসতেন তাঁরাও ক্রমে ক্রমে এ কথা উপলব্ধি করতে পারলেন যে—শুধুমাত্র মধ্যযুগের স্বপ্নাচ্ছন্ন পথে নয়—প্রাত্যহিক জীবন-পরিবেশের সরলতা ও স্বাভাবিকতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৌন্দর্যের অনন্ত প্রস্রবণ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ কোলরিজ শেলী কীট্‌স্‌ প্রভৃতি কবির রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনাময় কবিতাগুলি পড়লে যে কোন সাধারণ পাঠকেরও চোখে পড়বে যে মানুষের বাস্তব-পরিবেশের অতি সাধারণ অতি পরিচিত বিষয়—যেমন, সূর্যাস্তের অতি পরিচিত দৃশ্য, কোন পাহাড়ের ওপর একটুখানি বেড়িয়ে আসার অনুভূতি, বসন্তের একগুচ্ছ ফুল, বৃষ্টি-সম্ভব পশ্চিমে হাওয়া, নাইটিংগেল পাখির গানের মাধুর্য, পল্লীবাসী কোন মেয়ে কিংবা উপত্যকাবাসী অতি-সাধারণ কোন মানুষ—তাঁদের স্মরণীয় কাব্যসৃষ্টির অনুকূল হয়েছে।

প্রকৃতি ও মানবজীবনের আদিম সারল্যের প্রতি সহজ মমত্ববোধের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল এখন সে

সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। এ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা কাব্যের তৃণগুল্মহীন নীরস ক্ষেত্রে ক্লাসিক সাহিত্যের বিরাট আদর্শ স্থাপন করলেন অসাধারণ সৃষ্টিপ্রতিভার অধিকারী মধুসূদন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে তিনি বাংলা কাব্যের মর্মে সঞ্চারিত করে দিতে চাইলেন এমন একটি রস যার অস্তিত্ব ছিল বাঙালী জীবনে অতি ক্ষীণ। তথাপি কবির ভাষার ঘনঘটা বিচিত্র ভাবের উদ্দীপনা এবং নভোচারী কল্পনা সমসাময়িক বাঙালী পাঠকের চিত্তকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিল। এর পর চলল বাংলা কাব্যে মধুসূদনের সক্ষম ও অক্ষম অনুকরণ। আঙ্গিক না হোক—ভাব-গভীরতার দিক দিয়ে হলেও হেমচন্দ্র আর নবীনচন্দ্র মাইকেলের অনুকারীদের মধ্যে সার্থক। তার পরে ক্লাসিকপন্থী বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে দেখা দিল ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর অনাবৃষ্টি। ক্লাসিকতার ক্ষেত্রে এ ব্যর্থ অনুকারীর দল পারল না এক দিকে স্বর্গ-মর্ত্যের অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব-মথিত জীবন-কাহিনী নিয়ে বীররস সৃষ্টি করতে, আর এক দিকে মানব ও প্রকৃতি-জীবনের সহজ সরলতার আবেদনও রইল তাঁদের কবি-কল্পনা থেকে বহুদূরে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ছায়ালেশহীন এই উষর ক্ষেত্রে অকস্মাৎ নব ভাবধারা প্রবাহিত করে দিলেন একজন ভাববিভোর কবি—শিক্ষা দীক্ষা বা সংস্কারে যাঁর সঙ্গে ইতিপূর্বেকার বিদগ্ধ কবি মাইকেল, হেম বা নবীনচন্দ্রের তুলনাই হয় না। ইনি হলেন আধুনিক বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার প্রথম পুরোহিত বিহারীলাল। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবমুক্ত অসংস্কৃত বাঙালীর জীবন এবং নগরকেন্দ্রের বাইরে উদার-উন্মুক্ত প্রকৃতির রূপ ও রসকে অন্তরে অকৃত্রিম ভাবে অনুভব করে তিনি তাঁর হৃদয়-বীণায় যে নতুন সুরের ঝঙ্কার তুললেন সে সুরের স্পর্শে বহু যুগের জড়তাগ্রস্ত অহল্যার যেন শাপমুক্তি হল। বাংলা কাব্য নতুন প্রাণ পেল। আদিম প্রকৃতি ও প্রকৃতির সন্তানের প্রতি এই যে বিস্ময়ের দৃষ্টি—বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নূতন।

এই দৃষ্টিস্নানে স্নাত হয়েছেন তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ। এই দৃষ্টির প্রভাবেই তো রবি-কবির অন্তরের সহস্রতন্ত্রী বীণায় বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার উঠেছে এবং তাঁর কাব্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যের মধ্যে একটা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকদের মধ্যেও প্রকৃতি ও মানবজীবনের সরলতার প্রতি সহজ মমত্ববোধের ফলে রোমান্সের সৃষ্টি কোন কোন কবির কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাববিভোর

বিহারীলালের মত কারও কাব্যের প্রেরণা এত অকৃত্রিম বলে মনে হয় না। এ উক্তির একমাত্র ব্যতিক্রম মনে হয় ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের দৃষ্টি ও সৃষ্টি। তাঁর কাব্য পড়লেও মনে হয় প্রকৃতি ও মানবজীবনের প্রাকৃত সারল্যের প্রতি একটা সহজাত মমত্ববশেই যেন তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। আদিম প্রকৃতি ও মানবজীবনের অকৃত্রিম সরলতার প্রতি দুজন কবির অন্তরের অনুরাগ যে কত গভীর ছিল তার একটা বিশিষ্ট প্রমাণ তাঁদের কাব্যে প্রাকৃতজনের ভাষা ব্যবহার।

রোমান্টিক কবির মনোভাবের মধ্যে মানবতার মূল্য উপলব্ধির যে প্রেরণা দেখা যায় আসলে এ প্রেরণাই কালক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে মানবীয় আদর্শে মহীয়ান করে তুলেছে। আমেরিকার সাহিত্যে দেখা যায় ইমার্সনের অধ্যাত্ম-নির্লিপ্ততা, জীবনকে সর্বনিম্নস্তরের মধ্যে উপলব্ধিতে থোরোর চেষ্টা এবং সুন্দর নির্জনতার অনুভূতি, হুইটম্যানের উদ্দাম উন্মুক্ত জীবনবোধ ও সাম্যবাদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ—এ সমস্তই রোমান্টিক মনোবৃত্তির প্রভাবের ফল। এ ছাড়া বাইরন ও শেলীর কাব্যে ফরাসী বিপ্লবের কোন কোন ভাবাদর্শকে গ্রহণ স্বাধীনতার জয়গান এবং স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও সাহিত্যে যে মানব-মহিমা প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস দেখা যায়—সে প্রয়াসের উৎস ও প্রেরণায় ছিল রোমান্টিক ভাবধারার পুনরুজ্জীবন।

উপসংহারে এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের এই রোমান্টিক আন্দোলনের ভেতর একটা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ, এ আন্দোলন প্রধানতঃ ছিল একটা ভাবাত্মক আন্দোলন এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী আবেগসুলভ একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ছিল এই আন্দোলনকারীদের মুখ্য প্রয়াস। সমসাময়িক জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির দিকে এই Romantic Revival যুগের শিল্পীরা প্রায়ই দৃক্‌পাত করবার অবকাশ পান নি। এ যুগের শিল্পীদের দৃষ্টি সমষ্টিগত মানুষের ওপর না পড়ে ব্যক্তি-মনকেই আলোকিত করেছিল বেশী। এ যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিক সমসাময়িক জীবন থেকে পলায়ন করে যা কিছু প্রাচীন সংস্কার-বহির্ভূত অদ্ভুত এবং বর্ণসম্পদে উজ্জ্বল তার মধ্যে জীবনের সমস্ত গৌরব নিহিত আছে মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

একটা বিপুল আবেগবন্যায় জীবন ও চিন্তার সমস্ত প্রচলিত ধারণাকে ভাসিয়ে নেওয়াই হল সমস্ত ভাবান্দোলনের প্রধান লক্ষণ। উদ্দাম বাতাসের প্রবল ধাক্কা যখন লাগে তখন অনেক সময় অর্গলবদ্ধ জানলা পর্যন্ত খুলে যায়। ইংরেজী সাহিত্যে এই রোমান্টিক ভাব-প্রবাহের উদ্দামতা-প্রসঙ্গে এ কথাটা খুবই স্মরণযোগ্য যে—পূর্ব যুগের সাহিত্যকে গতানুগতিকতা ও সংকীর্ণতামুক্ত করতে এ রকম একটা প্রবল ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। রোমান্টিক ভাবধারার মধ্যে যে একটা নব-প্রাণের স্পর্শ এবং উদার বিস্তৃতি আছে তার প্রভাবে এ যুগের সাহিত্যের ভাব-গভীরতা ও প্রসার যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল—তা পূর্ব আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হবে।

রোমান্টিক যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও উক্ত মন্তব্যগুলো সমভাবে প্রযোজ্য। এ কথা খুবই সত্য যে এ যুগের সাহিত্যশিল্পীর সৌন্দর্যসন্ধানী চেতনায় মানবতার মূল্যায়ন-প্রয়াস অসম্পূর্ণ, তথাপি এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে একটি রহস্যসন্ধানী সৌন্দর্যচেতনাময় দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা মানব-জীবনের যে মহিমা উপলব্ধির চেষ্টায় উন্মুখ ছিলেন—সে প্রেরণাই উত্তরকালের বাঙালী সাহিত্য-শিল্পীকে মানবতাব সর্বাঙ্গীণ মূল্যনির্ণয়ে সহায়তা করেছে।

ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তব সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ মননপ্রধান সবল ও সুস্থ সাহিত্য-নির্মাণ-প্রচেষ্টার ওপব বন্ধনহীন উদ্দাম সৌন্দর্যচেতনায় আবিষ্ট রোমান্টিক কবি-সাহিত্যিকদের যে প্রভাব—উত্তরকালের মননশীল, জীবনবাদী সাহিত্যের উপরও বাঙালী রোমান্টিক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের সে প্রভাব। সাহিত্যসৃষ্টি-লীলার বিচিত্র গতিপথ যাঁরা অনুধাবন করেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করবেন যে একটা বিশিষ্ট যুগধর্ম থেকে সৃষ্টিধর্মী প্রেরণা লাভ না করলে কোন সাহিত্যের সর্বতোমুখী বিকাশ সম্ভব নয়।

২

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা বিচার

ইতিহাস বাস্তব ঘটনানির্ভর, আর উপন্যাস কল্পনাশ্রয়ী। সুতরাং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটিকে শোনায় 'সোনার পাথর বাটি'র মত। কিন্তু পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা প্রমাণ করেছেন ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে কথাশিল্পীর তন্নিষ্ঠ (objective) দৃষ্টি ও সহৃদয় অনুভূতি মিশ্রিত হয়ে রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচিত হওয়া সম্ভব।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা বিচার-প্রসঙ্গে প্রথমে ইতিহাস ও ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। না হলে এরূপ বিচার কার্যে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

এক সময়ে মনে করা হত ইতিহাস ও কাহিনীর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানা যায় না। বস্তুতপক্ষে 'ইতিহাস' কথাটি গ্রীক-মূল—যার অর্থ হল অনুসন্ধানের সাহায্যে কোন খবর জানানো। Augustine Birrell তাই ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে :

"The natural definition of history…is the story of man upon earth, and the historian is he who tells us any chapter or fragment of that story."

কিন্তু এই যে মানুষের কাহিনী সে কি সত্য-নিরপেক্ষ? আধুনিক সমালোচক মনে করেন, যে মুহূর্তে এ কাহিনী কোন যথাযথ বা লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা থেকে চুলমাত্রও বিচ্যুত হয় তখন তা ইতিহাস-ধর্ম বর্জিত হয়ে রূপান্তরিত হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে A. T. Sheppard বলেন :

"To my mind, the moment any chapter or fragment of that story wanders by a hair's breadth from exact and established fact, the historian ceases to be an historian and becomes an historical novelist."*

* Sheppard. A. T.—*The Art and Practice of Historical Fiction*—p. 12.

কিন্তু ইতিহাসের ধর্ম সম্পর্কে এ ধারণা লোকের বরাবরই ছিল এমন কথা বলা চলে না। আমাদের দেশে তো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাস্তব-নির্ভর ইতিহাস লেখবার রেওয়াজ খুব বেশী দিনের নয়। এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও ইতিহাস লেখবার প্রথম যুগে Bede প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনাশ্রয়ী ঘটনার মিশ্রণ ঘটাতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সত্য ঘটনার উপর কল্পনাসমৃদ্ধ মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করতে না পারলে সে ইতিহাস ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে না। এ প্রসঙ্গে Dean Inge বলেন :

"The motives for falsifying history are in exact proportion to the interest of posterity in knowing the truth. Falsified history has perhaps had more influence than true history."

কিন্তু কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ ধরনের ইতিবৃত্তকে কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। Sir Robert Walpole এ ধবনেব ইতিহাসের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে তাঁর ছেলেকে সোজাই বলেছিলেন : "Read anything but history, for history must be false." Lord Chesterfield-এর মতে "History is only a confused heap of facts." আর ইতিহাস সম্পর্কে Carlyle-এর বক্তব্য হল : "...it is the essence of innumerable Biographies; a distillation of rumours; the letter of instructions which the old generations write and posthumously transmit to the new."

তা হলে আদর্শ ইতিহাসের রূপ হবে কী—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। এ সম্পর্কে মেকলের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। মেকলে বলেন :

"The perfect historian must possess an imagination sufficiently powerful to make his narrative affecting and picturesque; yet he must control it so absolutely as to content himself with the materials which he finds, and to refrain from supplying deficiencies by additions of his own. He must be a profound and ingenious reasoner; yet he must possess sufficient self-command to abstain from casting the facts in the mould of his hypothesis."

কিন্তু ইতিহাস রচনায় সত্য উপস্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে Cervantes যে মন্তব্য করেছেন তাতে ইতিহাসের প্রকৃত ধর্ম পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে :

"History is like sacred writing, because truth is essential to it..."—Cervantes.

এবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্ম কী তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা যাক।

উপন্যাসের ধর্ম বিশ্লেষণে মনস্বী রাসকিন একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন : উপন্যাস হল "A feigned, fictitious, artificial supernatural, put-together-out-of-one's-head thing."

বর্তমান বাস্তবধর্মিতার যুগে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিচারে রাসকিনের "feigned, fictitious, artificial, superficial" প্রভৃতি লক্ষণগুলি স্বীকৃত হবে না সত্য, কিন্তু উপন্যাস যে "put-together-out-of-one's-head thing" এতে সন্দেহ নেই।

গত এক শতাব্দী ধরে বহু চিন্তাশীল লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। একটা বিষয়ে প্রায় সকল লেখকই একমত—ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের বিচরণভূমি হল অতীতে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমালোচক A. T. Sheppard বলেন : "An historical novel must of necessity be a story of the past in which imagination comes to the aid of fact." John Buchan বলেন : "an historical novel is simply a novel which attempts to reconstruct the life and recapture the atmosphere of an age other than that of the writer."

এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞার আর একটু বিস্তারও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধু অতীত ঘটনানির্ভর নয়, এ ধরনের উপন্যাসে অতীত জীবন পুনর্গঠন ও অতীত পরিবেশের পুনঃস্থাপন-প্রয়াসও দেখা যায়। এই যে অতীত, সে কতকালের অতীত? John Buchan বলেন : "The age may be distant a couple of generations or a thousand years." কিন্তু শুধুমাত্র নিরঙ্কুশ কল্পনার সহায়তায় অনির্দিষ্ট অচিহ্নিত অতীতকে নিয়ে উপন্যাস ইতিহাস-সচেতন পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে না পারারই

সম্ভাবনা। সেজন্যে Jonathan Neild ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা বিচারে আর একটু সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেন: "A novel is rendered historical by the introduction of dates, personages, or events, to which identification can be readily given."

Arnold Bennett ভিন্নতর প্রেক্ষিত থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় এমন একটি যুগের পুনঃসৃষ্টি করেন যে যুগে তিনি বর্তমান ছিলেন না (the first thing about an historical novel is that the author re-creates in it an age in which he did not live.)।

বেনেটের উক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞাকে মর্যাদা দিতে গেলে আলেকজাণ্ডার ডুমার *'The She-wolves of Machecoul'* বা টলস্টয়ের *'Sevastopol'* উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করাই চলে না। কারণ দুজন ঔপন্যাসিকই উপন্যাস-বর্ণিত কাল-সীমার মধ্যে বা কাছাকাছি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

'অতীত' কথাটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণিত কালকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন Leslie Stephen। তাঁর মতে অন্ততঃ ষাট বছরের অতীত জীবনকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হতে পারে (স্কটের মতে অবশ্য পঞ্চাশ বছরের অতীত; বস্তুতপক্ষে তাঁর *'Waverley'* উপন্যাসের উপশীর্ষ-নাম তিনি দিয়েছিলেন—"*'Tis fifty years since.*")। চিন্তাশীল সমালোচক A. T. Sheppard-ও মনে করেন, পঞ্চাশ বছরের অতীতকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে। কারণ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যৌবন পরিণত হয় বার্ধক্যে, মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধরা সংসার থেকে বিদায় নেয়। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ বছর কালের ব্যবধানে আদব-কায়দা, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই বিবর্তিত বা পরিবর্তিত হয়। ধ্বংস ও অনিবার্য পরিবর্তন গত যুগের ঐশ্বর্যময় জীবনের উপর ম্লান ছায়া বিস্তার করে এবং সে জীবনকে সমসাময়িক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনীয় জীবনকে কোন নির্দিষ্ট কালসীমায় সীমাবদ্ধ করতে গেলে ঔপন্যাসিকের স্বাধীন কল্পনার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয় সেজন্যে জার্মান ঔপন্যাসিক Friedrich Spielhagen তাঁর বিখ্যাত

'*Technik des Romans*' নামক গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে : "The historical novel is one that portrays a time on which the light of the living generation's memory does not fall any longer in its full force."

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে সমস্যার সমাধান বোধ হয় সহজতর হয়ে আসে। যে জগতে আমরা একদিন বাস করতাম সে জগৎ যখন কালের ব্যবধানে আমাদের চোখের সামনে রহস্যময় রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং সে অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে প্রবেশ করে যখন আমরা সৌন্দর্যের মধু আহরণ করি তখনই হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পরিচয় দান প্রসঙ্গে তাই A. T. Sheppard তাঁর '*The Art and Practice of Historical Fiction*' গ্রন্থে বলেছেন :

"The really great historical novelists, it seems to me, are those who invest and surround their characters—the men and women 'of lost years' with the haze of wistfulness and glamour which is comparable to that gloss or film on pre-historic implements and weapons ; time's own work, not to be copied by any human tool or process."

শেপার্ডের উক্ত সংজ্ঞা মেনে নিলে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রশ্নাতীত কৃতিত্বের অধিকারী হলেন—Scott, Dumas, Ainsworth, Lytton, Hugo, Bernard Capes, Henry, Hewlet, Manzoni, Merezhkovsky, Jokai, Sabatini এবং Mary Johnston. স্কটের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে Cervantes, Bunyan, Defoe, Lever, Smollet, Fielding প্রভৃতি প্রথমোক্ত লেখকদের মত এত উচ্চশ্রেণীর শিল্পনৈপুণ্যের অধিকারী না হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস-শিল্পী হিসেবে তাঁদের নামও অনুল্লেখ্য নয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মুখ্য উপকরণ সংগৃহীত হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। সেজন্যে অনেকের ধারণা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা বুঝি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক

বা রাজনৈতিক উপন্যাসের চাইতে সহজতর। শেষোক্ত ধরনের রচনায় শিল্পীকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বা সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় লেখককে বিষয়বস্তু বা চরিত্র-পরিকল্পনার জন্যে তেমন হাতড়ে বেড়াতে হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্পর্কে এ লোক-প্রচলিত ধারণা যে কতটা ভ্রমাত্মক তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় *'The Path of the King'*, *'Midwinter'*প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক John Buchan-এর মন্তব্য থেকে। Buchan বলেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস হল সকল শ্রেণীর উপন্যাস-শিল্পের মধ্যে কঠিনতম সৃষ্টি। জনৈক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক অকুণ্ঠভাবে এমন স্বীকৃতিও জানিয়েছেন,—প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে তাঁর যে সময় ব্যয় হয়েছে তার পঞ্চমাংশ সময়ে তিনি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাস লিখতে সক্ষম হয়েছেন। এই দু' ধরনের (ইতিহাস-কেন্দ্রিক) উপন্যাস রচনায় যিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার দুরূহতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

সকল শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা দুরূহতম—এর অন্যতম প্রধান কারণ, এ ধরনের উপন্যাস রচনায় লেখককে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয় বিগত যুগের এমন একটি জগতে যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুধু পুঁথিগত। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকের মত লোক-চরিত্রজ্ঞান না থাকলে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতে তাঁর ব্যর্থতার সম্ভাবনা পদে পদে। এ ছাড়া এমন অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার যা শুধু পুস্তকের সাহায্যেই লভ্য। যেমন, যে বিগত যুগের ঘটনা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করবেন সে যুগের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, আইন-কানুন, চিকিৎসা-পদ্ধতি, ধর্মশাস্ত্র, বংশানুক্রম প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানিক তথ্য, পোষাক-আশাক প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা যদি স্পষ্ট না হয় এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রাচীন যুগের যথাযথ বর্ণনা যদি তিনি দিতে না পারেন,—তা হলে কালানৌচিত্য-দোষে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অতীত জগৎ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান, মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের আয়ত্তে থাকা চাই একটি সূক্ষ্ম শিল্পকৌশল—যে কৌশলের সহায়তায় তিনি সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন বিপুল ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রবল সংঘাতময় ঘটনা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। এ ছাড়া

স্ব-যুগের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতার মূলে। কিন্তু এ স্বচ্ছন্দ জীবন-পরিচিতি শুধুমাত্র জনতার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বা কল্পনার জানলা দিয়ে জীবনকে দেখার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না। তার জন্যে চাই সর্বযুগের জীবনের প্রতি স্রষ্টার অন্তহীন সহানুভূতি।

কালনিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ মানব-জীবনের সঙ্গে একাত্মতার ফলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তবিকপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়ী মূল্য অর্জন করে। পৃথিবীর সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সার্থকতার মূলেও রয়েছে একটা সহৃদয় মানবতার স্পর্শ—যে স্পর্শ স্রষ্টা, চরিত্র ও পাঠককে একই অদৃশ্য সূত্রে বিধৃত করে। ইতিহাস-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক যখন পাঠক-মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করতে পারেন তখনই হয় এই শ্রেণীর উপন্যাস সার্থক।

অতীত যুগের মর্মমূলে প্রবেশ করবার জন্যে অতীত যুগের ভাষা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য লেখকের নিজের ভাষায় প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষকভাবে লেখবার ক্ষমতা থাকা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পুরাতত্ত্বজ্ঞান তাঁর ভাষাকে যদি আর্য-ভাবাপন্ন করে তোলে তা হলে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনোমুগ্ধকর কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি করা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের কাছে আবেদনহীন হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিচারে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লেখকের কল্পনাসমৃদ্ধি ও সৃষ্টিপ্রতিভা। ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক একান্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে বাধ্য—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য—বিগত যুগের রীতিনীতি, সুর ও মেজাজকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক জীবন্ত করে তুলবেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। ইতিহাসের জড় কঙ্কালকে সজীব ও সরস সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করবার জন্যে যে ক্ষমতার প্রয়োজন যে শক্তিকে হাড্‌সন অভিহিত করেছেন—"Creative imagination" ও শেপার্ড চিহ্নিত করেছেন—"Realistic imagination" বলে। এই creative বা realistic imagination যে কত দুর্লভ শক্তি তা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক মাত্রই উপলব্ধি করেন। অতীত ঘটনাকে অবলম্বন করে কল্পনা-সমৃদ্ধির সাহায্যে বর্ণাঢ্য রূপ ও রস-জগৎ সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বস্তুতপক্ষে ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের ঔপন্যাসিকমাত্রই এ ধরনের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র রসকল্পনার উপর আত্যন্তিক

নির্ভরতার ফলে বহু লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাসও যে নিছক রোমান্সে পর্যবসিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলেকজাণ্ডার ডুমার উপন্যাস। এমন কি স্কটের সমালোচকেরাও এ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের রচনাকে কালানৌচিত্যদোষে (anachronism) দোষী করতে ছাড়েন নি। যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা শুরু হয় নি, ততদিন পর্যন্ত না হয় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে সত্যভ্রষ্টতার জন্যে ক্ষমা করা যেত। কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠার যুগে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইতিবৃত্তকারের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ যুগের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে একদিকে যেমন একনিষ্ঠভাবে ইতিহাসের দাবি মানতে হয়, আর একদিকে তেমনি শিল্পের দাবিও মানতে হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্কটের পূর্বে বহু উপন্যাসশিল্পী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সত্য, কিন্তু ইতিহাসের আনুগত্যহীনতার জন্যে Walter Raleigh সে সমস্ত লেখককে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অধিকারী বলে মনেই করেন নি। Sir Walter Raleigh ("Secundus") তাঁর বিখ্যাত '*The English Novel*' নামক গ্রন্থে বলেছেন: "The historical novelists who preceded Scott chose a century as they might have chosen a partner for a dance, gaily and confidently, without qualification or equipment beyond a few outworn verbal archaisms." ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির পরিচয় দিলেও অধ্যাপক Saintsbury তাই Scott-এর উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন: "Scott created historical novel after some thousand years of unsuccessful attempt."

ঐতিহাসিক উপন্যাসের টেকনিক কত দুরূহ, স্কটের উপন্যাসের সমালোচনা থেকে তা কতকটা অনুমান করা যায়। ভিক্টোরীয় যুগের কোন কোন সমালোচক স্কটের উপন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও অনেক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সমালোচক স্কটের উপন্যাসকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, কিংবা এত ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন যে তাকে অপ্রশংসার সামিলই বলা চলে। যেমন, কারলাইলের মতে 'ওয়েভারলি' উপন্যাসে স্কটের বড় কৃতিত্ব হল—সেগুলো খুব দ্রুত লিখিত এবং পৃথিবীর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে সব চাইতে বেশী অর্থকরী

হয়েছিল। টেইনও স্কটের উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার অপেক্ষা জনপ্রিয়তার কথাটাই সগর্বে উল্লেখ করেছেন। Leslie Stephen স্কটের বিখ্যাত '*Ivanhoe*', '*Kenilworth*', '*Quentin Durward*' প্রভৃতি উপন্যাসকে ঐতিহাসিকতা বিচারে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। Miss Marjorie Bowen স্কটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও পরবর্তী লেখকদের উপর তাঁর প্রভাব স্বীকারে দ্বিধান্বিত। আর্নল্ড বেনেটের মতে স্কটের উপন্যাস যে শুধু মৌলিকতাহীন তা নয়, বিগত যুগের চিত্রাঙ্কনেও স্কট সব সময় সত্যের অনুসরণ করেন নি। স্কটের কোন কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ প্রশ্নাধীন হলেও এ শ্রেণীর পরবর্তী রচনার উপর তাঁর প্রভাব সমালোচক-মহলে স্বীকৃত। তথাপি স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে এত বিরূপ সমালোচনা দেখে আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা যে কত কঠিন শিল্প-প্রয়াস সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠন-প্রকরণ

উক্ত আলোচনার পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিকসৌষ্ঠব কি রকম হওয়া উচিত সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি নিয়ে য়ুরোপে বহুকালব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র মত আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচিত হয়েছে। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করবার ফলে জনৈক সমালোচক ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণায় উপনীত হয়েছেন ঃ

"It must preserve dignity and avoid grandiloquence, preserve atmosphere and avoid the archaic carried to extremes, preserve accuracy of background and avoid the crowding out of the human interest, preserve strength and avoid the needlessly coarse and ruthless and morbid, preserve the dramatic without being melodramatic, preserve proportion without sacrificing detail."*

ইতিহাসের গাম্ভীর্য থাকবে অথচ ভাবোচ্ছ্বাস থাকবে না, পরিবেশ সৃষ্টি

* **Sheppard, A.T.—*The Art & Practice of Historical Fiction*, p. 82.**

অকৃত্রিম হলেও চরম আর্যভাবাপন্ন হবে না, পটভূমিকা সৃষ্টি যথাযথ হবে অথচ মানবীয় আবেদনের ভিড় থাকবে না, বলিষ্ঠতা (প্রাচীন যুগের) সংরক্ষিত হলেও অনাবশ্যক কর্কশতা, নিষ্ঠুরতা বা অসুস্থ মনোভাব-বর্জিত হবে, নাটকীয় উপাদান থাকলেও অতি-নাটকীয় হবে না, এবং বর্ণনার খুঁটিনাটি অক্ষুণ্ণ রাখলেও পরিমিতি-বোধের পরিচয় থাকবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এর থেকে সুচিন্তিত মতামত আর বোধ হয় হতে পারে না।

কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে রূপ দান করা চিরকালই শিল্পীর পক্ষে দুরূহ কর্ম। উপরে আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা আদৌ কার্যে পরিণত হবে কি না তা সন্দেহজনক। এ পর্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে সেগুলিও সর্বপ্রকারের দোষমুক্ত নয়। এ ধরনের উপন্যাস-শিল্পীর শিল্প-রচনা নেহাৎ দৈব-প্রভাবে না হলে প্রায়ই আদর্শে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। তবুও আদর্শকে সামনে রেখে প্রত্যেক শিল্পীরই শিল্প রচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি কি হবে এখন তাই আমাদের বিবেচ্য। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন বলেন,—ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের প্রথম প্রয়াস হবে মনন-গ্রাহ্য একটা মহৎ ও অখণ্ড বিষয়ের পরিকল্পনা। চিত্রশিল্পী যে ভাবে ভাবদৃষ্টি দিয়ে তাঁর শিল্প-রচনার একটা কাঠামো প্রথমে মনে মনে তৈরি করে নেন, উপন্যাস-শিল্পীকেও ঠিক সে ভাবেই অগ্রসর হতে হবে।*

তারপর প্রশ্ন ওঠে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন। মানুষের জীবন-কাহিনীর মত ইতিহাসের কাহিনীও বহুবিস্তৃত। এই সুবিপুল ঘটনাপুঞ্জ থেকে কোন ঘটনা উপন্যাসের উপযোগী হবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে লেখক প্রথমেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের যে কোন যুগে। যে কোন কাহিনী, নিঃসঙ্গ শ্মশান, ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা, ধ্বংসোন্মুখ নগরী, কিংবা ছোট একটি কবিতাংশের ভেতরেও এ ধরনের উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করতে লেখককে বেগ পেতে হয় না।

* "To my mind a writer should sit down to compose a fiction as a painter prepares to compose a picture. His first care should be the conception of a whole as lofty as intellect can grasp."—Lytton.

কিন্তু কোন্ বিষয়টি গ্রহণ করলে তা রসগ্রাহ্য শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত হবে তা ভেবে লেখক প্রথমে বিভ্রান্ত হন। তাঁর সামনে দ্বিতীয় বিভ্রান্তি আসে উপন্যাসের নাম নির্বাচনে। দু' যুগের কাহিনী নিয়ে রচিত ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস '*A Tale of Two Cities*' নামকরণের পূর্বে ডিকেন্স উপন্যাসখানিব নিম্নলিখিত নামগুলি পবিকল্পনা করেছিলেন :

"Time ! The Leaves of the Forest. Scattered Leaves. The Great Wheel. Round and Round. Old Leaves. So Long Ago. Far Apart. Fallen Leaves. Five and Twenty Years. Day after Day. Felled Trees. Memory Carton. Rolling Stones. Two Generations."

অতএব উপন্যাসের নাম যাতে ভাবানুযায়ী ব্যঞ্জনাধর্মী হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি বাখা প্রথমেই কর্তব্য।

তারপব ইতিহাসের এত চরিত্র ও ঘটনাব ভিড়ের মধ্যে উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা নির্বাচনেও লেখককে কম বেগ পেতে হয না।

অতএব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সর্বপ্রথম বিচার্য হল সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য কি কি উপাদান গ্রহণ এবং কি কি উপাদান বর্জন করা উচিত। এ গ্রহণ-বর্জনেব সুষ্ঠু পবিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর না হলে লেখকেব ঐতিহাসিক উপন্যাস বচনায় সার্থকতা লাভ করবার স্বপ্ন সুদূরপরাহত।

এ হল ঐতিহাসিক উপন্যাস বচনাব সুনির্দিষ্ট কৌশলের কথা। কিন্তু উপন্যাস বচনা একটা যান্ত্রিক কাজ নয়, এবং উপন্যাসশিল্পীও যন্ত্রশিল্পী নন। অতীত ঘটনা বা চরিত্র উপস্থাপনে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সুপরিকল্পিত চিন্তা নিয়ে অগ্রসব হন সত্য, কিন্তু ঘটনা যখন বিস্তাবলাভ করে তখন লেখকের মৌলিক পরিকল্পনার উপর শিল্পীব অনুভূতিনির্ভব কল্পনা যে কখন প্রধান হয়ে ওঠে তা হয়তো শিল্পী নিজেই টের পান না। প্রকৃতপক্ষে এ বন্ধনহীন কল্পনাই তো অতীতের অমসৃণ জড় ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দিয়ে ইতিহাসকে রূপান্তবিত করে হৃদয়গ্রাহী শিল্পকর্মে। প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন,—যে পরিকল্পনা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করতেন পরিসমাপ্তিতে তা ভিন্ন রূপ ধারণ করত। লিখতে লিখতে নিত্যনতুন কল্পনা এসে তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট ছক-বাঁধা উপন্যাসের কাঠামোকে কোথায়

ভাসিয়ে নিয়ে যেত। শুধু স্কটের বেলায় নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস-শিল্পীর শিল্পরচনা-প্রয়াসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। (বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এরূপ অকল্পিত কল্পনা-বিস্তার সমভাবে লক্ষণীয়)। স্কট নিজে তাঁর উপন্যাসে এরূপ অচিন্ত্যপূর্ব কল্পনার আনুগত্য স্বীকার করলেও, এরূপ পন্থা অবলম্বনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে নতুন লেখকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নিজের জার্নালে তিনি লিখেছেন: "A perilous style, but I cannot help it. I would not have young writers imitate my carelessness, however."

উক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রারম্ভে কাহিনীর যে বীজ বপন করা হয় তা ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এমন পরিণতি লাভ করে যে পরিণতির সঙ্গে উৎসের সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। কাহিনী শুরু করেন লেখক সাধারণতঃ স্বল্প কয়েকটি কথার রেখায়, আবার অনেক সময় দেখা যায় কথারম্ভে কাহিনী কোন সুস্পষ্ট রূপই লাভ করেনি। স্টিভেনসনের উপন্যাসের প্রারম্ভে এরূপ ছায়াময় কল্পনার আভাষ পাওয়া যায়। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রারম্ভ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আবার Nathaniel Hawthorne এর উপন্যাসে দেখা যায় উপন্যাস রচনায় তদ্গতভাবে আত্মনিয়োগ করবার আগে তিনি পরিকল্পিত উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার পূর্বেই তৈরি করে নিচ্ছেন। শুধু হথর্ন নয়, স্কট, ডুমা, স্টিভেনসন, হার্ডি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই হাতের কাছে একটা নোটবুক রাখতেন—যার মধ্যে থাকত তাঁদের ভবিষ্যতে লিখিতব্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা। রীড তো দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করতেন এ সমস্ত নোট এবং সংগৃহীত অংশ পাঠ করতে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা মোটামুটি কাঠামো যে কোন সময় যে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও অনেক সময় উপন্যাসের কাহিনী এসে ধরা দেয়। কিন্তু স্বপ্নে যে কাহিনীকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় দিনের আলোকে তাকে মনে হয় অর্থহীন। স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে 'ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইড।' কিন্তু জনপ্রিয় হলেও কাহিনীটির উৎসমূলে একটু দুর্বলতা আছে।

লেখকের প্রিয় কোন বিশেষ স্থানের প্রতি অনুরাগ বহু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। জর্জ ইলিয়টের 'রমলা' এ ধরনের একখানি

করতে গেলে তৃতীয় জর্জের জীবন-চিত্র সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত না করে তাঁকে রাখতে হবে কাহিনীর এক প্রান্তে।

উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত সামাজিক উপন্যাসগুলিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোঠায় পড়ে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক যদি বৃহৎ ঘটনার পটভূমিকায় শুধু বড় বড় চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করেন, তা হলে সমকালীন সাধারণ লোকের জীবনচিত্র সেই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়। অথচ যে উপন্যাসে সমকালীন সর্বস্তরের জীবনের একটি পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না, তাকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না।

ঘটনা নির্বাচনেব মত উপযুক্ত কালনির্বাচনও ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠনের পক্ষে অপবিহার্য। ঘটনার কাল যত দূরবর্তী যুগেব হয় লেখকের পক্ষে ততই তা সুবিধাজনক। কারণ সে কাল সম্পর্কে পাঠকের ধারণা অসম্পূর্ণ এবং অস্বচ্ছ বলে লেখক সে কালকে অবলম্বন করে কল্পনা বিস্তাবের সুযোগ পান বেশী। কিন্তু অস্পষ্ট অতীতেব কাহিনী ভবিষ্যৎ পাঠকেব কাছে বৈচিত্র্যহীন মনে হবার সম্ভাবনা আছে। গবেষণাব ফলে অতীত সম্পর্কে মানুষেব জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পাবে তখন সে-সমস্ত কাহিনীকে অলীক বলে মনে হতে পাবে।

কালনির্বাচন শেষ হলে অতীত যুগের জীবনধারা এবং ইতিহাসের সঙ্গে পবিচিতি লাভ করাব প্রশ্ন ওঠে। পুবনো যুগেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা ভাবসংঘাতের সঙ্গে পবিচয় লাভ কবা এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করে সে সমস্ত ভাব বা ঘটনাকে উপন্যাসেব কাহিনীতে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার—এ ধবনেব কাহিনী যাঁরা বচনা কবেন তা তাঁদের অজ্ঞাত নয়। যে নির্দিষ্ট কালের ঘটনা নিয়ে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন, সে যুগের সম্ভাব্য সকল প্রকাব ইতিহাসেব উপকরণের সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেন। তারপর এই সংগৃহীত তথ্যপুঞ্জেব ভেতব থেকে উপন্যাসেব জন্য কোন্ ঘটনা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় সে সম্পর্কে স্থির কববেন। সর্বশেষে ঐতিহাসিক ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে যেখানে তিনি কোন ফাঁক দেখতে পাবেন তাকে নিজ কল্পনা দিয়ে ভবাট করে তুলে লিখিত ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান করবেন।

এ ছাড়া যে যুগেব কাহিনীকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়, লেখককে পরিচিত হতে হবে সে যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ, মুদ্রা, অপর রাজ্যের

সমসাময়িক ইতিহাস, সমসাময়িক চিঠিপত্র, দৈনন্দিন লিপি, রাজকীয় পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, এমন কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় বইয়েব সঙ্গে। সে যুগের উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানের সঙ্গেও তাঁর পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া ওই যুগের চিত্রশালা কিংবা প্রাচীন কীর্তিব সংগ্রহশালা কিংবা সে যুগের মঠ মন্দির দুর্গ প্রভৃতি সব কিছুব সঙ্গে লেখক যত ঘনিষ্ঠ পবিচিতি লাভ করবেন ততই ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। এক কথায় যে যুগকে কেন্দ্র করে তিনি উপন্যাস লিখছেন সে যুগেব সব কিছুব সঙ্গে যেন তাঁব মোটামুটি অন্তরঙ্গ পবিচয় থাকে।

সুদুব অতীতেব যে স্থানিক পবিবেশকে কেন্দ্র কবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত হয় তাব সঙ্গে লেখকেব পবিচয না থাকলেও সে অপবিচয় খুব বড বাধারূপে দেখা দেয় না। কাবণ, আমাদের সমকালেই এমন অনেক ধ্বংস-প্রায় প্রাচীন স্থান দেখা যায যা আমাদেব প্রাচীন স্থানগুলিকে স্মরণ কবিয়ে দেয। কিন্তু উপন্যাসে প্রাচীন ব্যক্তি-জীবনেব সজীব রূপদান এত সহজসাধ্য কাজ নয়। কাবণ, সে যুগেব নরনারী আমাদের যুগেব নবনাবীর মত শবীরী জীব হলেও তাদের জীবনেব গতি-প্রকৃতি ছিল আমাদের চাইতে আলাদা। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক হলেন তিনি—যিনি বিগত যুগেব নবনারীর চরিত্রের সঙ্গে নিজেব একাত্মতা অনুভব কবেন। কিন্তু অনুভূতিব প্রসাবেব সাহায্যে প্রাচীন যুগেব মানুষেব সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করলেও অতীত যুগেব মৃত নবনাবীকে উপন্যাসে সজীব কবে তোলা এত সহজ কাজ নয়। কাবণ, তাদেব পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অদ্ভুত এবং এ যুগের চাইতে আলাদা। তাদেব অস্ত্রশস্ত্র ছিল এ যুগ থেকে পৃথক, পরিবেশ ছিল ভিন্নতব। তারা যে ভাষায় কথা বলত তা আমাদেব কাছে অজ্ঞাত। যে আইন-কানুনেব দ্বারা তারা পরিচালিত হত তা এ-যুগেব আইন-কানুনের থেকে আলাদা। পৃথিবী এবং স্বর্গলোক সম্বন্ধে তাদেব ধারণা ছিল এ-যুগেব চাইতে পৃথক। যে ধরনের লোকেব সঙ্গে আমরা নিত্য-নিয়ত কথাবার্তা বলছি বা মিশছি তাদেব সম্পর্কে লেখার চাইতে এ ধরণের অজ্ঞাত জীবন সম্বন্ধে লেখা কত কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। তবে বিভিন্ন যুগেব মানুষের জীবনে শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সর্বযুগের মানবমনের একত্ব উপলব্ধিই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে অনুপ্রাণিত করে বিস্মৃত অতীত জীবনের সজীব রূপদানে।

ইতিহাসের ভুল ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে থাকবে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা। কল্পনাশ্রিত ঘটনাকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হলে সে উপন্যাস রূপকথার পর্যায়ে পর্যবসিত হবে—এ মন্তব্য পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন সে ইতিহাসই যদি ভুল তথ্যে পূর্ণ হয় তা হলে ঔপন্যাসিকের অবস্থা কি দাঁড়ায় এখন তাই হবে আমাদের বিবেচ্য। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে—কি পাশ্চাত্য দেশে কি আমাদের দেশে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল সেগুলিকে কল্পনামিশ্রিত রোমান্স বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিচার করে দেখা দরকার, যে যুগে ওই সমস্ত ঔপন্যাসিক ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস লিখে এই বিভাগের সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন তখন ইতিহাসের প্রকৃত রূপ ছিল কী?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ইতিহাস লেখবার পদ্ধতি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। সেজন্য সে যুগের ঔপন্যাসিককে আশ্রয় করতে হত সমকালীন ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত ধারণা-নির্ভর ইতিহাসের কাহিনী। যে নেপোলিয়াম বোনাপার্টিকে সমস্ত পৃথিবীতে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে বিবেচনা করা হয় তাঁর সম্পর্কেও বিভিন্ন ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ তাঁকে বলেছেন একজন প্রচণ্ড প্রতিভাবান ব্যক্তি, কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন একজন মাঝামাঝি ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, আবার কেউ বলেছেন তাকে ভীরু। আমাদের দেশেরও ঐতিহাসিক মহলে প্রতাপ রাজসিংহ, শিবাজী, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা আছে দেখা যায়। মুসলমান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা অনেক সময় স্বজাতি প্রীতি ও স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের রূপ দিয়েছিলেন। ঔপন্যাসিকেরাও তাঁদের প্রয়োজনমত সেই বিকৃত ইতিহাসের আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ফলে তাঁদের উপন্যাসে ইতিহাসের বহু প্রমাদপূর্ণ ঘটনা যে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে আর বিচিত্র কী?

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে সার্ ওয়াল্টার স্কটের প্রতিভামুগ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের বরাবরই ইচ্ছা ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হবেন। তাঁর কয়েকখানি সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস বাদ দিলে দেখা যায় তিনি তাঁর সমস্ত উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'রাজসিংহ'

ছাড়া আর কোন উপন্যাসকে তিনি নিজেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে—সে সমস্ত উপন্যাসের ঘটনা তাঁর নিকট কল্পনারঞ্জিত মনে হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনাকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর মতে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা একদেশদর্শী এবং হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট। সেজন্য 'রাজসিংহ' রচনায় বঙ্কিম মুখ্যতঃ গ্রহণ করেছিলেন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ইতিবৃত্ত। কিন্তু সে ইতিবৃত্ত যে প্রমাদশূন্য ছিল তার সাক্ষ্য দেবে কে? বস্তুতঃপক্ষে বঙ্কিমের এত সতর্কতা সত্ত্বেও 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যে অনেক অনৈতিহাসিক ঘটনা আত্মপ্রকাশ করেছে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন আচার্য যদুনাথ সরকার এবং ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ-ছাড়া হিন্দুর বাহুবল প্রতিপন্ন করার যে সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিম 'রাজসিংহ' কাহিনী রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন—সে উদ্দেশ্য তাঁর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে করেছিল খণ্ডিত।

এ অবস্থায় আধুনিক সমালোচক 'রাজসিংহ' উপন্যাসকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে না পারলে তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। বঙ্কিম-যুগে রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিংবা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি একনিষ্ঠ হলেও যে ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে তাঁদের উপন্যাস রচিত হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনার অভ্রান্ততার প্রমাণ কি? বরং পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসানুগত্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার কারণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলাদেশের ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে তিনি যেমন অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাবিন্যাসে সে একই নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র প্রভৃতি খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক এবং রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেক উদীয়মান কথা-সাহিত্যিক চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা করে তরল প্রেম-নির্ভর বাংলা উপন্যাস-জগতে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। কিন্তু তাঁদের উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনা ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে কতটা নির্ভরযোগ্য তা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে বাস্তব পরিস্থিতি হল এই যে, যদি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয় তা হলে

বিচারহীন পাঠক লেখক-বর্ণিত যে কোন ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। উপন্যাসের যে কাহিনী পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, মনে নেশা ধরিয়ে দেয়, সে কাহিনী সত্য কি মিথ্যা তা সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করবার অবকাশ পাঠক পায় না। অপর পক্ষে এ প্রশ্নও ওঠে, প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন সে কি সত্যিকারের ইতিহাস? যে ইতিহাসে সাধারণ মানুষের জীবন উপেক্ষিত, শুধুমাত্র রাজা-বাজড়াদের জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী যে ইতিহাসকে ভারাক্রান্ত করে সে ইতিহাস আংশিক ইতিহাস—পূর্ণ ইতিহাস নয। ভিক্টর হুগো সেজন্য রোমান্সকে ইতিহাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ ইতিহাসে যে সত্যের প্রকাশ তা খণ্ডিত, আর রোমান্সে যে সত্যের ব্যঞ্জনা ঘটে তা হল নৈতিক সত্য। আনাতোল ফ্রাঁসও বলেছেন—ইতিহাস রচনা হল একটা আর্ট এবং যে ইতিহাসে কল্পনা বিস্তার আছে সে ইতিহাসের উৎকর্ষ অবশ্য-স্বীকার্য। 'ওয়েভারলি' নভেলের অসম্ভাবিত সার্থকতা দেখে মেকলেও বলেছিলেন—ইতিহাসের কাজ হল প্রাচীন যুগের ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশকে জীবন্তভাবে বর্তমান যুগের পাঠকের সামনে উপস্থিত করা এবং ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকই ইতিহাসের সে দাবি পূর্ণ করেছেন। স্বীয় যুগের ইতিহাসের উৎকর্ষ বিচার-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাস বলা চলে তা আমাদের দেশে বর্তমানে নেই। ইতিহাসের নামে যা আমাদের দেশে প্রচলিত তাকে বলা চলে ঐতিহাসিক রোমান্স। অবশ্য মেকলের এই মন্তব্য বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কারণ বর্তমান যুগে অনেক ভাল ইতিহাস লিখিত হয়েছে। এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক-উপন্যাসের সমালোচক এ. টি. শেপার্ড অবশ্য মনে করেন—ইতিহাস যত নির্ভুল হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষও তত বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন—নিরামিষাশী ব্যক্তি মাংসবর্জিত নির্দোষ নিরামিষ আহারের সময় নিজের অজ্ঞাতে যেমন অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা খেয়ে ফেলেন তেমনি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও ইতিহাস লেখক নিজের অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু কাল্পনিক কাহিনীকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লেখ্য ইংরেজ ঐতিহাসিক সম্পর্কে যদি এ মন্তব্য সত্য হয ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য আরও অধিকতর সত্য। অতএব কাল্পনিক কাহিনী-আশ্রিত ইতিহাস অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করায় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে বহু দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করা বিচিত্র নয। কিন্তু কল্পনাশ্রয়

সম্বন্ধেও ইতিহাসের উৎকর্ষ যদি স্বীকৃত হয় তা হলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ স্বীকৃত হবে না কেন?

এ হল ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ বিচার-প্রসঙ্গে বাস্তব অবস্থার কথা। কিন্তু বাস্তব আর আদর্শ এক বস্তু নয়। যে কল্পনাপ্রবণ লেখক ইতিহাসকে উপন্যাসের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক আবহসৃষ্টিতে তিনি যতই স্বাধীন কল্পনার পরিচয় দিন না কেন, ঘটনা উপস্থাপনে ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিচ্যুত হবার তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনা যত যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় ততই উপন্যাসের উৎকর্ষ বাড়ে, এ মন্তব্য আগেও করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্লটের খাতিরে ছাড়া কালানুক্রম (chronology) সম্বন্ধে কোন রকম গোলযোগ সৃষ্টি করা তাঁর উচিত নয়। যেখানে লেখক কাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন, সেখানে শুধু কয়েকটি ঘণ্টা বা দিনের উপস্থাপনে কিছু ভুল হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসেব বড় বড ঘটনাকে ভিন্নতর রূপে উপস্থিত করবার কোন স্বাধীনতাই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের নেই। একটু বিশ্লেষণ কবে পড়লেই দেখা যায় পৃথিবীব বড বড ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করেই এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় স্থায়ী যশ অর্জন করেছেন।

কালানুক্রমের যথাযথ অনুসরণ ছাড়াও আবও দুটি বিষয়ে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে সতর্ক হতে হবে: প্রথমতঃ, যে যুগের আইনের ব্যবহার কিংবা অবৈধেব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে লেখক উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিচ্ছেন তা যেন সত্য-নির্ভর হয়। কারণ এই দুটি বিষয়েব উপর উপন্যাসের ঘটনা-গতি অনেক সময় আবর্তিত হয়। সেজন্য এ দুটি বিষয় যদি বাস্তবতাবর্জিত হয় তা হলে সে উপন্যাস কাল্পনিক রূপকথায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সর্পদংশনে মৃত মোবারককে বনৌষধিব সাহায্যে মানিকলাল পুনরুজ্জীবিত করল—এ ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হলেও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। গুপ্তচরের মুখে খবর শুনে শাসনকার্য-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকাশ্য আইনের পর্যায়ে না পড়লেও সাম্রাজ্য পরিচালনায় মোগল সম্রাটেরা বিশেষতঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেব এ উপায় অবলম্বন করতেন, কিংবা আইন প্রণয়ন করে সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের কাছ থেকে বিশেষ কর আদায় করতেন, একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েও উক্ত সম্রাটের সন্দেহপ্রবণতা এবং প্রজা-পক্ষপাত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল—এ ঐতিহাসিক সত্যের

ওপর ভিত্তি করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে একজন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজার কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শোচনীয় পরাজয়-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঔরঙ্গজেব-প্রবর্তিত আইনের এই ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া যদি ইতিহাস-সমর্থিত না হত—তা হলে 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোঠা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে নিছক কল্পনাপ্রধান রোমান্টিক কাহিনীতে পর্যবসিত হত।

ইতিহাসের রাজ্যে কাল্পনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র বা কাল্পনিক কথোপকথনের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছিত। এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখের অদল-বদলও ঐতিহাসিকের অনভিপ্রেত। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রের এবং কাল্পনিক কথোপকথনের সমাবেশে এবং ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখকে আবশ্যক মত পরিবর্তন করেও সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্ভব। ইতিহাসের সত্যকে যিনি এভাবে গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে উপন্যাসে রূপ দিতে পারবেন—ঐতিহাসিক উপন্যাসের জগতে একমাত্র তিনিই স্থায়ী যশের অধিকারী হবেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষা

বিগত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্রগুলি যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষায় উপন্যাসের সংলাপ রচিত হলে কী ভয়াবহ ব্যাপার দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। বৈদিক যুগ উপনিষদের যুগ পুরাণের যুগ কিংবা তৎপরবর্তী হিন্দু-যুগের কথা বলছি না, ইতিহাসোল্লিখিত মুসলমান-যুগের নরনারীরা যে ভাষায় কথা বলতেন সে ভাষা যদি সে যুগের নায়ক-নায়িকার মুখে বসিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস স্বভাব-অনুযায়ী হলেও আধুনিক ক'জন পাঠকের বোধগম্য হবে?

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সংলাপ-রচনায় লেখক কোন্ পথে অগ্রসর হবেন? বিগত যুগের অবোধ্য ভাষা ব্যবহার করে তিনি কি সংলাপকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করবেন, না সে যুগের নরনারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাব আবেগ বেদনা এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করবেন আধুনিক ভাষায়? ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্মজ্ঞরা বলেন—এ শ্রেণীর উপন্যাসে অতীত জীবনকে সজীব রূপ দেবার অভিপ্রায়ে লেখক যদি সে যুগের নরনারীর মুখে দুর্বোধ্য প্রাচীন ভাষা বসিয়ে

দেন তা হলে সে উপন্যাস আধুনিক পাঠকের কাছে হবে অপাঠ্য। সেজন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রাচীন পরিবেশ এবং বাস্তবতা সঞ্চারের জন্য শুধুমাত্র মাঝে মাঝে তিনি ইতিহাসোল্লিখিত যুগের সংলাপের ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সংলাপে প্রাচীন ভাষা ব্যবহারে তিনি যদি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন—তা হলে সে উপন্যাস আবেদন সৃষ্টির দিক দিয়ে ব্যর্থ হবে।

সংলাপ রচনায় লেখককে আরও একটি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে যুগের নরনারীর জীবনকে আশ্রয় করে লেখক উপন্যাসে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস পান—সে নরনারীর কথাবার্তায় যদি তিনি এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেন যাতে মনে হয় তারা আধুনিক সিনেমার নায়ক-নায়িকা বা ভাবীযুগের নরনারী, তা হলেও সে উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থাৎ সংলাপ রচনায় ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক যদি যুগ-সচেতন না হন তা হলে সে উপন্যাস স্বাভাবিকতা-বর্জিত কাল্পনিক কাহিনীতে পরিণত হবে।

উপন্যাসে উল্লিখিত যুগের কথ্যভাষা ব্যবহারে লেখকের সতর্কতা অবলম্বন আরও বেশী প্রয়োজনীয়। এটা অবশ্য-স্বীকার্য, অশিক্ষিত ইতরজনের অমার্জিত ভাষা ব্যবহারের সাহায্যে লেখক সুকৌশলে একটা স্থানের বা কালের ইঙ্গিত দিতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার যদি উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে—তা হলে সে উপন্যাস যে পাঠকের কাছে অপাঠ্য বিবেচিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষজ্ঞরা বলেন—এ ধরনের ভাষা ব্যবহারে ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক 'must aim at suggestion rather than reproduction.' প্রাচীন কথ্যভাষার সঙ্গে একটু পরিচিত হলে সে স্বল্প-জ্ঞানকে পাঠক-সমাজে জাহির করবার জন্যে অবশ্য লেখকের ঝোঁক চাপে। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য লেখকের এরূপ প্রবণতা সর্বদা বর্জনীয়।

চরিত্রসৃষ্টি ঃ উপন্যাসের নামকরণ

আমাদের জীবন-পরিবেশে যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটে, সে সব মানুষের ভেতর থেকে সামাজিক উপন্যাস-লেখক তাঁদের চরিত্র নির্বাচন করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক যে চরিত্রগুলি বিকাশের জন্য সচেষ্ট হন—সে সমস্ত চরিত্র পাঠকের বাস্তব-অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। একটা কথা সমালোচক-মহলে প্রচলিত আছে—ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনার রূপদান-প্রচেষ্টা যেমন

সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টির প্রতিকূল, তেমনই ইতিহাসের স্মরণীয় চরিত্রের অবতারণাও উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্তু এই প্রচলিত ধারণা সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসের বৃহৎ চরিত্রের সাহায্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টিপ্রচেষ্টা যদি ভ্রমাত্মক বলে বিবেচিত হয় তা হলে স্কট থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকই ভুল করেছেন বলতে হবে। ইতিহাসের বর্ণনা পড়ে কিংবা বহু-প্রচলিত ধারণা থেকে যে সমস্ত চরিত্র পাঠকের মনে মুদ্রিত হয়, সে সমস্ত চরিত্রের আশ্রয়ে সার্থক উপন্যাস রচনা করা কষ্টকর সন্দেহ নেই। কারণ যে মুহূর্তে তিনি সে চরিত্রের সজীব রূপদানের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনা বা প্রচলিত ধারণাতীত কোন ঘটনা বা চারিত্রবৈশিষ্ট্য কল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন সে মুহূর্তেই পাঠকের কাছে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঔরঙ্গজেব-চরিত্র স্মরণীয়। প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী, সন্দেহপরায়ণ, ক্রূর প্রকৃতির ঔরঙ্গজেবের পক্ষে একটি সামান্য রাজপুত নারীর প্রতি মোহমুগ্ধ অনুরাগ ইতিহাস-সমর্থিত নয়। কিন্তু এই মানবিক স্পর্শের অবতারণায় মানবচরিত্রাভিজ্ঞ বঙ্কিম ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের যে সজীব রূপ দিয়েছেন বাস্তব ইতিহাসের অনুসৃতির সাহায্যে তা সম্ভব হত না নিশ্চয়ই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিল্পকৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন E. B. Osborn নামক লেখক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের (২৩শে এপ্রিল) 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকায়। সে সংখ্যার একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—চরিত্র-সৃষ্টিতে সংলাপ-সৃষ্টিতে বা ঘটনার অবতারণায় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন সত্য, কিন্তু যে যুগের পটভূমিকায় তিনি কাল্পনিক চরিত্র সংলাপ বা ঘটনা সৃষ্টি করবেন তা যেন সে যুগ-প্রবৃত্তি অনুযায়ী হয়। ছোটখাটো ব্যাপারে কাল্পনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করলেও ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকৃতি সাধনের অধিকার অবশ্যই লেখকের নেই। কালানুক্রম অনুসরণে স্বাধীনতা প্রদর্শনও তাঁর অধিকার-বহির্ভূত। এ ছাড়া অতীতের বৃহৎ তাৎপর্যময় ঘটনার পরিবর্তন সাধনেও তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই। আধুনিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে ওসবর্ন আরও বলেছেন, "The modern novelist is expected to give historical personages fair play, not to accept every picturesque label and to be content with

melo-dramatic convention which classes them as sheep or goats."

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সুবিধা এই যে তিনি কাল্পনিক চরিত্রকে জীবিতের পোষাক পরিয়ে শুধু যে তাদের মুখে কথাবার্তা জুড়ে দিতে পারেন তা নয়, তাদের সচলও করে তুলতে পারেন। ঐতিহাসিকের কিন্তু এ স্বাধীনতা নেই। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কাল্পনিক চরিত্র মানিকলালকে, কিংবা 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র লেখক রেশমীকে যেভাবে মুখর ও সক্রিয় করে তুলেছেন ঐতিহাসিকের পক্ষে তা সম্ভব হত না। ঐতিহাসিক এরূপ অজ্ঞাত চরিত্রের রূপ যে ইতিহাসে ফুটিয়ে না তোলেন তা নয়, কিন্তু সে রূপ তিনি অস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন সমষ্টি-চিত্রের মধ্যে—ঔপন্যাসিকের মত কাল্পনিক চরিত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে নয়। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সুকৌশলে নির্বাক জনতাকেও যে ভাবে সক্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলতে পারেন ঐতিহাসিকের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হলে কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা অপরিহার্য। স্মরণীয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট তাঁর সার্থক উপন্যাসগুলিতে সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করলেও এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে তাঁর উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা সাধারণতঃ কতগুলো কাল্পনিক চরিত্র। গত যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহে'র বা এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে যে চরিত্র অত্যন্ত সজীব—সে চরিত্র ঐতিহাসিক নয়, কাল্পনিক।

ইতিহাসে আমরা যে ব্যক্তি-পরিচয় পাই তার ভেতর তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু ঔপন্যাসিক হলেন মানব-জীবনের রহস্য-সন্ধানী। সেজন্য অন্তদৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তোলেন তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রের অন্তর্লোক। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ক্রুর, কপট, খল এবং বিদ্বেষ-পরায়ণ। হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর তিনি নানাভাবে আঘাত হেনেছেন। সেজন্য তাঁর প্রতি মনীষী বঙ্কিমের বীতস্পৃহার অন্ত নেই। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতি এবং কঠোর হৃদয়ের অন্তরালে যে প্রেম-বুভুক্ষু একটা সজীব মানবিক-সত্তা বিদ্যমান ছিল সে আবিষ্কার শিল্পী বঙ্কিমের। কিংবা কেরী সাহেবের মুন্সী রাম বসুর মনে রেশমীর সৌন্দর্যমুগ্ধ যে রোমান্স-বিলাস তা একান্তভাবে ঔপন্যাসিকের মানস-পরিমণ্ডলে সৃষ্ট ঘটনা। যে রাম বসুকে আমরা ইতিহাসের

পৃষ্ঠায় দেখতে পাই সে রাম বসু উপন্যাসের রাম বসুর থেকে ভিন্নতর মানুষ। শিল্পী তাঁর সহৃদয় হৃদয়ানুভবের সাহায্যে গ্রন্থ-পণ্ডিত রাম বসুকে সৃষ্টি করেছেন একই সঙ্গে রোমান্স ও বাস্তবপ্রিয় এ যুগের মানুষ হিসেবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ-প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেও একটু আলোচিত হয়েছে—আর একটু আলোচনার পর এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি-রেখা টানা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বহু সমালোচক এ মত প্রকাশ করেছেন—উপন্যাসের প্রধান নায়কের নামে উপন্যাসের নামকরণ করা সর্বোত্তম। এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন চার্লস্ ডিকেন্স তাঁর *David Copperfield, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Edwin Drood, Pickwick Papers* প্রভৃতি উপন্যাসে। স্কট এবং তাঁর ভাবশিষ্য বঙ্কিমও নায়কের নামে উপন্যাসের নামকরণ করতে ভালবাসতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ চমকপ্রদ চিত্তাকর্ষক এবং ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধও হতে পারে। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের এরূপ ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ নামকরণ করেছিলেন সর্বপ্রথমে রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', 'মাধবীকঙ্কণ' প্রভৃতি উপন্যাসে। এ যুগেও কোন কোন ঔপন্যাসিক ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ নাম ব্যবহার করে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে জনপ্রিয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

ব্যঞ্জনাময় উদ্ধৃতির সাহায্যেও অনেকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। মিসেস স্টীলের '*On the Face of the Waters*', রাফায়েল স্যাবাটিনির '*The Tavern Night*', মার্জরী বাওয়েনের '*I Will Maintain*' প্রভৃতি এ-ধরনের উপন্যাসের দৃষ্টান্ত। এ ভাবে উপন্যাসের নামকরণ বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের রুচি অনুযায়ী আরও বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

উপসংহারে শুধু এ কথা বলা যায় বর্তমান বাস্তবতা-প্রধান মনস্তত্ত্ব-নির্ভর বাংলা উপন্যাস-জগতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বরং ইতিহাসের মুক্ত হাওয়ায় রচিত এ শ্রেণীর উপন্যাসে বাঙালী পাঠক এক নতুন স্বাদের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি সর্বপ্রথমে ব্যক্তিমন সমাজমন ও বিশ্বমনের গভীরে প্রবেশ করে বাংলা উপন্যাসের সীমাবদ্ধ আকাশে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন। তাঁর সমসাময়িক শরৎচন্দ্রের রচনায় নতুন সমাজ-চিন্তার আশ্রয়ে বাংলা উপন্যাস অভিনব তাৎপর্য অর্জন করে।

শরৎচন্দ্রের সমকালেই এ শতাব্দীর উত্তর-তিরিশের এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের রচনায় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের নামে উৎকট বাস্তববিলাস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে অবশ্য কোন কোন লেখকের রচনায় নবতর সমাজ-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের রচনার বিষয়বস্তু ব্যক্তিমন-নির্ভর। সমাজ-চিন্তার বন্ধুর পথে বিচরণ করবার শক্তি সামর্থ্য বা রুচি মননহীন বহু লেখকেরই নেই। ফলে বেশির ভাগ সাম্প্রতিক সামাজিক উপন্যাস (?) রুচিশীল পাঠকের কাছে মূল্যহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় ইতিহাসের ছত্রচ্ছায়ায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস আজ কৌতূহলী পাঠকের নিকট আবার জনপ্রিয় হতে চলেছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব ও জনপ্রিয়তার মূলে আরও একটি গুরুতর কারণ বর্তমান। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্লেষণী শক্তিব সাহায্যে মানুষের সৌন্দর্য-স্বপ্নকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। অথচ বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ চিরকালই অবকাশের স্বপ্ন রচনায় আনন্দ পায়। এ যুগের বিজ্ঞান দস্যুর মত মানুষের সেই অবকাশের স্বপ্ন লুণ্ঠন করায় মানুষ আজ পুনরায় ব্যাপৃত হয়েছে অতীত জীবন-রাজ্য থেকে সেই বিনষ্ট স্বপ্ন-সম্পদ পুনরুদ্ধারের কাজে। আধুনিক রুচিশীল লেখক ও পাঠক মহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল এই।

৩

পৌরাণিক নাটক-প্রসঙ্গ

মহাকাব্যের মত পৌরাণিক নাটকও আজ আমাদের সাহিত্য-জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন আমাদের রঙ্গমঞ্চ পাঠক ও নাট্যামোদীদের নিকট চাহিদা সামাজিক নাটকের। অথচ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকেও দেখি রঙ্গমঞ্চ ও পাঠক-সমাজে পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয় ছিল। গত তিন চার দশকের মধ্যেই পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয়তা হারিয়ে আজ ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ কি?

এর কারণ আমাদের নব-জাগ্রত মানবতাবোধ ও সমাজ-চেতনা। এই সমাজ-চেতনার প্রত্যক্ষ ফল হল জীবনের প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন পৌরাণিক নাটকের বিকাশ হয় বাঙালী তখন ছিল আদর্শ জীবন-স্বপ্নে বিভোর। জীবনের সেই উন্নত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল তারা পৌরাণিক জীবনে। প্রচণ্ড বীর্যের সঙ্গে প্রবল ত্যাগ, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম, ভোগলিপ্সার সঙ্গে বৈরাগ্যের সমন্বয়ে সে জীবন ছিল মহিমান্বিত। বাঙালীর সেই সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ভেঙে গেল দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধাক্কায়। অর্থনৈতিক জীবনে চরম বিপর্যয়ের ফলে অপরাপর শিল্পীর মত নাট্যকারেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হল জীবনের বাস্তবতার প্রতি। ফলে নাটকে পূর্বযুগের আদর্শায়িত জীবনচিত্র ক্রমশঃ অপসারিত হল, আর সে জায়গায় সমাজের ভাঙনের চিত্র প্রাধান্য পেতে লাগল। সে ভাঙন শুধু সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর নয়—সে ভাঙন মানুষের বিশ্বাসেরও। বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রসার মানুষের বিশ্বাসের জগতে ঘুণ ধরিয়ে দিল। এ কারণে পৌরাণিক যুগের কল্পনা-প্রধান জগৎ পাঠকের নিকট মনে হতে লাগল অলস মায়া। নাট্যকারও সে জগৎকে নাটকে উপস্থিত করতে সঙ্কুচিত হলেন। এ ভাবে পৌরাণিক নাটককে স্থানচ্যুত করে সে স্থান গ্রহণ করল আধুনিক সামাজিক নাটক।

অপরাপর শিল্পসৃষ্টির মত নাটকও হল imitation of life। আমাদের জীবন-পরিবেশে আমরা নিত্য-নিয়ত যে দৃশ্য দেখছি সে দৃশ্যকে কল্পনা-রঞ্জিত

করে উপস্থিত করেন আধুনিক নাট্যকার তাঁর নাটকে। এই কল্পনা-নির্ভর দৃশ্য দর্শকের মনে বাস্তবতা-বোধের সঞ্চার করে বলে নাটককে বলা হয় illusion of reality. যে জীবনের সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত পৌরাণিক নাটকে তার অনুকৃতি নেই বলে এ ধরনের নাটককে যেমন imitation of life বলা চলে না—তেমনি পৌরাণিক নাটক বাস্তব জীবনে বিভ্রম সৃষ্টি করে না বলে সে নাটককে illusion of reality-ও বলা চলে না। পৌরাণিক নাটকের জগৎ অতি-স্পষ্ট, অতি-প্রত্যক্ষ, রহস্য-চেতনাহীন। অথচ আর্টের জগৎ হল একটি অতি-সূক্ষ্ম রাহস্যিক ভাবব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্যের জগৎ। এই ব্যঞ্জনাময় রাহস্যিক চেতনার অভাবেই পৌরাণিক নাটক উচ্চ জীবনাদর্শের বাহক হয়েও বর্তমানকালে পাঠক ও দর্শক সমাজে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় বিভিন্ন পুরাণ থেকে। এই পুরাণের জগৎ হল এক বিচিত্র অনুভূতির জগৎ—যে জগতে দেবতা ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। সেই জগতে কোন কোন অমিতবীর্য মানুষকে মনে হয় দেবতার মত, আবার দেবতাকেও দেখা যায় নির্বাধভাবে মানবসমাজে বিচরণশীল। বর্তমান অতি-সচেতন যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আবির্ভাবের পূর্বে এই দৈবী ও মানুষী লীলার পাশাপাশি অবস্থান পৌরাণিক নাট্য-পাঠক ও দর্শকের মনে সৃষ্টি করত এক বিপুল বিস্ময়। শুধু আমাদের পৌরাণিক নাটকে নয়—প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার ইস্কাইলাসের নাটকেও দেবতা ও মানুষের এই সম্মিলিত বিচিত্র লীলা সে-যুগের নাট্য-পাঠক ও দর্শকের মনে বিস্ময়বোধের সৃষ্টি করত।

প্রাচীন গ্রাক নাট্যকারের নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে আমাদের পৌরাণিক নাটকের কোন কোন ভাববস্তুর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে আমরা বিস্মিত হই। মনে হয় বিভিন্ন দেশের স্রষ্টার মন বিভিন্ন যুগেও একইভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

প্রাচীন গ্রাক নাটকের মত আমাদের বাংলা নাটকও মুখ্যতঃ ধর্ম ও ন্যায়-নীতি-নির্ভর। উভয় দেশের এ শ্রেণীর নাট্যকার সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। নাটকে তাঁরা শাশ্বত জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য উদ্ঘাটনে তৎপর। ধর্ম ও ন্যায়ের প্রবল শক্তি এবং অধর্ম ও অন্যায়ের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ঘোষণায় তাঁরা মুখর। অতিলৌকিক ও লৌকিক জগৎ, মানুষ এবং নিয়তি তাঁদের

অনুভূতিতে এক হয়ে গিয়েছিল। আসলে প্রাচীন গ্রীক এবং আমাদের গত শতাব্দীর রঙ্গমঞ্চ ছিল অনেকটা প্রচারধর্মী সংস্থা—যে সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করে পুণ্যপথের অভিমুখী করে তোলা। পাপ এবং পুণ্য—এ উভয় প্রবৃত্তির জড়াজড়ি মিশ্রণে জীবনের যে রসরূপ ফুটে ওঠে—উভয় দেশের ধর্মনীতি-প্রধান নাটকে সে জীবনের পরিচয় অনুপস্থিত।

চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়েও উভয় দেশের ধর্মমূলক নাটকের বৈশিষ্ট্যও প্রায় এক। চরিত্রগুলি যেন রক্তমাংসের জীব নয়, ধর্ম এবং অধর্মের প্রতীক মাত্র। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এরূপ প্রতীকী-চরিত্র সৃষ্টির ফলে এই শ্রেণীর নাটকীয় সংঘাত খুব প্রবল নয়, নাটকীয় পরিবেশ অত্যন্ত থম্‌থমে, মানসিক অনুভূতির অভাবে এ শ্রেণীর নাটক দর্শকচিত্তে কৌতূহল এবং উত্তেজনা সৃষ্টিতে অক্ষম। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের ইতিহাসে দীনবন্ধুর জীবন-ধর্মী সজীব চরিত্রসৃষ্টির পরে পৌরাণিক নাটকে প্রতীকতাধর্মী চরিত্রের অবতারণা তো সুস্পষ্ট পশ্চাদাবর্তনের চিহ্ন বলেই মনে হয়। কিন্তু অভিনিবেশের সঙ্গে চিন্তা করলেই দেখা যায় মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য নাটক কিংবা আমাদের পৌরাণিক নাটক একেবারে নাটকীয় সংঘাতহীন static drama নয়। এ শ্রেণীর নাটকে যে সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায় সে হল ভাবের সংঘাত, জীবনের বিভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব। সে ভাব-সংঘাত অবশ্য আধুনিক প্রতীকী (symbolist) বা সাংকেতিক নাটকের দ্বন্দ্বের মত এত সূক্ষ্ম বা রাহস্যিক নয়—অতি-প্রত্যক্ষ এবং অতি-স্পষ্ট ঘটনার মাধ্যমেই সে সংঘাতের সৃষ্টি। সেজন্য এ শ্রেণীর নাটক ঠিক আধুনিক inner drama-র পর্যায়ভুক্ত না হলেও অনেকটা সে-গোত্রীয়।

পৌরাণিক নাটক-সৃষ্টির উপকরণ বিচিত্র। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে এ শ্রেণীর নাটকের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়, পুরাতন শৌর্যময় যুগের সুন্দর এবং ঐশ্বর্যময় চিত্রাঙ্কনে সে-নাটক সার্থকতা লাভ করে। গীতিকবিতা থেকে এ শ্রেণীর নাটক পেয়েছে ছন্দ ও শব্দের বিচিত্র ঐশ্বর্য, নাটকীয় সংলাপে এ শব্দাড়ম্বর এবং ছন্দপ্রবাহের এ উত্থান-পতন মানব-মনের সর্বপ্রকার অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশের সহায়ক।

পৌরাণিক নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নৈতিক সুর ও উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি। কি পাশ্চাত্য দেশে, কি এ-দেশের নাটকে এ নৈতিক আদর্শের প্রতিফলন যুগ-প্রভাবের ফলেই সংঘটিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। এ নৈতিক সুর

ছাড়াও জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি চিন্তাশীল ও দার্শনিক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীও বহু পৌরাণিক নাটককে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। নাটকীয় গতি এবং দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের মধ্যে অন্তঃশীলা হয়ে থাকে সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধির জন্যে নাট্যকারের সচেতনতা এবং স্রষ্টার বিচিত্র কর্ম ও মানুষের নিয়তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যে নাট্যকারের উন্মুখতা। কিন্তু নাট্যকারের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পৌরাণিক নাটকের কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়। তাত্ত্বিকতা নাটককে কখনও নীরস শুষ্কতায় পরিণত করে না। মানুষের নিয়তি বা ঐশ্বরিক ন্যায়নীতি সম্পর্কে পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের যে মনোভাব ব্যক্ত হয় তা ঠিক চিন্তাশীল ব্যক্তির নৈতিক উপদেশ নয়—বরং সে যেন দৈব-প্রেরণাদীপ্ত ধর্মনেতার অন্তর্দর্শন। এ ছাড়া পৌরাণিক নাটকে যে রহস্যময় সুরের গাম্ভীর্য দেখা যায়—তা নাট্যরস সৃষ্টিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে বরং নাট্যরসকে ঘনীভূত করে তোলে।

পৌরাণিক নাটকের প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের মনকে সাধারণ জীবন-পরিবেশ থেকে মুক্ত করে একটা গৌরবময় আদর্শের রাজ্যে উত্তীর্ণ করা। বহুকালের ঐতিহ্য যে সমস্ত পবিত্র ধর্মমূলক কাহিনীকে রোমান্টিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে সে সমস্ত কাহিনী থেকে সংগৃহীত হয় পৌরাণিক নাটকের প্লট। শৌর্যময় প্রধান চরিত্রগুলি সৃষ্টি করা হয় প্রধানতঃ বীরধর্মী রাজকীয় চরিত্র থেকে। শক্তি ও সাহসে এ সমস্ত চরিত্র যে কোন মানবীয় চরিত্র থেকে শ্রেষ্ঠ। যে ভাষায় সংলাপ সৃষ্টি হয় সে ভাষা কাব্যধর্মী এবং গম্ভীর—সুরেলা এবং সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে রচিত।

গ্রীক ট্র্যাজেডির মত বাংলা পৌরাণিক নাটকেরও একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনী-পরিকল্পনার সরলতা ও স্পষ্টতা। নাটকীয় দ্বন্দ্বও বিকাশ লাভ করে সাধারণতঃ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে—অতএব সে দ্বন্দ্ব জটিলতাহীন। নাটকীয় চরিত্রের সংখ্যাও খুব বেশী থাকে না। কাহিনী-বিকাশে সহায়ক নয় এমন চরিত্র সাধারণতঃ নাটকে অবতারণা করা হয় না। নাট্য-পরিকল্পনা এরূপ সরল হওয়াতে নাটকীয় পরিবেশ নিষ্প্রভ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। সে সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে নাট্যোল্লিখিত চরিত্রের অপরূপ বেশবাস, দৃশ্যপটের সম্মুখে তাদের সাবলীল পদক্ষেপ, এবং তাদের বিচিত্রধর্মী সংলাপ। আধুনিক নাটকের গোষ্ঠীবদ্ধ অভিনয়ে যে নাট্যরসের সৃষ্টি হয়, বিচিত্র বেশবাসে সজ্জিত পৌরাণিক চরিত্রের গতিভঙ্গী এবং ভাবোচ্ছ্বসিত সংলাপ শুনে পূর্বযুগের দর্শকের মনেও প্রায় অনুরূপ নাট্যরসের সৃষ্টি হত।

প্রাচীন গ্রীক ও পৌরাণক নাটকে কাহিনীর শৌর্যময় দিকটার থেকে ভক্তিরসাত্মক আধ্যাত্মিক দিকের প্রতি নাট্যকারের লক্ষ্য থাকত বেশী। সেজন্য পৌরাণিক নাটকে যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হত তাতে ট্র্যাজেডির গৌরব দেখা যেত না। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভীষ্ম' নাটকের ট্র্যাজেডি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আধুনিক নাটকের মত পৌরাণিক নাটকেও কাহিনী গতিলাভ করে প্রধানতঃ বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ এবং ভাবোচ্ছ্বসিত উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে। ঘটনা-সংঘাত এবং বহির্দ্বন্দ্বের প্রভাব নাটকের ক্রমবিকাশে নেই এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু ঘটনাকে বাস্তবে রূপদান করবার প্রচেষ্টার চাইতে বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও আলোচনা বেশী প্রয়োজনীয় মনে করা হত প্রাচীন গ্রীক ও পৌরাণিক নাটকে। এ-কারণে প্রাচীন গ্রাক ট্র্যাজেডি ও পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির চাইতে সংলাপের উপর প্রাধান্য অর্পিত হত বেশী। সেক্সপীয়রের নাটকীয় সংলাপের পরিমিতিবোধ বা সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনা প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিতে যেমন নেই পৌরাণিক নাটকেও তেমন দেখা যায় না। দীর্ঘ সংলাপের সংযোগে নাটকে যে একঘেয়ে সুর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে সে-সম্ভাবনা দূরীভূত হয় উপস্থাপনায় নানা বৈচিত্র্য-সৃষ্টির ফলে। এই বৈচিত্র্য-সৃষ্টির উপায় হল মাঝে মাঝে সংলাপে সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি এবং সমবেত সঙ্গীতের অবতারণা।

গ্রীক ও বাংলা পৌরাণিক নাটকের একটা চমৎকার সাদৃশ্য যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতি পরিকল্পনায় উভয় নাটকই সমধর্মী। দর্শক বা পাঠক-চিত্তে কৌতূহলবোধকে জাগ্রত না রেখে গ্রীক ও পৌরাণিক নাট্যকার নাটকের পরিণতির আভাস প্রথমেই দর্শক ও পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করেন। অথচ আধুনিক নাটকীয় কৌশল হল কাহিনী পরিণতি লাভের পূর্ব পর্যন্ত নাট্যকার সেই পরিণতিকে ঘটনা-পরম্পরায় ইঙ্গিতময় করে দর্শকের কৌতূহলবোধকে শেষ পর্যন্ত জাগ্রত রাখেন। নাট্য-পরিণতিতে যে ঘটনা ঘট্‌বে তা যদি পূর্বেই পাঠক বা দর্শকের জানা হয়ে যায় তাহলে নাটকে illusion-এর সৃষ্টি হয় না—নাটক শুধু বর্ণনামূলক আখ্যায়িকায় পর্যবসিত হয়। এ সম্পর্কে স্পেনিশ নাট্যকার Lope de Vega বলেন:

'Be careful to conceal the denouement till the last scene, and to stimulate curiosity by the suggestion of alternative

issues; when the audience know the result, they turn their faces to the doors, and their backs upon the actors, from whom they have nothing more to learn."

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিত', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ' এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। পৌরাণিক নাটকের ঘটনা-সমাবেশে নাটকীয় গুণের অভাব ঘটল কেন এ-প্রশ্ন পাঠকের মনকে প্রথমেই বিব্রত করে। পৌরাণিক নাট্যকারের কি নাট্যরস সৃষ্টি সম্পর্কে কোন প্রকার ধারণা ছিল না? পৌরাণিক নাটকের এই অতি-স্পষ্টতার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে অন্যত্র। প্রথমতঃ, যে উৎস থেকে পৌরাণিক নাটকের কাহিনী সংগৃহীত হয়, সে উৎস তো পাঠকের নিকট পূর্বের থেকেই জানা। অতএব নাট্য-পরিণতিতে যে ঘটনা ঘটবে নাটকের প্রথমাবধি সে ঘটনাকে যতই সতর্কভাবে পাঠক বা দর্শকের নিকট সুকৌশলে গোপন করে রাখা হোক না কেন, তা কখনও পাঠক-মনে একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, পৌরাণক নাটকের উদ্দেশ্য পরিণতিতে একটা শান্ত নির্লিপ্ত ভাবের সৃষ্টি। আধুনিক নাটকের মত পাঠক বা দর্শক-মনে ঐকান্তিক কৌতূহল সৃষ্টি-প্রবণতা পৌরাণিক নাটকের লক্ষ্য নয়। এজন্যও নাটকের অনিবার্য ঘটনা-পরিণতিকে নাটকের প্রারম্ভে ইঙ্গিতময় করে উপস্থিত করবার জন্যে পৌরাণক নাট্যকারের কোন চেষ্টা নেই।

গ্রীক ট্র্যাজেডির মত নিয়তির পরিহাস এবং মানব-জ্ঞানের ব্যর্থতা উপলব্ধিও পৌরাণিক নাটকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। নিয়তি-পীড়িত মানুষ যেভাবে ক্রমশঃ জীবনে বিষাদান্ত পরিণতির সম্মুখীন হয় দর্শকের মনকে সেদিকে আকর্ষণ করাও পৌরাণিক নাট্যকারের একটা প্রধান লক্ষ্য। বলিষ্ঠ নায়কের নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে দর্শকের নিকট তা পূর্ব থেকেই জানা থাকায় সে নিয়তি-তাড়িত পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যর্থ দম্ভ পাঠক এবং দর্শকের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে। ঘটনার স্তরে স্তরে এই নিয়তি-তাড়িত চরিত্রের কার্যধারা যে কৌতূহলের সঞ্চার করে সে কৌতূহল suspense-এর অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করে। আধুনিক নাটকের সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের পার্থক্য এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক নাটক মনস্তত্ত্বনির্ভর, আর পৌরাণিক নাটক ভাবধর্মী। আধুনিক নাটকের চরিত্র পৌরাণিক নাটকের

মত নিয়তি-প্রভাবিত নয়—নিজের প্রবৃত্তি-তাড়িত। বিবেকের সঙ্গে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে আধুনিক নাটকীয়-চরিত্র জীবন্ত। মানব-মনের পরস্পরবিরোধী অভিপ্রায়ের সংঘাতে আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটকে যে রসসৃষ্টি হয় তাকে বলা চলে মনুষ্য-রস (human interest)। ভাবধর্মী পৌরাণিক নাটকে সে 'মনুষ্য'-রসের অভাব। সজীব মানব-মনের পরিচয় স্পষ্ট নয় বলে পৌরাণিক নাটককে কোন কোন সমালোচক 'বিশুদ্ধ নাটক'-এর পর্যায়ে স্থান দিতে নারাজ। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেন :

"যাহা মূলে একটা ভাবজীবন মাত্র, যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিগত প্রাণধর্মের প্রেরণা নাই, তাহাকে যদি অভিনয় বস্তু করে তোলা হয়, তবে তাহা নাটক নয়, দৃশ্যকাব্য; তাহা গোড়া হইতেই একটা ভাবরসের গীতোৎসার—তাহাতে যে ঘটনা ঘটে, তাহা প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির কারণে ঘটে না; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে, কোন সংগ্রাম বা সংঘর্ষ নাই; 'চরিত্র' বলিতে পূর্বে যাহা বলিয়াছি, সেখানে সে বস্তুর প্রয়োজনই হয় না। ভাবোদ্দীপনাই যাহার একমাত্র অভিপ্রায় তাহাতে মানুষকে এক একটি ভাবেই বিগ্রহরূপে সাজাইয়া লইলেই হয়; অর্থাৎ বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি কতগুলি রসকে মানুষের মত পোষাক পরাইয়া রঙ্গমঞ্চে নাচাইতে পারিলেই হইল। কেবল পৌরাণিক নাটক নয়, আমাদের সকল নাটকই সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক—এইরূপ ভাবপ্রধান মেলোড্রামা"। (দ্রষ্টব্য : সাহিত্য বিচার, নাটকীয় কথা, পৃঃ ১৬৩)।

কিন্তু ভাবধর্মী ও গীতোৎসারিত হলেই যে নাটকের নাটকীয়ত্ব থাকে না আধুনিক ইংরাজ কবি T. S. Eliot-এর '*Murder in the Cathedral*' পড়ার পরে এ কথা বলা চলে না। এ নাটকের নায়ক সেণ্ট্ টমাসকে ঠিক একটি জীবন্ত চরিত্র না বলে বলা যায় মহৎ ভাবের প্রতীক। অন্যান্য চরিত্রগুলিও নির্বস্তুক মানবীয় ভাবের প্রতীকমাত্র। নাটকের পরিসমাপ্তিতে সেণ্ট্ টমাসের নিষ্ঠুর হত্যা এ ভাবধর্মী নাটকে গতিবেগ সঞ্চার করেছে—এমন কথা ঠিক বলা যায় না; সেণ্ট্ টমাসের বিচিত্র প্রলোভন জয়ের কাহিনীর মধ্য দিয়েই নাটকটি প্রকৃতপক্ষে গতিশীল হয়ে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে এই নাটককে বলা চলে Inner drama—ধর্ম চেতনাই এ নাটকের প্রধান লক্ষ্য। এ নাটকের মর্ম উপলব্ধি করতে হলে ধর্ম-সচেতন মন নিয়েই পাঠককে অগ্রসর হতে হয়।

১৯৩০ এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইংরাজী সাহিত্যে যে কাব্য-নাটকের পুনরুজ্জীবন হল তার কারণ কি—এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই ইংরাজী নাট্য-পাঠকের মনকে আন্দোলিত করে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে পঞ্চম দশক পর্যন্ত যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছিল—সে নাটক সজীবতা হারিয়ে পাঠক ও দর্শকসমাজে ক্রমশঃ মূল্যহীন বিবেচিত হচ্ছিল। বিশ শতকের তিনের দশকের দিকে Noel Coward-এর নাট্যপ্রচেষ্টায় একান্তভাবে রসচর্চামূলক নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সূচিত হয়। আনন্দদায়ক কিংবা সমাজ-সমালোচনাত্মক কমেডির স্থলে ভাবপ্রবণ দেশাত্মবোধক নাটক *Cavalcade* কিংবা গীতোচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমাণ্টিক নাটক *Bitter Sweet* রচনা করে প্রচলিত নাট্যধারায় তিনি নবতর আদর্শের সন্ধান দিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে J. B. Priestly ছিলেন মধ্যবিত্ত ইংরেজ-জীবনের পটভূমিকায় এবং আবহাওয়ায় রচিত নাট্যকারদের মধ্যে একজন মননশীল লেখক। এই স্থিতধী মধ্যবিত্ত-ইংরেজ-জীবন-সচেতন নাট্যকার রূপক ও নীতিধর্মী নাটক নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন। (অডেনের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।) বহু চিন্তাশীল নাট্যকারের মত তিনিও অনুভব করেছিলেন এ-শতাব্দীর তিন চার দশকের গদ্য-সংলাপপূর্ণ ও বাস্তবতাধর্মী ইংরেজী নাটকের গতানুগতিক ঐতিহ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে না পারলে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ সুদূর-পরাহত। এ অবস্থায় নাট্যরচনায় অভিজ্ঞতাহীন কোন কোন খ্যাতনামা কবি বহুকাল বিস্মৃত কাব্যনাট্যের ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে ইংরাজী নাটকে বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াস পেলেন। এ প্রয়াসের প্রত্যক্ষ ফল এ শতাব্দীর তিনের ও চারের দশকে অভিনব রূপ নিয়ে ইংরেজী সাহিত্যে কাব্যনাট্যের আত্মপ্রকাশ। এই নাট্যধারার একটি বৈশিষ্ট্য যে কোন সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমকালীন গদ্যসংলাপ-পূর্ণ বাস্তবতাধর্মী নাটকে নাট্যকারের যে ধর্মীয় প্রত্যয় বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়—এ শ্রেণীর নাটকে সে দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী তীক্ষ্ণ গভীর ও ব্যাপক। কারণ তাঁরা আধুনিক জীবন-চিন্তার আলোকে সনাতন জীবনাদর্শের অর্থপূর্ণ শিল্পরূপ দিয়েছেন এই পর্যায়ের নাটকে।

এ-কথা অবশ্যই স্বীকৃত যে নাট্যসৃষ্টি হিসাবে বহু দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও কাব্যধর্মী পৌরাণিক নাটকের অভিনয় একদিন বাঙালীর নাট্যরস-পিপাসাকে তৃপ্ত করেছিল।

এ শ্রেণীর নাটকের অভিনয় যে আধুনিক রুচিশীল দর্শকের মনেও সমান তৃপ্তি দিতে পারে তার প্রমাণ পরলোকগত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সজীব অভিনয়। পুরাতন কাব্যনাট্য অভিনয়ের এই জনপ্রিয়তার মূলে আছে অবশ্য নাট্য-পরিচালকের সার্থক প্রয়োগনৈপুণ্য। পৌরাণিক কাব্যনাট্যের ভাবকেন্দ্রে যে আবেদন বর্তমান—তার মূল্য শাশ্বত। সে মূল্যসমৃদ্ধ ভাবাদর্শকে আধুনিক জীবন-চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ দিতে পারলেই কাব্যনাট্য হয়ত আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। অতএব বর্তমান পূর্ণাঙ্গ নাটকের দুর্ভিক্ষের দিনে আধুনিক ইংরেজী কাব্য-নাট্যকারদের মত মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ কোন কোন সচেতন কবি যদি নতুন টেকনিকে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে কাব্যনাট্য রচনার চেষ্টা করেন তাহলে অভিনব রুচির সাহিত্য এবং অভিনেয় নাটক হিসেবে তাঁদের নাট্যপ্রচেষ্টা যে বিদগ্ধমহলে অভিনন্দিত হবে—এমন আশা অহেতুক নয়। সাম্প্রতিক কালে আধুনিক রুচিশীল নাট্যামোদী রঙ্গমঞ্চে সস্তা-চমকপ্রদ (cheap stunt) সামাজিক নাটকের অভিনয় দেখে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছেন। এ অবস্থায় প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ কাব্যনাট্যের পুনরুজ্জীবনে ক্ষীণস্রোত বাংলা নাটকের ধারায় নতুন প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

৪

এ-যুগের সাহিত্য

সমস্ত পৃথিবীতে বর্তমানে যে যুগ চলছে তাকে বলা চলে Transitional Age বা ক্রান্তি যুগ। দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধাক্কায় মানুষের সমাজ-জীবনের ভিত্তি নড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের নিটোল জীবনধারায় বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। এর ফলে প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি মানুষ আজ শ্রদ্ধাহীন হয়ে উঠেছে। জীবনের বাস্তবরূপ প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সেজন্যে এ-যুগের সাহিত্যে মানবতার পূর্ণমূল্য নির্ধারণের জন্য একটা সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চল্‌ছে। এ-যুগের সাহিত্যে তাই আমরা দেখতে পাই মানুষের সনাতন আদর্শের বিরুদ্ধে একটা সচেতন বিদ্রোহ, শাশ্বত ধারণার প্রতি সন্দেহ ও একটা জিজ্ঞাসার ভাব ফুটে উঠেছে। একজন আধুনিক সমালোচক তাই এ যুগের নাম দিয়েছেন—An age of interrogation. প্রাচীন কালে ধর্ম-জগতে, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে ও সমাজ-জীবনে নেতারা যে পথ নির্দেশ করে দিতেন, সে সমস্ত নিয়ম অনুসারে সাধারণতঃ মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এমন কতগুলো সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—নেতারা যার সুসমঞ্জস সমাধান করে উঠতে পারছেন না। ফলে সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ-জীবন যেখানে বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল ব্যক্তি জীবনও সেখানে সুস্থির থাকতে পারে না। ব্যক্তি-মানসের এ অস্থির-চিত্ততা ও চাঞ্চল্য এ যুগের সাহিত্যকেও তাই অনিবার্য-ভাবে আক্রমণ করেছে।

বর্তমান সাহিত্যের মূল সুর আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক আধুনিক সাহিত্য-সমালোচক তাই মন্তব্য করেছেন 'সাময়িক সাহিত্যের গোড়ার কথাই আজ সাহিত্য-সঙ্কট। কারণ সাহিত্য আকাশ কুসুম নয়—মানুষের জীবনবোধেরই এক পরিচয়। সে জীবনই যখন নানা প্রশ্ন, নানা চিন্তা ও চিন্তাহীনতার কোলাহলে ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন সাহিত্যে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিবেই।'

সমালোচকের উক্ত মন্তব্যটি আধুনিক সাহিত্যিকদের চিন্তার যোগ্য। কথাটার ভেতর যে সত্য নিহিত রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিত্তের গভীর অনুভূতি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের অতলান্ত রূপ ও গভীর রহস্যের অনুসন্ধান করাই হল স্রষ্টার কাজ। কারণ সাহিত্যের যে রস-প্রেরণা তা দেশাতীত—কালাতীত। এজন্য প্রকৃত স্রষ্টার দায়িত্ব ও কর্তব্যও অসাধারণ। সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব যুগের স্রষ্টার শিল্পসৃষ্টিতে আমরা দায়িত্ববোধের পরিচয় অত্যন্ত সচেতন দেখতে পাই। সমসাময়িক জীবনপ্রবাহের মধ্যে বাস করেও চিরন্তন জীবন-সঙ্গীত তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন এবং শাশ্বত জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন তাঁদের কাব্যে-সাহিত্যে এবং শিল্পে।

দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য যাই হোক, আধুনিক স্রষ্টাকে তার সমসাময়িক কালের জটিল ও চঞ্চল জীবনপ্রবাহের অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে। ফলে আধুনিক জীবন-শিল্পীর মনও আজ বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জীবনকে জানতে হলে বা বুঝতে হলে যে সামগ্রিক দৃষ্টির প্রয়োজন—আধুনিক স্রষ্টার মধ্যে সে উদার দৃষ্টি তাই আজ আর দেখা যাচ্ছে না। এ কারণে এই খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে শাশ্বত সংবেদনশীল সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টি যে তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে—এ মন্তব্য অপ্রীতিকর হলেও সত্য। এ ছাড়া সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের রস-প্রেরণা নিত্যকালের কিনা—সে সম্বন্ধেও তাঁর মনে আজ সন্দেহ জেগেছে। মানবজীবনের সনাতন আদর্শের প্রতি এই বিশ্বাসহীনতা আধুনিক স্রষ্টার সৃষ্টিতে আজ সুস্পষ্ট। আধুনিক শিল্পী জীবনকে আজ বিচার করতে বসেছেন বুদ্ধি দিয়ে—হৃদয়ের সাতরঙা রঙ দিয়ে তাকে রঞ্জিত করে তুল্‌তে পারছেন না। সমসাময়িক অধিকাংশ স্রষ্টার সৃষ্টি তাই বুদ্ধির তীব্র আলোকে দীপ্ত হলেও হৃদয়ের সহৃদয় স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে না। বর্তমান যুগের অসংখ্য উপন্যাসে নাটকে ও কাব্যে এ উক্তির সমর্থন মিল্‌বে।

আরো একটি দিক দিয়ে পূর্ব যুগের সৃষ্টির সঙ্গে সমসাময়িক শিল্পরচনার ব্যবধান স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। পূর্ব যুগে দেখতে পাই প্রত্যেক জীবন-শিল্পীর ভাবনা-বাসনা, উপলব্ধি বেদনা রূপ লাভ করেছে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শকে অবলম্বন করে। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকদের কথাই ধরা যাক্। তাঁদের মধ্যে Scott ছিলেন Romantic আদর্শের ভক্ত, Crabbe অনুসন্ধান করেছিলেন একটা বাস্তবঘেঁষা আদর্শবাদকে, Byron-এর ছিল একটা

নাস্তিক্যপূর্ণ বুদ্ধিবাদ, আর Shelley-র ছিল একটি স্বপ্নময় সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ। এ বিভিন্ন আদর্শকে তাঁরা সমস্ত জীবন ধরে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সেজন্য তাঁদের সৃষ্টি একটা সুগভীর পরিণতি লাভে সমর্থ হয়েছে। বিভিন্ন আদর্শের পূজারী পাঠকও এ সমস্ত বিভিন্ন আদর্শবাদীর লেখা পড়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখক সম্বন্ধেও কিন্তু এ কথা জোর করে বলা চলে না। Bernard Shaw, H. G. Wells, Bennett, Masefield, Chesterton প্রভৃতি এ শতাব্দীর নামী লেখকদের রচনায়ও একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,—তাঁদের রচনায় একাধিক আদর্শের সংমিশ্রণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন Bernard Shaw-র রচনায় আমরা দেখি শাণিত বুদ্ধি ও আদর্শবাদের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ, Masefield-এর রচনায় রোমান্টিক ও বাস্তবাদর্শ এক হয়ে গেছে। H. G. Wells তাঁর উপন্যাসের আদর্শের জন্য এত বিভিন্ন লেখককে অনুসরণ করেছেন যে তাঁর রচনার ভেতর আমরা Jules Verne, Swift, Hawthorne, এবং Dickens প্রভৃতির গন্ধ পাই।

একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জাগে, বর্তমান শক্তিমান লেখকদের এই আদর্শ-বিচ্যুতি ও চিত্ত-বিভ্রমের কারণ কি?

কারণ খুব শক্ত বলেও মনে হয় না। বর্তমানে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মানুষের কর্ম-বিস্তারের ফলে পূর্বের মত লেখক আর নিশ্চিন্ত মনে বসে ভাবতে পারেন না। পাঠকেরও আর নিশ্চিন্ত মনে বসে সাহিত্যরস উপভোগ করবার সময় নেই। জনৈক সমালোচক আধুনিক সাহিত্যের এই বিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সকৌতুকে বলেছেন:—"এখন হোটেলে খাইয়া যেমন গৃহিণীর রন্ধনবিদ্যা লোপ পাইয়াছে, তেমনি ক্লাবে সন্ধ্যাটা কাটাইয়া (নচেৎ ভদ্রলোক হওয়া যায়না) এবং টকি শুনিয়া কাব্য কল্পনা করিবার ও উপভোগ করিবার শক্তিও অন্তর্ধান করিয়াছে।"—(আচার্য যদুনাথ)।

এ সমস্ত কারণে লেখক ও পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখি, একটা প্রবল তাড়াহুড়ার মধ্যে যেন তাঁরা লেখার কাজ ও পড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। লেখকের দিক দিয়ে পপুলার সাহিত্য রচনা না করলে আজকাল আর পাঠক পাওয়া যায় না। ফল দাঁড়িয়েছে এই,—অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের রূপ ও

বসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে না, নিত্যনিয়তই সৌন্দর্যের অবমাননা ঘটছে। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এক কথায়,—জার্নালিজম্ বর্তমান সাহিত্যকে আজ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বর্তমানের সাহিত্য-শিল্পী নিরুপায় হযেই যেন আজ এই গড্ডলিকা-প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান যুগের খ্যাতনামা লেখক Bernard Shaw-ও এ সম্পর্কে একদা মত প্রকাশ করেছিলেন "Good journalism is much rarer and more important than good literature." রচনা পড়ে মনে হয় Chesterton, Bennett, Hillaire Belloc প্রভৃতি এ যুগের খ্যাতনামা ইংরেজ লেখকও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে জার্নালিজমের আদর্শকেই বড় আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের পবিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্র অঙ্গনের দিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক্। সমসাময়িক অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্য-শিল্পীর বচনায়ও যেন আধুনিক ইংবেজী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির পুনবাবৃত্তি ঘটছে। মধ্য যুগেব বাঙালী কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস মুকুন্দরাম প্রভৃতির বচনায় মানব মনের যে সুগভীর বেদনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক ক'জন কবিব কাব্যে তাব নিদর্শন মেলে—তা বিচার্য। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রূপ ও বসেব যে অপূর্ব গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটেছিল তা আধুনিক ক'জন কবিব কাব্যে দেখা যায়?

পূর্ববঙ্গের পল্লীকবিবা তাঁদের গাথা-কাব্যের মারফতে নরনারীর প্রেমের যে নির্ভীক রস-রূপ দিয়েছেন তা আধুনিক ক'টি কাব্যে দেখা যায়? এমনকি গত শতাব্দীর মাইকেল-হেম-নবীন প্রভৃতি মহাকবির মহাকাব্যে, বঙ্কিম-রমেশ-হবপ্রসাদ প্রভৃতির উপন্যাসে, বিহারীলাল-সুরেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমাব প্রভৃতির গীতিকাব্যে অন্তরের অকৃত্রিম আবেগ ও মানব-জীবনের সুমহান ভাবাদর্শকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে যে আন্তরিক চেষ্টা হয়েছিল, আজকে তা অতীতের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। এ শতাব্দীর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনায় যে বিস্তৃত জীবনবোধের পরিচয় মিলে সমসাময়িক ক'জন শিল্পীর রচনায় তা দেখা যায়? যে বুদ্ধির বাহুল্য, নাস্তিক্যবাদ ও আদর্শেব প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যকে প্রাণহীন করে তুলেছে, সে আদর্শহীনতা আজ সমসাময়িক অধিকাংশ বাংলা সৃষ্টিধর্মী রচনাকেও শ্রীহীন ও মূল্যহীন করে তুলছে—দুঃখের সঙ্গে

একথা স্বীকার করতেই হয়। সত্য বটে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ঘটনার চকিত-চমকে, বুদ্ধির দীপ্তিতে অনেক আধুনিক লেখকের লেখা দীপ্ত,—কিন্তু হৃদয়ের যে বিস্তৃতি ও গভীরতা সাহিত্যকে চিরন্তন মূল্য দান করে—সে অমূল্য সম্পদ থেকে সমসাময়িক অনেক রচনা বঞ্চিত।

সাহিত্য-জগতে বুদ্ধিজীবী সাহিত্য-শিল্পীর এ অস্থির পদচারণা দেখে সাহিত্য-প্রেমিক ব্যক্তিমাত্রই আন্তরিক ব্যথা অনুভব করেন। কিন্তু এ জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। এ হল যুগের ধর্ম। শুধু বাংলা সাহিত্যের বেলায় কেন, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের আকাশেও দেখা যাচ্ছে আজ রঙ্-ফানুসের ক্ষণিক দীপ্তি। শুধু উত্তেজনা, শুধু বৈচিত্র্য, শুধু চমক সৃষ্টির জন্য ব্যগ্রতা। কিন্তু জৈবিক নিয়মে এ জীবন-উত্তেজনায়ও একদিন ভাঁটা পড়বে। শিল্পীর চিত্তেও আসবে স্থিতি-স্থাপকতা। জীবনের সে শুভ মুহূর্তে সাহিত্য-শিল্পীও তখন স্থির চিত্তে প্রবেশ করবেন জীবনের গভীরে—আর সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে ফুটিয়ে তুলবেন জীবনের অতলান্ত রহস্যরূপ—তাঁর সাহিত্য-শিল্পে। বর্তমান জার্নালিস্টিক সাহিত্যের অনন্ত নক্ষত্রলোকে ধ্রুবতারার স্থির দীপ্তিতে দীপ্তিময় সে ধরণের সৃষ্টিও একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়—কি পাশ্চাত্য দেশে কি এদেশে। চারদিকের নৈরাশ্যের মধ্যে এটাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

সাহিত্যে পুচ্ছগ্রাহিতা

আমরা মধ্যযুগেব কবিদের নিন্দা কবে থাকি পুচ্ছগ্রাহী প্রবৃত্তির জন্যে। এ পুচ্ছগ্রাহিতার ফলেই মধ্যযুগের সাহিত্য বৈচিত্র্যহীন—অবশ্য একমাত্র বৈষ্ণব কবিতা ছাড়া। সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি দেখে যে কোন প্রশ্নমনস্ক পাঠকের মনে এ কথা উদিত হওয়া স্বাভাবিক, যে পুচ্ছগ্রাহিতার জন্যে মধ্যযুগের কবিরা আমাদের নিন্দাভাজন—সে প্রবৃত্তি থেকে আমাদের বর্তমান লেখকেরা মুক্ত কী ?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সামাজিক অভিজ্ঞতাব বিস্তৃতিব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বর্তমান সৃজনধর্মী সাহিত্যেব বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে গেছে। বৈচিত্র্য কিছুটা বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে বৈচিত্র্য যে আশানুরূপ নয়—এ কথা আমরা অস্বীকার কবব কী করে ? সমসাময়িক পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যিক যেখানে জীবন-চিন্তাব সর্বাধুনিক তত্ত্বগুলিকে নিযে সৃষ্টিব আনন্দে মেতে উঠেছেন,—আমাদের স্রষ্টারা তখনও গতানুগতিক ধারায় হৃদয়চর্চা-নির্ভর বিষয় নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত। এ কি আমাদের লেখকদের মানসিক ক্লৈব্যেব লক্ষণ, না বৈশ্য-প্রভাবিত যুগ-প্রবৃত্তির কাছে অকুণ্ঠ নতি স্বীকাব—এ কথা আজ সাহিত্য-সচেতন ব্যক্তি মাত্রকেই ভাবিয়ে তুলেছে।

সৃষ্টিকর্ম মানেই হল নিত্য নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার প্রকাশ। যে সৃষ্টিতে নবীন চিন্তার পবিচয় নেই, কিংবা বহিবঙ্গের দিক থেকে যে সৃষ্টি অভিনব রূপ নিয়ে দেখা দেয় না—সে সাহিত্যকে ঠিক সৃষ্টিকর্ম বলা চলেনা। পূর্ব যুগের সাহিত্যে সে নবসৃষ্টির চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হযেছিলেন মধুসূদন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, তারকনাথ, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মত লেখক। সাহিত্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় এঁরা যেমন নতুন দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি বিষয়বস্তু অনুযায়ী এঁরা ভাষাকেও নতুন করে গড়েছিলেন। এমন কি বিশ শতকীয় লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম প্রভৃতি প্রতিভাবান শিল্পী তীব্র তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা এবং ভাষা-ভঙ্গীর অভিনবত্বের পরিচয় দিয়ে সাহিত্যে নবযুগের আবাহন করেছিলেন।

এ ছাড়া এ শতকের উত্তর-তিরিশের কোন কোন লেখকের বিষয়বস্তু পরিকল্পনায় এবং নতুন প্রকাশ-রীতিতে পূর্ববর্তী সৃষ্টিধর্মী লেখকদের মত বৃহত্তর প্রতিভার স্ফুরণ না ঘটলেও, তাঁদের সৃষ্টিতে ক্ষুরধার জীবনচিন্তার যে বিদ্যুৎবিকাশ দেখা দিয়েছিল—তা ছিল সমকালীন পাঠক-সমাজের অভিনন্দনযোগ্য। এ শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে স্মরণীয় নাম হল—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি দিক্‌পালের। এঁরা ঠিক পূর্বসূরীদের বহু-চিহ্নিত পদাঙ্ক অনুসরণ না করে সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নতুন পথরেখা এঁকে গেছেন। এ বক্তব্যকে আব একটু স্পষ্ট করবার চেষ্টা কবা যাক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্টিকর্মে শুধু শ্রমিক-জীবন-চিত্র অঙ্কিত কবেই ক্ষান্ত হননি,—'ব্রাত্য' শ্রমিকদেব অসংস্কৃত ভাষাকেও ব্যাপকভাবে সাহিত্যে ব্যবহার কবে দুঃসাহসের পবিচয় দিয়েছিলেন। আমাদের বর্তমান লেখকদেব মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রদর্শিত বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীব আদর্শ অনুসরণ কবে পুচ্ছগ্রাহিতার পবিচয় দিয়েছেন। যুগ-ক্রান্তিব মননশীল রূপ অঙ্কনে তারাশঙ্কব সে যুগে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে সাহিত্যে সার্থক রূপদান প্রয়াসে তিনিও শৈলজানন্দেব পুচ্ছানুসারী। নাগরিক বিকৃত জীবনেব বাস্তব রূপ বর্ণনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পে যে নবযুগেব প্রবর্তন করেন, সে অভিনব বাস্তবতা-বোধ সে যুগে বহু পুচ্ছানুসারী ছোটগল্প লেখকের সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য তাঁর আশ্চর্য ব্যঞ্জনাধর্মী পরিবেশসৃষ্টি-নৈপুণ্য এবং ভাষাব্যবহারেব ক্ষমতা ঐ যুগেব লেখকদের মধ্যে অননুকৃত। তাঁর কাব্য রচনায় সুদূরের প্রতি অনীহা এবং শ্রমিকজীবনের প্রতি সহানুভূতিও সমসাময়িক ও পববর্তীকালে বহু পুচ্ছগ্রাহী লেখকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। গল্প উপন্যাস কাব্য এবং নাটক রচনায় 'বনফুলে'র বহুমুখী কৌতূহল নতুনত্বে সঞ্জীবিত—কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা এবং সূক্ষ্ম মননশীলতা অবলম্বনে ক্ষমতাহীন লেখকেরা পুচ্ছগ্রাহী রচনা করতে সক্ষম হননি। মনোবিকলন ও শ্রেণীসংঘাতকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নতুন গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি করছিলেন—সে ধারার পুচ্ছগ্রাহী লেখকের সংখ্যা শুধু সে যুগে কেন—এ যুগেও খুব বেশী। আধুনিক আন্তর্জাতিক মনোভাব নিয়ে চিন্তাশীল লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় যে উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন,—তাঁর পুচ্ছগ্রাহী

লেখক না জোটায় সাহিত্যে এখনও তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ। ভ্রমণকাহিনী রচনার ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী পুচ্ছগ্রাহী লেখক সৃষ্টি করেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। তাঁরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে অবধূত, সুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ ভ্রমণ-কাহিনী লেখক সাম্প্রতিক কালে পাঠক-মহলে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

কাব্যের ক্ষেত্রে স্ব-যুগে নজরুল ইসলামের কোন কোন অনুকারী জুটলেও বর্তমান যুগে তাঁর প্রভাব নেই বললেই চলে। তাঁর কাব্যভাষা ব্যবহারে মোহিতলাল মজুমদার কোন কোন ক্ষেত্রে পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিলেও ধ্রুপদী রীতির কাব্য রচনায় স্ব-যুগে তিনি অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কোন কোন কবি তাঁর ভাবাদর্শ অনুসরণে পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর কাব্যরীতি এখনও অননুকৃত। যে দুঃখবাদের প্রভাবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি তির্যক ভঙ্গীব প্রাধান্য,—সে ভঙ্গীর অনুসরণ দেখা যায় পববর্তী বহু কাব্য-কবিতায়। নাটকে রবীন্দ্র মৈত্রের সমাজ-চেতনা পরবর্তী বহু পুচ্ছগ্রাহী নাট্যকারের সৃষ্টি করেছে।

কাব্য-কবিতায় এবং কাব্যিক গদ্যরীতিব অনুসরণে এক শ্রেণীব লেখকের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পুচ্ছগ্রাহিতা যখন চরমে উঠেছিল, তখন কাব্য এবং গদ্যরীতিতে পাশ্চাত্য আদর্শেব অনুসরণে একটি অভিনব ধ্রুপদী রীতিব প্রবর্তন করলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীর স্বস্বাতন্ত্র্যেব কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক এক শ্রেণীর কবিতায় এবং গদ্য রচনায় নিরঙ্কুশভাবে চলছে এঁদের রচনার পুচ্ছগ্রাহিতা। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাব পুচ্ছগ্রাহিতাও এককালে প্রবল ছিল। আজকাল অবশ্য তাঁর কাব্যের পুচ্ছানুসারী কবি বেশী দেখা যায না।

আজ গল্প উপন্যাস ও রম্য বচনার জগতেই এই পুচ্ছানুসরণ-প্রবৃত্তি অতি-প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কোন লেখক যদি বহু সাধনার ফলে উক্ত শ্রেণীব রচনায় অভিনব কিছু সৃষ্টি করেন, অমনি দেখা যায় তাঁর রচনার পুচ্ছানুসবণ শুরু হয়ে গেছে। রম্য-রচনার ক্ষেত্রে যাযাবর এবং মুজতবা আলি যে বিদগ্ধ-রীতির প্রবর্তন করেন তার পুচ্ছানুসরণ কিছুকাল চললেও আজকাল তেমন আর দেখা যায় না। কয়েক বৎসর আগে উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্টিক উপন্যাস লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেন বিমল মিত্র। অমনি শুরু হল ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে তাঁর রচনার পুচ্ছগ্রাহিতা। আজকাল দেখা

যাচ্ছে এ শ্রেণীর অর্ধ-ইতিহাস এবং কল্পনা-মিশ্রিত রোমান্টিক কাহিনী রচনায় গল্প-উপন্যাসিকেরা অক্লান্ত উত্তমের পরিচয় দিচ্ছেন।

শ্রেণী-সংঘাতের কাহিনী নিয়ে সুবোধ ঘোষ কিছুকাল পূর্বে যে শক্তিমান গল্প রচনা করেছিলেন তারই পুচ্ছানুসরণ দেখা যায় সমসাময়িক এবং পরবর্তী বহু গল্প-উপন্যাসে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অসংবৃত আদিম জীবনের অবলম্বনে একদিন যে চমকপ্রদ অথচ ব্যঞ্জনাময় কাহিনী রচনা করে পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেন,—সে ধারাকে অবলম্বন করে সাম্প্রতিক কালের কোন কোন শক্তিমান লেখকও পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিচ্ছেন। ধীবর কাহার হাড়ি মুচি ডোম প্রভৃতি সমাজের নীচুতলার জীবদের নিয়ে রোমান্টিক কাহিনী রচনায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল কিছুকাল আগে—তারই পুচ্ছানুসরণে গণধর্মী কাহিনী রচনা করে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করেছেন সাম্প্রতিক কালে কোন কোন লেখক। বর্তমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিল চিন্তা নিয়ে রসোত্তীর্ণ গল্প-উপন্যাস রচনা করে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারছেন খুব কম গল্প-উপন্যাস লেখক। এর কারণ কী? এর একমাত্র কারণ লেখকদের পুচ্ছগ্রাহী প্রবৃত্তি বললে ভুল বলা হবে কী?

এ কথাটা চিন্তা করুন বর্তমান গল্প-উপন্যাস লেখক ও বিদগ্ধ পাঠক।

৬

যুগান্তরকারী উপন্যাস

উপন্যাসের উৎকর্ষ বিচারে আমাদের সমালোচকেরা অনেক সময় শিথিলভাবে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করে থাকেন। কোন একটা বিশেষ দিক থেকে উপন্যাসটি একটু ভাল লাগলেই তখনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন—"বইখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস হয়েছে।" অথচ উপন্যাস বিচারে 'যুগান্তরকারী' কথাটি কতটা অর্থবহ সে কথা তাঁরা চিন্তাও করেন না। বর্তমান আলোচনায় যুগান্তবকারী উপন্যাসের স্বরূপ-লক্ষণ কী, পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যে যুগান্তরকারী উপন্যাস কাকে বলা চলে—তার একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা কবব। এ আলোচনার স্বল্প পবিসরে এ পরিচয় যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ হবে—তা বলাই বাহুল্য।

ভাবাদর্শ, জীবনজিজ্ঞাসা, চবিত্র-বিশ্লেষণ বা টেকনিকেব অভিনবত্বে যখন কোন উপন্যাস সমসাময়িক এবং পরবর্তী কথা-শিল্পী বা সমাজ-জীবনের ওপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করে—তখন তাকে বলা চলে যুগান্তবকারী উপন্যাস। এ শ্রেণীর উপন্যাস সমকালীন বা উত্তরকালের ঔপন্যাসিকের মনে যে শুধু সৃষ্টি-প্রেরণার সঞ্চার করে তা নয়, সকল যুগের সাহিত্য-পাঠকের সদাজাগ্রত চৈতন্যকে চকিত কবে নতুন ভাবধারা ও রূপাঙ্গিকের স্পর্শে। মহৎ ভাবাদর্শের প্রেরণায় কখনও পাঠকের মন হয় উদ্দীপ্ত, আবার কখনও নতুন টেকনিকের ঔজ্জ্বল্যে শিল্পী খুঁজে পায় নবসৃষ্টির ইঙ্গিত। এ ধবনের উপন্যাস সব সময় মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত না হলেও যে অনন্য সৃষ্টি হযে ওঠে এবং সমসাময়িক সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের গতি নির্ণয়ে সহায়তা করে তা নিঃসন্দেহ।

উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসনের একখানি উপন্যাসের কথা ধরা যাক। রিচার্ডসনের মননশক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রিচার্ডসনকে মনে হবে একজন বিরক্তিকর তরল ভাবপ্রবণ লেখক। কিন্তু মননশক্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি সে যুগে এমন একখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন যার প্রভাব রুশোর মত মননশীল ব্যক্তিকেও উদ্বুদ্ধ

করেছিল এরূপ একখানি বই লিখতে—যা একযুগ পর্যন্ত পাঠকের মনকে. বেদনার্দ্র করে রেখেছিল। রিচার্ডসনের এ উপন্যাসখানির নাম হল 'ক্লেরিসা' (*Clarissa*)। প্রকাশকাল : ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এ উপন্যাস খানিকে সৃষ্টি হিসেবে উচ্চ শ্রেণীর মনে না হলেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তাঁর যুগ-বিচারে উপন্যাসখানি অনন্যসৃষ্টি। এ অনন্যতার মূল কারণ হল সাম্যবাদী ভাবের ক্রমবিকাশের ধারায় এ উপন্যাসখানির দান অমূল্য। এটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন লেখক একটি ঝি-কে তাঁর রোমান্সের নায়িকা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। প্রধানতঃ সে যুগের মেয়েদের জন্যই তিনি উক্ত উপন্যাসখানি লিখেছিলেন, এবং সে হিসেবে উপন্যাসখানি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছিল—সন্দেহ নেই। টেকনিকের দিক দিয়েও উপন্যাসখানি অভিনবত্বের দাবি করতে পারে। কারণ তিনিই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ঔপন্যাসিক—যিনি পূর্ব শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কথাকার ডিফো-র আত্মকথা-বর্ণনামূলক ভঙ্গীকে বর্জন করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কাহিনী-বর্ণনা রীতির প্রবর্তন করেন। এ রূপাঙ্গিকের সাহায্যে উপন্যাসোল্লিখিত চরিত্রের মনোবিশ্লেষণেও তিনি অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সমসাময়িককালে এ উপন্যাসখানি ইংলণ্ডে ও কন্টিনেন্টে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আলোচনার যোগ্য। উপন্যাসখানি শুধু যে সমকালীন ইংরেজের অন্তরে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা নয়,—সমসাময়িক কালে জার্মানীর ও ফ্রান্সের পাঠকও এ বইখানি পড়ে যথেষ্ট চোখের জল ফেলেছিল। ফরাসীতে বইখানির অনুবাদ হয়েছিল, আর সমস্ত কন্টিনেন্টে এ ধরনের উপন্যাস লেখার একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক দিদেরো (Diderot) রিচার্ডসনের প্রতিভাকে মোসেস (Moses), হোমার, ইউরিপিডিস ও সফোক্লিসের সঙ্গে তুলনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। ফরাসী কবি আল্‌ফ্রেড দ্য মুসে (Alfred de Musset) প্রবল ভাবাবেগে উপন্যাসখানিকে জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বর্ণনা করে গেছেন। ফরাসী দেশের পাঠিকাদের ওপর এ উপন্যাসখানি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। Madame de Stael নামে একজন গভীর আবেগপ্রবণ মহিলা রিচার্ডসনের মৃত্যুর পর প্যারী থেকে লণ্ডনে আসেন শুধু নারী-দরদী রিচার্ডসনের সমাধির ওপর বসে একটু কাঁদবার জন্যে। লণ্ডনে এসে

ওঠেন তিনি গোল্ডেন ক্রস হোটেলে। পরদিন সকালে ফ্লিট স্ট্রীটের সেণ্ট ব্রাইড সমাধিক্ষেত্রেএসে রিচার্ডসনের সমাধির কাছে বসে তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকেন। পরে অবশ্য তিনি জানতে পারেন যে,—যে সমাধির ওপর তিনি এত অশ্রুবর্ষণ করেছেন, সে সমাধি প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রিচার্ডসনের সমাধি নয়,—সম্পূর্ণ অ-সাহিত্যিক রিচার্ডসন নামক একজন কসাইয়ের সমাধি মাত্র!

রিচার্ডসনের তরল ভাবালুতার থেকে মুক্ত করে বাস্তব-জীবনের ছায়াপাতে জীবন্ত উপন্যাস সৃষ্টি করলেন হেনরি ফিল্ডিং খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সে হিসেবে তাঁর টম জোন্স (*Tom Jones*, ১৭৪৯) একখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক টম জোন্সের জীবনে দোষ-ত্রুটির সীমাসংখ্যা নেই—সে লম্পট, মদ্যপ, ক্রীড়াসক্ত। কিন্তু এ সমস্ত দোষ-দুর্বলতা সত্ত্বেও জোন্স সাহসী বদান্য ও ভদ্র—ভালমন্দের সমবায়ে টম জোন্স মানুষ। এই "মানুষে"র চরিত্র সৃষ্টি করে ফিল্ডিং ইংরেজী সাহিত্যে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন। বাস্তবজীবনের চিত্রকর হিসেবে হ্যাজলিট্ ফিল্ডিংকে তুলনা করেছেন হগার্থের (Hogarth) সঙ্গে; আর মানব-প্রকৃতিব-সন্ধানী দ্রষ্টা হিসেবে তাঁব স্থান নির্দেশ করেছেন শেক্সপীয়রের কিছু নিম্নে।*

ইংরেজী উপন্যাসের আবার মোড় ঘুরল ওয়াল্টার স্কটের প্রতিভা-স্পর্শে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁব রচিত Waverly Novels প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জনপ্রিয় রচনা হিসেবে সে উপন্যাস সমসাময়িক আর সমস্ত সাহিত্য-শিল্পকে হার মানিয়েছে। রিচার্ডসন আর ফিল্ডিংয়ের রচনার অনুকরণ প্রিয়তা অন্ততঃ সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়েছে, মিসেস র‍্যাডক্লিফের রোমাঞ্চগুলো তাদের অভিনবত্ব হারিয়েছে, মারিয়া এজওয়ার্থ (Maria Edgeworth) আর লোকে পড়ে না। স্কটের Waverly প্রকাশের পূর্বে যেখানে উপন্যাস-পাঠক ছিল শত শত, Waverly প্রকাশের পর সেখানে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেল হাজারে হাজারে। স্কটের Waverly উপন্যাসকে নিঃসন্দেহে যুগান্তরকারী উপন্যাস বলে অভিহিত করা চলে।

কী সে স্কটের জাদুমন্ত্র যার সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডের অগণ্য পাঠককে মাতিয়ে তুললেন? সে জাদু হল জীবনের তুচ্ছ পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে যে পরম আস্বাদ্য

* "As a painter of real life he was equal to Hogarth, as a mere observer of human nature, he was little inferior to Shakespeare."—Hazlitt.

রোমান্টিক স্বর্গলোক বিরাজ করে—সুদূরপ্রসারী কল্পনার সাহায্যে সে স্বপ্নরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন তিনি অগণিত পাঠকের সামনে। ইংরেজী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে স্কট বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ গতানুগতিক যুক্তিপূর্ণ রচনার বিরুদ্ধে। তাঁর উপন্যাস ফিল্ডিংয়ের বাস্তবতা আর রিচার্ডসনের তরল ভাবালুতার বিরুদ্ধে যেন মূর্ত প্রতিবাদ। তাঁর কল্পনা পাঠকের মনকে সবেগে টেনে নিয়ে গেল যেন সামনের আলোকিত রাজপথ থেকে সুদূর পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায়। উপন্যাস-শিল্পে এই নতুন প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য স্কট ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম নায়করূপে পরিচিত।

স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনা যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নি—এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাকে ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় স্থাপন করে তিনি সমসাময়িক পাঠককে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলী অনুধাবন করলে দেখা যাবে,—সুদীর্ঘ আট শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত সে সমস্ত ঘটনা। উন্মুক্ত জীবনপরিবেশকে ভালবাসতেন স্কট। সক্রিয় মানুষের বীরকীর্তিগুলো আকর্ষণ করেছিল তাঁর অন্তরের অন্তহীন শ্রদ্ধা। অথচ সবল মানুষের সহজ জীবনযাত্রাও অর্জন করেছিল তাঁর অকুণ্ঠ প্রীতি। সেজন্য সাহিত্যক্ষেত্রে স্কটের স্থান অপ্রতিহত—আজও কাহিনী-কার হিসাবে স্কটের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সমসাময়িক ইংরেজ ও ফরাসী রোমান্টিক ঔপন্যাসিক-দের ওপর স্কটের প্রভাব প্রত্যক্ষ। অন্ততঃ ত্রিশ বছর যাবৎ প্রখ্যাত ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক ভিক্টোর হুগো ছিলেন স্কটের ভাবশিষ্য। স্কটের উপন্যাসের রচনারীতি অনুসরণ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন James Ainsworth, Lytton, Kingsley, Victor Hugo এবং Dumas। জনৈক সমালোচকের মতে উত্তর-কালের মানুষ দান্তে, শেক্সপীয়র ও ডিকেন্সের কাছে যতটা ঋণী—স্কটের কাছে তার চাইতে কম ঋণী নয়।*

ভিক্টোরীয় যুগে ডিকেন্সের যুগান্তরকারী উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী উপন্যাসের গতিপথ আবার পরিবর্তিত হল। স্কট-প্রদর্শিত রোমান্টিক স্বর্গলোক থেকে পাঠকের দৃষ্টিকে তিনি সবলে আকর্ষণ করলেন নির্যাতিত

* Posterity owes him nearly as great a debt as it owes to Dante, Shakespeare and Dickens—*The Outline of Literature*, Ed. by John Drinkwater, p. 464.

মানবতার দিকে। বিপুলকায় লণ্ডন শহরের রাস্তায় রাস্তায় যে বঞ্চিতের দল ঘুরে বেড়ায়, ফ্যাক্টরীর যে সমস্ত শ্রমিক গ্লানিকর জীবন যাপন করে, আর নগরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি-ঘুপচিতে যে অসংখ্য মানুষ অখ্যাত জীবন যাপন করে—তাদের বেদনার বাণীকে মুখর করে তুললেন ডিকেন্স তাঁর দীপ্ত বর্ণনা ও ট্র্যাজিক হিউমার দিয়ে। তাঁর উপন্যাসেই ভিক্টোরীয় যুগের সমাজ-চেতনা প্রথম সার্থক রূপ পেল। সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ডিকেন্স তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে নীতি প্রচার করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রচারধর্মকে শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করতে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন,—সে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ডিকেন্স। যে মহৎ উপন্যাস-শিল্পে ভিক্টোরীয় যুগ সমৃদ্ধ—তার পথিকৃৎ ডিকেন্স। ডিকেন্সের উপন্যাস স্থানে স্থানে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু যে জীবন-চেতনায় তাঁর উপন্যাসগুলো স্পন্দমান তাতে সাহিত্যের ঐতিহাসিক কম্পটন-রিকেটের ভাষায় এ কথা বলা চলে,—কালের পরিবর্তনে সেগুলো কখনও পুরনো হবে না, বা সামাজিক রীতির পরিবর্তনে সেগুলো কখনও তার বৈচিত্র্য হারাবে না।* তুচ্ছ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সাধারণ লোকের জীবন-কাহিনী বলার ক্ষেত্রে ডিকেন্স এখনও উল্লেখযোগ্য শিল্পী। তাঁর প্রদর্শিত রীতি অনুসরণ করে তাঁর যুগে ও পরবর্তীকালে আরও কত সার্থক শিল্পী ইংরেজী উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু ডিকেন্সের প্রতিভা এখনও অম্লান। *Pickwick Papers* থেকে তাঁর শেষ অসমাপ্ত রচনা *Edwin Drood* পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রচনাই সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবি রাখলেও ডিকেন্সের *David Copperfield* নিঃসন্দেহে একখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস। এ উপন্যাসখানি ডিকেন্সের প্রথম সংঘাতপূর্ণ জীবনের ছায়াপাতে জীবন্ত। এ ছাড়া এ উপন্যাসের বহু অংশ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাই এ জীবন-ধর্মী উপন্যাস ডিকেন্সকে ইংরেজী সাহিত্যে অমরতা দান করেছে।

ভিক্টোরীয় যুগের শেষ পর্যায়ে যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে বিখ্যাত হন শার্লোট ব্রন্তে ও টমাস হার্ডি। ব্রন্তের 'জেন আয়ার' (*Jane Eyre*, ১৮৪৭) নিঃসন্দেহে একখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস। তিনটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রন্তে ইংরেজী উপন্যাস-জগতে এ অসাধ্যসাধন করতে সক্ষম হন। প্রথমতঃ

---

* Age cannot wither them nor custom stale their infinite variety.—*A History of English Literature*, Compton-Rickett, p. 449.

তাঁর রচনার অন্তরঙ্গ ভঙ্গী। উত্তর-এলিজাবেথীয় যুগের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক—যেমন ডিফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ন, স্মলেট, বা গোল্ডস্মিথ—এঁরা সকলেই যেন পাঠক-সমাজ থেকে একটু দূরত্ব রক্ষা করে তাঁদের কাহিনী শোনাচ্ছেন। এমন কি স্কটের ভেতরও অন্তরঙ্গতার সুর নেই। জেন অস্টেনও কাহিনীর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। ডিকেন্স অবশ্য তাঁর রচনার ভেতর সহজ আনন্দময় ও বন্ধুত্বের সুরটি বজায় রেখেছেন। কিন্তু 'জেন আয়ার' উপন্যাসে ব্রন্টে যে সুরটি যোজনা করলেন সে সুর ইংরেজী উপন্যাসে অভিনব—সে সুর নিবিড় অন্তরঙ্গতায় ভরা—নিজেকে যেন সমস্ত উপন্যাসের ভেতর বিস্তার করে দিয়েছেন ব্রন্টে। সমস্ত উপন্যাসটি লেখিকার ব্যক্তিত্ব-সৌরভে আকর্ষণীয়।

ব্রন্টের উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর অগ্নিগর্ভ আবেগ-প্রকাশের (note of passion) তীব্রতা। নারীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনকে দেখার দুঃসাহস ব্রন্টের আগে আর কেউ করেন নি। নিঃসঙ্গ অবদমিত নারীত্বকে এতটা গভীর তীব্রতা দিয়ে শুধু তাঁর যুগে কেন, আধুনিক স্বাধীন ভাবপ্রকাশের যুগেও খুব কম লেখকই ফোটাতে পেরেছেন। নারীও যে মানুষ,—তারও যে ভাবনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা আছে—এ সত্যের গভীর উপলব্ধি ব্রন্টের উপন্যাস।

একটা প্রবল বিদ্রোহের চেতনা ব্রন্টের উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্তরের বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন ধারায়। প্রথমতঃ, উপন্যাসের নায়িকা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন। দ্বিতীয়তঃ, জীবনধারায় নারীর স্থান সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে তিনি উল্টে দেন। তৃতীয়তঃ, জীবন-পরিবেশে তিনি যে অস্বাভাবিকতা কুটিলতা ও নির্মমতা দেখেছিলেন, তাকে ফুটিয়ে তোলেন জীবন্ত রেখায়। নারী শুধু মাত্র মোমের পুতুল—পুরুষের বহুকাল-প্রচলিত এ ধরনের ধারণার মূলে কঠোর আঘাত করেন ব্রন্টে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টি করে।

ভিক্টোরীয় যুগের শেষ যুগান্তরকারী উপন্যাস-লেখক টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮)। প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির কাছে মানবজীবনের ব্যর্থতা, প্রকৃতির বিরাটত্বের কাছে মানুষের ক্ষুদ্রতা, দৈবের অনতিক্রমণীয় শক্তিকে এড়িয়ে যাবার জন্য মানুষের অসার্থক প্রয়াস—হার্ডির উপন্যাসকে মহাকাব্যের গৌরব দান করেছে। গভীর জীবন-চেতনার সাহায্যে হার্ডি উপলব্ধি করেছিলেন,—সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাই মানবচরিত্রের গভীরতম রহস্য

সন্ধান করতে হলে যেতে হবে আদিম প্রকৃতির বুকে প্রতিপালিত সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেজন্য আমরা দেখতে পাই, মানবপ্রকৃতির এ আদিম রূপের রহস্য উপলব্ধির জন্যে জীবনের অনেক সময় কাটিয়েছেন হার্ডি লণ্ডনের সভ্য নাগরিক-জীবন থেকে দূরে ওয়েসেক্সের জলাভূমিতে ও গোচারণভূমিতে,—আর উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি আদিম প্রকৃতির লীলা-নিকেতন প্রাচীন ওয়েসেক্সের এগ্‌ডন হিদ্‌। একটি দেশের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে কোন মহৎ উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেন নি আর কোন ঔপন্যাসিক—যেমন করেছেন হার্ডি তাঁর যুগান্তরকারী উপন্যাস *The Return of the Native*-এ (১৮৭৮)। এ উপন্যাসখানি পড়তে গিয়ে প্রথমেই মনে হবে, যেখানে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য মানবচরিত্রের অতলান্ত রহস্য উদ্ঘাটন—সেখানে উপন্যাসের পটভূমিকা এত সীমাবদ্ধ কেন? কিন্তু কথাটা ভোলা উচিত নয় যে, বিস্তৃত ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্যে পটভূমিকার বিস্তার ততখানি অপরিহার্য নয়, যতখানি প্রয়োজন মানব-চরিত্র সম্পর্কে লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। অনুভূতির যদি গভীরতা থাকে তা হলে সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যেও মানব-জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করা সম্ভব। হার্ডি ছিলেন মানব-চরিত্রের সেই গভীর অনুভূতিশীল পাঠক। তাই তিনি সমস্ত জগৎকে, মানবজীবনের সমস্ত গৌরব ও ব্যর্থতাকে প্রতিবিম্বিত দেখতে পেয়েছিলেন এগ্‌ডন হিদের (Egdon Heath) ক্ষুদ্র পরিধিতে।

দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে হার্ডি দেখেছেন ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে। পটভূমিকা সৃষ্টির দিক দিয়ে হার্ডি ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। *The Return of the Native*-এর পটভূমিকা Egdon Heath শুধু মাত্র একটি ভৌগোলিক স্থান মাত্র নয়—একটা অশরীরী আত্মার মত এ স্থানটি সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, আর চরিত্রগুলির অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে সক্রিয় সহায়তা করেছে। হার্ডির প্রতিভার স্পর্শে প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যও অর্জন করেছে একটা স্বতন্ত্র ও অধ্যাত্ম সত্তা—ইংরেজী সাহিত্যে যার তুলনা আর মেলে না। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এই ছিল হার্ডির দৃষ্টি—এ দৃষ্টি দিয়েই তিনি দেখেছিলেন ওয়েসেক্সের কৃষক-জীবনকে, আর এ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন মানব-চরিত্রের গভীরে। ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে হার্ডির প্রতিভা অনন্য—এতে সন্দেহ নেই।

১৯১৪ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি (দুটো মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী) ইংলণ্ডে যে যুগ চলছিল তাকে বলা চলে একটা বিপর্যয়ের যুগ। এ বিপর্যয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক নৈতিক ও মননশীলতার ক্ষেত্রে। এ বিপর্যয়ের ফলে সাহিত্য রচনার উপাদানেও এল জটিলতা। ঔপন্যাসিককে উপন্যাস রচনায় এমন একটা টেকনিক উদ্ভাবন করতে হল—যার মধ্যে জীবন সম্পর্কে সমস্ত ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া চলে। এ পর্যন্ত নাটকে, রচনা-প্রবন্ধে, বা দীর্ঘ কবিতায় জীবন সম্বন্ধে যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া হত—তাও অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল অভিনব টেকনিকে রচিত উপন্যাসে। উপন্যাসের আঙ্গিক হয়ে উঠল অনেকটা হোল্ড-অলের (hold-all) মত—যার মধ্যে সব রকমের চিন্তা-ভাবনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া চলে।

এ নতুন টেকনিকে উপন্যাস রচনা করে ইংরেজী উপন্যাস-জগতে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিলেন জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)। তাঁব এই যুগান্তরকাবী উপন্যাসের নাম হল *Ulysses*। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এ উপন্যাস রচনা শুরু করতে গিয়ে জয়েসেব মনে এ ইচ্ছাটা প্রচ্ছন্ন ছিলঃ "Police notwithstanding, I should like to put everything in my novel"। বাস্তবিকই বইখানা ছাপা হবাব আগে যখন পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছিল তখন আমেরিকাব কোর্টের নির্দেশে সে প্রকাশ বন্ধ কবে দেওয়া হয়। আট বছর পরে বইখানি প্রকাশিত হয় প্যারিসে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, আর দীর্ঘ বিশ বছরেব আগে ইংলণ্ডেব কর্তৃপক্ষীয়েবা বইখানিকে ইংলণ্ডে প্রকাশ করতে বা বিক্রি করতে অনুমতি দেয় নি।

ডাবলিনের কয়েকটি লোকের জীবনের একটি দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে (১৬ই জুন, ১৯০৪) এ উপন্যাসখানি লিখিত। তাঁদের চিন্তাধারা ও জীবনের কর্মধারাকে উপস্থাপিত কবা হয়েছে এ উপন্যাসে অত্যন্ত বিচিত্র ভাবে এবং বিস্তৃত কৌশলের সাহায্যে। এ কলাকৌশলের অধিকাংশই ইংরেজী উপন্যাস-জগতে অভিনব। এ অভিনবত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তুর চাইতে প্রকাশভঙ্গীর ওপর গুরুত্ব অর্পণ। শব্দ ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন জয়েস এই উপন্যাসে শব্দগুলোকে ভেঙে। সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে শব্দার্থে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন তিনি। নতুন রূপাঙ্গিকে উপন্যাস রচনায় এরূপ শব্দসৃষ্টির উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন জয়েস এ

উপন্যাসে। নিজ্ঞান (unconscious) মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর এই অদ্ভুত শিল্পকর্মে। কোথাও কোথাও আবার তিনি অবতরণ করেছেন মানুষের অন্তর্জ্ঞানীয় মনের অন্ধ গুহায়। সম্পূর্ণ নতুন টেকনিকে রচিত জয়েসের উক্ত উপন্যাসখানি তাঁর যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনার ওপর বিস্তার করেছে একটি অনতিক্রমণীয় প্রভাব। এ উপন্যাসের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা চিন্তা করে একজন সাহিত্যিক মন্তব্য করেছেন—"...writers who have never read it—perhaps never heard of it—have yet been influenced by it in one way or another."

শুধু ইংরেজী সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও এরূপ যুগান্তরকারী উপন্যাসের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক Gustave Flaubert তাঁর আপাত-দুর্নীতিমূলক উপন্যাস *Madame Bovary* লেখার জন্যে আইনের দায়ে পড়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উপন্যাসে বুর্জোয়া সমাজের মনোবৃত্তিব তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তিনি যে বাস্তব-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা পরবর্তীকালে ফরাসী ঔপন্যাসিকদের ওপর দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব বিস্তাব করেছিল। গী দ্য মোপাসাঁ, গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়, জোলা, দোদে প্রভৃতি ফরাসী বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক তো তাঁর সাহিত্যশিষ্য-শ্রেণীভুক্তই হয়েছিলেন। এ ছাড়া আধুনিক ফরাসা বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে খুব কম লেখকই আছেন—যিনি ফ্লবেয়ারকে সাহিত্যগুরু বলে স্বীকাব করেন না।

নিছক বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যুগান্তবকারী উপন্যাস রচনা করে এ-যুগে পৃথিবীতে খ্যাতিমান হয়েছেন রাশিয়ার অমর কথাশিল্পী Count Leo Tolstoy (১৮২৮-১৯১০)। রাশিয়ার ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় রচিত তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস *War and Peace* শুধু রাশিয়াব সাহিত্যে নয়—পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যের জগতে একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। মহাকাব্যের বিরাট বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের সংক্ষুব্ধ পটভূমিকায় মানবজীবনের আদর্শ অনুসন্ধান করেছেন টলস্টয় এ মহা-উপন্যাসে। মানবজীবনের এ আদর্শ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা শুধু যে তাঁর সমকালীন রাশিয়ার লেখকদের অন্তরে বিরাট অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল তা নয়,—সমস্ত পৃথিবীর মননশীল লেখক ও শান্তিবাদীদের মনেও জাগিয়ে তুলেছে মানবজীবনের আদর্শ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন।

রমাঁ রলাঁর (Romain Rolland) মত ফরাসী মানবতাবাদী জীবন-শিল্পী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন টলস্টয়ের জীবনাদর্শের দ্বারা। রলাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তফের (*Jean Christophe*) ওপর টলস্টয়ের জীবনাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বর্তমান কালে দ্বন্দ্ব-মুখর ও প্রতিক্রিয়াশীল মানব-প্রবৃত্তির পটভূমিকায় মানবজীবনের শ্রেয় ও কল্যাণবোধের যে আদর্শ অনুসন্ধান-চেষ্টা চলছে সমস্ত জগৎব্যাপী,—তার পথিকৃৎ জীবন-শিল্পী টলস্টয়। মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এ বইখানির মত এত লোকপ্রিয়তা বোধ হয় আর কোন উপন্যাস লাভ করে নি। অনেক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকও এ উপন্যাসখানিকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেন নি। বর্তমান পৃথিবীর উপন্যাস-শিল্প-জগতে একটা নতুন যুগের বাণী বহন করে এনেছে টলস্টয়ের এ যুগান্তরকারী উপন্যাসখানি।

শুধু আদর্শবাদ নয়, শুধু বাস্তববাদও নয়,—উপন্যাস-শিল্পের সঙ্গে মননধর্ম যুক্ত করে আধুনিক জীবন-বাদী উপন্যাস রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস *Magic Mountain*-এ। এ হিসেবে এই উপন্যাসখানিকে বলা চলে যুগান্তরকারী উপন্যাস। আধুনিক জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার ফলে বিশ্ববিধানে যে ভাঙন-প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে, মানবসমাজের সে বেদনাবহ পরিণাম মান'কে অনুপ্রাণিত করেছিল এ যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনায়। দীর্ঘ দশ বছর লেগেছিল উপন্যাসখানি সমাপ্ত করতে (প্রকাশকাল ১৯২৪) এই চিন্তাশীল মনীষীর। নিত্য নতুন ভাবধারা ও নবজাগ্রত শক্তির প্রভাবে আমাদের আধুনিক সমাজ-জীবনের ভিত্তি কিরূপে নড়ে উঠছে, আর এই ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে আমরা কি ভাবে একটা অদ্ভুত জীবনচেতনা নিয়ে বেঁচে আছি, তীক্ষ্ণ মননশীলতার সঙ্গে তার শিল্পরূপ দিয়েছেন মান তাঁর *Magic Mountain*-এ। স্বীয় যুগের জীবন ও চিন্তাধারার সম্পূর্ণ রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন মান তাঁর এ মননশীল উপন্যাসখানিতে। রসসৃষ্টির সঙ্গে মননশীলতা সংযোগ করে উপন্যাস রচনায় একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন টমাস মান—সেজন্যে বিশ্বসাহিত্যে এই উপন্যাসখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস বলে পরিগণিত হবে সন্দেহ নেই।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও যুগান্তরকারী উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। এ উপন্যাস-খানিতে বঙ্কিমের পরিণত প্রতিভার ছাপ নেই—এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য, কিন্তু এ অপরিণত শিল্প-সৃষ্টি সে যুগে বাংলা সাহিত্যের বর্ণহীন আকাশে রোমান্টিক কল্পনার রঙ্ ছড়িয়ে লেখক ও পাঠকের সামনে যে একটি নূতন ও অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য-জগতের সন্ধান দিয়েছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় আছে কি? আজ উপন্যাস শিল্প রচনার একটা উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়ে সে ঊষর যুগে রোমান্টিক কল্পনায় ভরপুর দুর্গেশনন্দিনী-আবির্ভাবের গূঢ় অর্থব্যঞ্জনাকে হয়ত আমরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না। কিন্তু নবসৃষ্টির ক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনীর প্রবল রোমান্টিক ভাবাবেগ সে যুগের শিল্পীমনের সামনে যে একটা অ-দৃষ্ট ও অননুভূত কল্পলোকের সন্ধান দিয়েছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রাণহীন বাংলা কথা-সাহিত্যকে সর্বপ্রথম নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করেছে মানুষের হৃদয়রহস্যে-ঘেরা কাহিনী দুর্গেশনন্দিনী, আর সমসাময়িক কথাকারদের সামনে আধুনিক য়ুরোপীয় টেকনিকে উপন্যাস রচনার দৃষ্টান্তও দেখিয়েছিল বঙ্কিমের এ প্রথম উপন্যাসখানি—এ হিসেবে দুর্গেশনন্দিনী অবশ্যই একখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এ উপন্যাসখানির গুরুত্ব বিশ্লেষণে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন: "দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্ব চালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ সামাজিক (কৃষ্ণকান্তের উইল), অর্ধ-ঐতিহাসিক ও সমাজ-চিন্তাশ্রিত রোমান্টিক (চন্দ্রশেখর) এবং ঐতিহাসিক (রাজসিংহ) উপন্যাসকেও মোটামুটিভাবে যুগান্তরকারী উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে। কারণ এ উপন্যাসগুলিও তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী লেখকদের উপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তাঁর গভীর দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'কে নিঃসন্দেহে একখানি 'যুগান্তরকারী' উপন্যাস বলতে কোন বাধা নেই। শিল্প রচনার অপূর্ণতা সত্ত্বেও এ উপন্যাসখানি শুধু তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগের উপন্যাস-শিল্পীর ওপরে যে একটা অমোঘ প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়, এ উপন্যাসখানির সুমহান ভাবপ্রেরণা অনির্বাণ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দীপ

জ্বালিয়ে একটি আত্মবিস্মৃত পরাধীন জাতিকে যুগে যুগে বন্ধনমুক্তির স্বপ্নে উন্মত্ত করেছে। একটি সমগ্র দেশ ও জাতির উপর একখানি উপন্যাসের এত সর্বব্যাপী প্রভাব জগতের উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। এ উপন্যাসখানির মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য এবং জাতীয় জীবনের উপর অসামান্য প্রভাবের কথা চিন্তা করে সুসাহিত্যিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "পৃথিবীর যে কয়েকখানি যুগান্তরকারী গ্রন্থ আছে, 'আনন্দমঠ' তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে।"

রোমান্স-প্লাবিত বাংলা উপন্যাসের যুগে সাধারণ নিম্নবিত্ত পল্লীবাসী বাঙালীর কঠিন জীবন-সমস্যাকে কেন্দ্র করে একান্তভাবে বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনায় বিশিষ্টতা অর্জন করেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস রচনা করে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এ উপন্যাসখানিতে 'যুগান্তরকারী উপন্যাসের' সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, কিন্তু বঙ্কিমের উচ্চশ্রেণীর শিল্পকৌশল কিংবা জীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার অসামান্য শক্তি তারকনাথের আয়ত্তে না থাকায় এ উপন্যাসখানি সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখকদের উপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশের পূর্ব পযন্ত সে যুগের প্রায় সমস্ত ঔপন্যাসিক অনুবর্তন করেছেন বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথে। এমনকি উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-চেতনাও ছিল বঙ্কিমের রোমান্টিক দৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন।

বঙ্কিমের পরে দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাংলা উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ একাধিক যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি'র আবির্ভাব যেমন বিংশ শতাব্দীতে (১৯০৩ খ্রীঃ অঃ), তেমনই এ উপন্যাসখানির প্রাণকেন্দ্রে লেগেছে এ যুগের হাওয়া। নগরকেন্দ্রিক উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী সমাজ রয়েছে এ উপন্যাসের পটভূমিকায়, আর প্রচলিত সুনীতি-দুর্নীতির সাধারণ মাপকাঠি পরিত্যাগ করে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অকম্পিত বাস্তবচেতনা নরনারীর—বিশেস করে বিধবা হিন্দু-নারীর—সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে যে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে—তা নিঃসন্দেহে আধুনিকতার পরিচয়বাহী। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে না হোক, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ-ধর্মিতার পথ ধরে বাস্তববাদী উপন্যাস রচনায় সার্থকতার পথ খুঁজেছেন এ যুগের বহু ঔপন্যাসিক (এমনকি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও এ মন্তব্যের ব্যতিক্রম নন)। অধ্যাপক শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসখানিকে যখন 'উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক' বলে আখ্যায়িত করেন—তখন এ মন্তব্য অত্যুক্তি বলে মনে হয় না।

উপন্যাসের টেক্‌নিক বিচারে নিখুঁত উপন্যাস বলে বিবেচিত না হলেও রোমান্টিক প্রেমের আদর্শ স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'ও এ যুগের বাংলা উপন্যাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছে (১৯২৯)। 'শেষের কবিতা'র আবেগময় তির্যকভঙ্গি অননুকরণীয়, তাই আধুনিক ঔপন্যাসিকের উপর এ ভঙ্গির প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য হলেও উপন্যাস রচনায় তিনি যে অনুভবযোগ্য মুক্ত-প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে স্বপ্ন অনুপ্রাণিত করেছে এ যুগের বহু শিল্পীচিত্তকে ভাবাতিশায়ী বহু সার্থক ও অসার্থক উপন্যাস রচনায়।

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও বাংলা সাহিত্যে একাধিক যুগান্তরকারী উপন্যাসের স্রষ্টা। শরৎচন্দ্রের এ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', এবং 'শ্রীকান্ত' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রচলিত সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যাকে আমরা 'চরিত্রহীন' বলি, মনুষ্যত্ব বিচারে সে বাস্তবিক চরিত্রহীন কিনা—এ মৌল প্রশ্নের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে'। 'গৃহদাহে' সংস্কার ও আবেগের দ্বন্দ্বে নারী-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে দারুণ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে। সম্পূর্ণ নূতন টেক্‌নিকে লেখা ঔপন্যাসিকের 'জীবন দর্শনে'র পরিচয়বাহী চার খণ্ডে সমাপ্ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস। এ তিনখানি উপন্যাসেই জীবনের প্রতি লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে শুধু যে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তা নয়,—সমকালীন বহু ঔপন্যাসিককে অনুপ্রাণিত করেছে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য নির্ণায়ক উপন্যাস রচনায়। শুধু সমসাময়িক উপন্যাস শিল্পীকে নয়, সমকালীন যুগ-চিত্তকে অভিনব চিন্তার আঘাতে আন্দোলিত করেছে শরৎচন্দ্রের উক্ত তিনটি উপন্যাসের মত খুব কম বাংলা উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রোত্তর বহু উপন্যাস বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, চিন্তাধারার বহুমুখিতায় টেকনিকের ঔজ্জ্বল্যে ও রসনিবিড়তায় সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ পর্যন্ত যে বিচারে আমরা কোন কোন উপন্যাসকে 'যুগান্তরকারী' বলে অভিহিত করেছি সে পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের কোন্ উপন্যাসকে 'যুগান্তরকারী' বলা চলে খুব সতর্কতার সঙ্গে সে সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সতর্কতা এ জন্য যে

সাম্প্রতিক কোন উপন্যাস সমকালীন লেখকদের চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীর উপর প্রভাব বিস্তার করছে কিনা, অথবা পাঠকচিত্তকে একটা বিশিষ্ট আদর্শাভিমুখী করে তুলছে কিনা—তা হয়ত আমরা কালের সান্নিধ্যের জন্যে খুব ভাল করে বুঝে উঠতে পারি না। এমনও হতে পারে যে ভাবকেন্দ্রে অগ্রগামী চিন্তা অনুস্যূত থাকায় কোন কোন উপন্যাসের আবেদন তৎক্ষণাৎ সমসাময়িক লেখকের উপর প্রভাব বিস্তার না করলেও অদূর ভবিষ্যতে সে অভিনব ভাবধারার প্রভাব পরবর্তী লেখকদের উপর হয়ত অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এ রকম একখানা নিঃসঙ্গ অথচ যুগান্তরকারী উপন্যাসের পরিচয় বহন করে চিন্তাশীল লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য'। বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক চিন্তা ও ভাবাতিশায়ী হৃদয়ানুভূতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মননের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সুবৃহৎ উপন্যাসখানি (লেখক যাকে এপিক উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন) হয়ত বা সমকালীন উপন্যাসের উপর একটা দ্রষ্টব্য প্রভাব বিস্তার করে নি। কিন্তু এ কথা বোধ হয় খুবই অনুমান করা চলে যে, সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রবল সংঘাতে তরল ভাবধর্মী হৃদয় চর্চামূলক উপন্যাস রচনার স্রোত যখন মন্দীভূত হয়ে আসবে, তখন অনাগত-কালের উপন্যাস-শিল্পী মানুষের সর্বপ্রকার মননের সামগ্রীকেও উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তুলবে। বস্তুতঃপক্ষে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক চিন্তার পটভূমিকায় না হোক, আমাদের দেশের বাস্তুহারা সমস্যা, শ্রমিক ও কৃষক সমস্যা, শিক্ষক সমস্যা, শ্রেণী সংঘাত প্রভৃতি মননশীল বহু বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে শুরু হয়ে গেছে তাতো আমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের চিন্তা ও মনন যেরূপ সদাজাগ্রত, তাতে হৃদয়-চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদচারণা না করে তিনি যদি মননশীল উপন্যাস রচনায় একাগ্রচিত্ত হতেন—তা হলে তাঁর শক্তিমান লেখনীতে যে একাধিক যুগান্তরকারী উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তা অনুমান করা অহেতুক নয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শুভা' উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে ১৯৩৬ সনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশের কাল পর্যন্ত এ ষোল বৎসর বহু শক্তিমান লেখকের শিল্প-তুলিকার স্পর্শে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটা

প্রাচুর্যের জোয়ার এসেছিল সন্দেহ নেই। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পরিবর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় এ সময়ে উপন্যাস রচনা করে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বিশ্লেষণধর্মী ও রোমান্টিক লেখক, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মত কল্পনাবিলাসী কাব্যধর্মী উপন্যাস-লেখক, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রবোধ সান্যালের মত তীক্ষ্ণ জীবন-সমালোচক কথাশিল্পী, এবং দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত কালচারবিলাসী ঔপন্যাসিক। কাহিনী রচনায় বৈচিত্র্য, বিশ্লেষণে নিপুণতা, সংলাপে উজ্জ্বল দীপ্তি এবং সমসাময়িক বিবর্তনশীল জীবনের পটভূমিকায় সজীব চরিত্রসৃষ্টি করে তাঁরা শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাসকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাবাদর্শের দিক দিয়ে বাংলা উপন্যাসে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হন নি বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

জীবন-দৃষ্টির স্বকীয়তা, কাহিনী নির্বাচনে অভিনব স্থানিক পরিবেশ, আর সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে এ যাবৎ নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসে অব্যবহৃত পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার ব্যাপক ব্যবহারে চমকপ্রদ উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সে যুগান্তর সৃষ্টি অনিবার্য ভাবে দেখা দিল। মাজাঘষা নাগরিক সভ্য সমাজের বাইরে আমাদের প্রাকৃত জীবনের মধ্যেও যে রসসৃষ্টির উপযোগী বিষয়বস্তুর অভাব নেই—সেদিকে আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রতিভাবান কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবল দুঃসাহসিকতার সঙ্গে। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব আমাদের pseudo-realistic ড্রয়িংরুম-কালচারবিলাসী ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করেছে প্রাকৃত জীবনের নানা অনাবিষ্কৃত দিকের প্রতি, আর এ বিস্তৃত জীবনবোধ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে এনে দিয়েছে সীমাহীন প্রাণপ্রাচুর্য। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলেও যে কোন সচেতন পাঠকের কাছে এ সত্য অগোচর নয় যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায় পর্যন্ত বহু ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত জীবন-চেতনার পথে অগ্রসর হয়ে উপন্যাস সৃষ্টিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

স্বতন্ত্র রূপ, রং, স্বাদ ও মেজাজে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমানুবন্ধী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) বাংলা উপন্যাস

জগতে সেদিন যুগান্তরের সন্ধান দিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমকালীন বা পরবর্তী ঔপন্যাসিকের ওপর বিভূতিভূষণের আত্যন্তিক অনুভূতি-প্রধান সৃষ্টিচেতনা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাই যুগান্তরকারী উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হলেও বিভূতিভূষণের উপন্যাস দুখানি বিস্মিত পাঠকের সামনে আজও নিঃসঙ্গ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমোত্তর উপন্যাস-সাহিত্য ক্রমশঃ আত্যন্তিক রোমান্টিক ভাবালুতা ও কল্পনাবিলাস থেকে মুক্ত হবার সাধনা করেছে, আর নবজাগ্রত মানবিক সমবেদনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনবোধকে। তারাশঙ্করের সহানুভূতি আরও বিস্তৃত হয়েছে মাটি-ঘেঁষা পল্লীকেন্দ্রিক গণজীবনের অভ্যন্তরে। এত সচেতনভাবে গণজীবনের মর্মলোকে প্রবেশ করে মননশীলতার সঙ্গে সে সদা-আন্দোলিত বিবর্তনশীল জীবনের সামগ্রিক চিত্র তাঁর পূর্বে খুব কম ঔপন্যাসিকই অঙ্কিত করেছেন বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। সে হিসেবে তারাশঙ্কর তাঁর ক্রমানুবন্ধী উপন্যাস 'গণদেবতা' (১৯৪২) এবং 'পঞ্চগ্রামে' (১৯৪৪) পল্লীপ্রধান বাংলাদেশের ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-কুটিল, আনন্দ-বেদনা-রোমাঞ্চিত জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করে সমসাময়িক এবং পরবর্তী উপন্যাস-শিল্পীদের সামনে বিরাট সম্ভাবনাময় একটা নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। আজ আমরা যে প্রেমানুভূতি-গৌণ, বিশ্লেষণধর্মী ও সমস্যা-প্রধান গণজীবন-কেন্দ্রিক বহু সার্থক ও অসার্থক উপন্যাস রচনা-প্রচেষ্টা নিত্য নিয়ত দেখতে পাচ্ছি—সে উদার প্রগতিশীল ভাবধারার প্রথম জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে তারাশঙ্করের যুগান্তরকারী উপন্যাস 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে'। সমসাময়িক নিত্য পরিবর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাসঙ্কটে আমাদের গণজীবন আজ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। তাই সে চঞ্চল জীবনকেন্দ্রিক গণচেতনামূলক উপন্যাসে রসসৃষ্টি হয়ত নিবিড়তা লাভ করতে পারছে না। কিন্তু সে ঝঞ্ঝাহত গণজীবন যদি কখনও স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে, আর ভবিষ্যৎ কোন মহত্তর শিল্পীর প্রতিভা স্পর্শে সে জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস যদি শ্রেষ্ঠ শিল্প-পরিণতি লাভ করে—তখন তারাশঙ্করের উক্ত যুগান্তরকারী উপন্যাসের কথা ইতিহাস নিশ্চয়ই বিস্মৃত হবে না।

সমকালীন যে সমস্ত ঔপন্যাসিক তাঁদের বিস্তৃত জীবনবোধ, নিত্য নূতন চিন্তা ও সর্বাধুনিক শিল্প-চেতনার সাহায্যে বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিচিত্রধর্মী আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তাঁদের প্রচেষ্টা উপন্যাস-পাঠক ও সাহিত্য-সমালোচকের অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি কতটা যুগান্তরকারী উপন্যাসের পরিচয়বাহী তা বলা শক্ত। বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎকালের লেখকের ওপর তাঁদের রচনার প্রভাব যখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে—তখন তাঁদের সৃষ্টিকে 'যুগান্তরকারী' উপন্যাস বলতে আর দ্বিধা থাকবে না। তবে চিন্তা ও ভাবধারার অনন্যতায় এবং রচনাঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই যুগান্তরকারী উপন্যাস সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবি রাখেন—বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক চৌধুরী। জানি—বর্তমান যুগান্তরকারী উপন্যাস সৃষ্টিশক্তির অধিকারীদের সম্পর্কে মতান্তরের যথেষ্ট অবকাশ আছে, কিন্তু আমার এ মত নেহাৎ ব্যক্তিগত। চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ সুধীসমাজের বিচার-বিবেচনা এবং সম্ভাব্য নূতন মতের সঙ্গে পরিচিত হবার ভরসাতেই আমার এ ব্যক্তিগত মতের অবতারণা।

৭

বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা

বর্তমান জটিল যুগের তুলনায় বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে মানুষের জীবন-সমস্যা এত উৎকটভাবে দেখা দেয় নি। সেজন্য মনোহারী কাহিনী রচনা করে পাঠকের অন্তরে আনন্দ বা বেদনাবোধের সঞ্চার করতে পারলেই সে যুগে উপন্যাস রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হত। স্রষ্টার বেদনাবোধ পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে কিনা—তার ভিত্তিতে সৃষ্টির মূল্যায়ন আজও কথাসাহিত্য-বিচারে সমালোচকের মাপকাঠি বলে অবশ্য-স্বীকৃত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে প্রতিবেশের প্রভাবে মানুষের মন তীব্রভাবে সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছে। সেজন্য উপন্যাসে লেখকের সমাজবোধ কতখানি আত্মপ্রকাশ করেছে সে পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক আজ সৃষ্টির মূল্যমান নির্ণয় করতে বসেছেন। শুধু সমালোচকের কেন, সাম্প্রতিক কালে জীবন-পরিবেশের প্রভাবে পাঠকের মনও বিশ্লেষণমুখী ও প্রবলভাবে যুগ-সচেতন হয়ে উঠেছে। কল্পনার জাল দিয়ে তৈরী নিছক রোমান্টিক কাহিনী পড়ে আজ শিক্ষিত পাঠকের তৃপ্তি হয় না। সমাজের বাস্তব সমস্যার ছায়াপাতে কাহিনী যদি জীবনধর্মী হয়ে না ওঠে—তা হলে সে উপন্যাস চর্যাসম্পন্ন পাঠকের কাছে আজ রূপকথা বলেই মনে হয়। পাশ্চাত্য দেশে উপন্যাস তো আজ সব রকমের সামাজিক সমস্যা তথা বিশ্বমানবের জীবন-সমস্যার রূপায়ণে ফেঁপে-ফুলে 'hold-all'-এর আকার ধারণ করেছে। সুখের বিষয়, আমাদের সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিকও আজ সমাজের বহুমুখী সমস্যাকে উপন্যাসের বৃহত্তর পরিধিতে স্থান দিয়ে তাঁদের সৃষ্টিকে নতুন মূল্যে মূল্যবান করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলা উপন্যাসে সমাজ-চেতনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে দেখা যাবে বঙ্কিম-যুগের তুলনায় আজকের ঔপন্যাসিক সমাজের নানামুখী সমস্যা সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন।

উপন্যাস-শিল্পীর সমাজচেতনা আত্মপ্রকাশ করে কোন সময় সামাজিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে, কোন সময় অর্থনৈতিক জীবনকে অবলম্বন করে, আবার ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক চেতনাও ঔপন্যাসিকের সমাজ-চেতনার অঙ্গীভূত। উপন্যাসের বৃহৎ পরিধিতে ঔপন্যাসিকের এই বিভিন্নমুখী সমাজ-চেতনার বিকাশ

খুবই সম্ভব। তবে রাজনীতি একটা বৃহৎ দেশ বা সমগ্র জাতির সঙ্গে এবং সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব-রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে অনেক ঔপন্যাসিক সমাজ-চেতনার পরিচয় দেন প্রধানতঃ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে অবলম্বন করে। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-শিল্পীর সৃষ্টিতে অবশ্য সমাজ-চেতনার এই সর্বতোমুখী বিকাশ এক সঙ্গেও হতে পারে এবং বাস্তবিক পক্ষে হয়েও থাকে। পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণযোগ্য। সমাজ নিত্যবিবর্তনশীল। সেজন্য এক যুগের উপন্যাসশিল্পীর দৃষ্টিতে যে সমস্যা জীবন্ত, আর এক যুগের ঔপন্যাসিকের কাছে সে সমস্যা ইতিহাসের সামগ্রী বলে মনে হয়। সমসাময়িক যে সামাজিক সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভূতিশীল শিল্পীচিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল, আজকের পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় বর্তমান শিল্পীব কাছে তা সমস্যা বলেই মনে হয় না। বঙ্কিমের উপন্যাসে এ যুগের সমস্যার ছায়াপাত হয় নি বলে বঙ্কিমকে সমাজসচেতন ঔপন্যাসিকের শ্রেণী থেকে বাদও দেওয়া চলে না। তবে সামাজিক সমস্যারও শ্রেণীভেদ আছে। কোন কোন সামাজিক সমস্যা সাময়িক, আবার কোন কোন সমস্যা সকল যুগের। এখন বাংলা উপন্যাসে শিল্পীর সমাজচেতনা কোন্ বিশিষ্ট রূপ নিয়ে এবং কতটা রস-সমন্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই হবে আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম প্রধানতঃ রোমান্টিক ভাবপ্রবণ শিল্পী হলেও তাঁর সামাজিক উপন্যাসে (যেমন বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল) সমাজচেতনার পরিচয় প্রত্যক্ষ। শুধু সামাজিক উপন্যাসে কেন, তাঁর কোন কোন আত্যন্তিক রোমান্টিক উপন্যাসেও সমাজভাবনা অংশতঃ স্থান পেয়েছে। যেমন, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে। এ উপন্যাসের শ্যামাসুন্দরী-চরিত্রে দরদী শিল্পী বঙ্কিম সে যুগের কুলীন বধূর জীবনের ব্যর্থতার চিত্র অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমের সমাজ-চেতনা শিল্পরূপ লাভ করেছে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা—বিধবার পুনর্বিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে। শিল্পীর মত তিনি শুধু সমস্যার রসরূপ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, সমাজনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি তার সমাধানের ইঙ্গিতও খুঁজেছেন। আধুনিক

সমাজতাত্ত্বিক সমালোচকের মতে বঙ্কিমের সমাজচিন্তা রক্ষণশীল এবং প্রগতি-বিরোধী। প্রগতিবিরোধিতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে আধুনিক সমালোচক বলেন, "বঙ্কিমমানসে সমাজ-প্রগতির প্রবহমানতার চেতনা বিশেষ গভীর ছিল না। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের কতগুলি সত্যকে চরম ও পরম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বিশেষ কালে বিশেষ সামাজিক বিন্যাসে যে ইহাদের আবির্ভাব এবং যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই সত্যের রূপান্তর হয়, সেই চেতনা এবং স্বীকৃতি তাঁহার রচনায় অস্পষ্ট।" ১

বঙ্কিমের মনে সমাজ-প্রগতির প্রবহমানতার চেতনা গভীর ছিল না বলা মানে হল বঙ্কিমের মনস্বিতাকে অস্বীকার করা। এ সম্পর্কে বঙ্কিমের আধুনিক অপরাপর সমালোচক একমত হবেন কিনা তাতে খুবই সন্দেহ আছে। তবে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ-প্রভাবিত মানসিক অস্থিরতার যুগে তিনি প্রাচীন ভারতের সংযমপূত স্থির জীবনাদর্শকে যে জাতির সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন—তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রে কেন, প্রাক্-বঙ্কিম ভূদেবের চিন্তায় ও বঙ্কিম-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও এই সংযমপূত জীবনাদর্শের জয় ঘোষিত হয়েছে। তাহলে ভূদেব আর রবীন্দ্রনাথকেও কি প্রগতি-বিরোধী বলা সঙ্গত হবে? আসলে বঙ্কিমের সমাজ-চিন্তাকে যুগ-ভাবনা থেকে পৃথক করে দেখার ফলেই আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক সমালোচকের মনে বঙ্কিমের সমাজচেতনার প্রগতিশীলতা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। উদ্দাম গতিটাই সব সময় প্রগতির লক্ষণ নয়, স্থিতিশীল চিন্তাও অনেক সময় সমাজ-প্রগতির সূচনা করে। সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজচিন্তার মধ্যে বঙ্কিমের সমাজ-ভাবনা সে স্থির চিন্তারই প্রতীক।

বঙ্কিমের সমাজচেতনায় সমাজের অর্থনৈতিক দিকটা তেমন প্রতিফলিত হয় নি—এরূপ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। সমাজের উচ্চকোটির ভূস্বামীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাই তাঁর রোমান্টিক কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল সন্দেহ নেই। এ ছাড়া মানবচিত্তের মূল প্রবৃত্তিগুলোর দ্বন্দ্বে মানুষ কত অসহায়—এই চিরন্তন সত্যের রূপ দিতে গিয়ে বঙ্কিম সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি ততটা নজর দিতে পারেন নি বলেই মনে হয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক-জীবনের পরিণতির পর্বে বঙ্কিমের সমাজ-চেতনা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সন্ধানে ব্যাপ্তিলাভ করে—এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য। দেশের রাজা অশক্ত হলে, শাসন অযোগ্য হলে

১। অরবিন্দ পোদ্দার: বঙ্কিম-মানস॥ ভাবীকালের ইশারা॥—পৃঃ ১৬৫

অর্থনৈতিক জীবনে সমাজের জনসাধারণ কী চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয় তার বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। এ উপন্যাসে যে অনির্বাণ স্বদেশানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়—তাও ব্যাপক অর্থে বঙ্কিমের গভীরতম সমাজ-চেতনারই প্রকাশ।

বঙ্কিম-যুগের অসংখ্য উপন্যাসের মধ্যে সমাজ-সচেতনতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য়। তারকনাথের জীবনদৃষ্টি ছিল বাস্তবমুখী। সেজন্য বঙ্কিম-প্রদর্শিত রোমান্সের স্বপ্ন-স্বর্গলোক তাঁর পরিবারাশ্রিত ও সমাজকেন্দ্রিক কল্পনাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। অর্থনৈতিক কারণে ও স্ত্রীলোকের ঈর্ষা-হিংসা-কুটিলতায় তৎকালীন মধ্যবিত্ত পল্লীবাসী ভদ্র হিন্দুর যৌথজীবনে যে ভাঙন-প্রবৃত্তি অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, অকম্পিত হস্তে তার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেছেন তারকনাথ এই উপন্যাসে। সংবেদনশীল রসিকচিত্তের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে সমাজতাত্ত্বিকের মননশীলতা। সে যুগে উপন্যাসখানি তাই জনপ্রিয়তার উচ্চশীর্ষে আরোহণ করতে পেরেছিল। (তারকনাথের জীবিতাবস্থায় উপন্যাসখানির সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।) দুর্ভাগ্যক্রমে তারকনাথের শিল্প-প্রতিভায় বঙ্কিমেব গঠননৈপুণ্য ছিল না। সেজন্য সমসাময়িক পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি সত্ত্বেও এই একদা-বিখ্যাত উপন্যাসখানি সাধারণ পাঠকের কাছে আজ জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

এ যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের কল্পনা প্রধানতঃ বঙ্কিমের মত ইতিহাসের রাজপথে বিচরণ করলেও কোন কোন উপন্যাসে তিনি তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'সংসার' নামক উপন্যাস রচিত হয় বিধবা-বিবাহ সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তবে যুগ-চিন্তার প্রভাব রমেশচন্দ্র অতিক্রম করতে পারেন নি। সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। তাই এই উপন্যাসে তিনি বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করেছেন। শিল্পসৃষ্টি হিসেবেও উপন্যাসখানি উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যদিও (এ উপন্যাসে) বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি বর্তমান উপন্যাসে এ উদ্দেশ্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়া আর্টের সীমা লঙ্ঘন করে নাই।"[১] রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' নামক উপন্যাসেও

১ বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—পৃ. ৪৯

জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে। তবে এই উপন্যাসে লেখকের সচেতন সমাজসংস্কার প্রেরণা আর্টের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। পরবর্তী যুগের সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মতই রমেশচন্দ্রের লক্ষ্যস্থল ছিল বাংলার পল্লীসমাজ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি বা সমাজচেতনার গভীরতা রমেশচন্দ্রে অনুপস্থিত।

এ যুগের মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্ততঃ একখানি উপন্যাসে (স্নেহলতা, ১২৯৯) সমাজ চেতনা মুখ্যতঃ স্থানলাভ করেছে। তবে অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার অভাবে এই উপন্যাসে রসসৃষ্টি অপরিণত। বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য সম্পর্কে যুক্তিতর্কমূলক আলোচনাই এই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এ উপন্যাসখানি বাঙালী-সমাজের আধুনিক সমস্যার ছায়াপাতে উল্লেখযোগ্য রচনা।[১]

বঙ্কিম যুগ ও আধুনিক যুগের সংযোগস্থলে স্বতন্ত্র মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমের রোমান্টিক কল্পনার রাজপথেও বিচরণ করেছেন তিনি (দ্রষ্টব্য: বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, নৌকাডুবি), আবার আধুনিক সমস্যা-কণ্টকিত জীবনবোধের চেতনায়ও উদ্দীপ্ত হয়েছে তাঁর স্পর্শকাতর শিল্পি-মন। বঙ্কিমের আত্যন্তিক রোমান্টিক রসপুষ্ট কল্পনাকে অতিক্রম করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাব্দের চর্যাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে তিনি রচনা করেন তাঁর বিশ্লেষণধর্মী 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাস। গত শতাব্দীতে হিন্দু বিধবার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তিনি এ উপন্যাসে। কিন্তু 'লেখায় সস্তা দামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করবার দিকে ঝোঁক'[২] থাকায় তিনি এ উপন্যাসে বিধবার জীবন-সমস্যাকে যেভাবে পরিণতি দান করেছেন তাতে বাস্তব-ভীরুতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব বসুর মতে—"রসের দিক থেকে বা নীতিধর্মের দিক থেকে 'চোখের বালি'র উপসংহার অত্যন্ত দুর্বল।"[৩] রবীন্দ্রনাথের মহৎ শিল্পকীর্তি 'গোরা'ও সমসামন্নিক সমাজচেতনায় স্পন্দমান। বিশ্বমানবীয় উদার আদর্শের

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫
২ বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ—১৩৫২ সনের 'কবিতা'য় প্রকাশিত
৩ রবীন্দ্রনাথ: কথা-সাহিত্য—অবতরণিকা, পৃ. ৯

সংঘাতে বাঙালী তথা ভারতবাসীর সংকীর্ণ জাতীয় চেতনাকে প্রসারিত করাই ছিল এই মহৎ উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য। সমুন্নত মানবাদর্শের স্পর্শলোভাতুর ঔপন্যাসিকের সমাজচেতনা এ উপন্যাসে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য ও সুন্দর রসপরিণতি লাভ করেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক নীতিবোধ সমভাবে আত্মপ্রকাশ করলেও নতুন ভাবাদর্শের সংঘাতে নারীমনের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই প্রধানতঃ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসগুলি মুখ্যতঃ ব্যক্তিপ্রেম-নির্ভর। এ সমস্ত উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সমাজচেতনার পরিচয় নেই বললেও চলে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'চোখের বালি'ই তাঁর শেষ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। পরবর্তী উপন্যাসগুলির পাত্র-পাত্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ইহারা বাংলা ভাষা ব্যবহাব করে, অনেকে বাঙালী পোষাক পরিচ্ছদও ব্যবহার করে, বঙ্গসমাজ ও বঙ্গ-পরিবারের সঙ্গে ইহাদের একটা শিথিল সম্বন্ধ আছে, বাঙালী জাবনের মধুর রসধারা ইহারা আকণ্ঠ পান করিয়াছে—কিন্তু ইহাদের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও পরিবার-নিরপেক্ষ।"[১]

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে জলধর সেনের উপন্যাস বর্ণবিরল হলেও তার মধ্যে সমাজচেতনার স্বাক্ষর স্পষ্ট। সমাজের উপেক্ষিত জীবনচিত্রণে তাঁর সহানুভূতি বিস্তৃত হয়েছে। 'করিম শেখ' উপন্যাসে পল্লীর সাধারণ মুসলমান-সমাজের বিচিত্র জীবনালেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। "বিশুদাদা" সমাজেব উপেক্ষিত ভৃত্যের জীবনচিত্র। লেখকের সহমর্মিতা রবীন্দ্রনাথের থেকেও অগ্রসর। শুধুমাত্র উপেক্ষিত ও নির্যাতিত জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী রচনায় জলধর সেনের কৃতিত্ব নয়, উপন্যাসে লোকভাষা ব্যবহার করেও তিনি শরৎচন্দ্রের অভ্যাগমের পথকে সুগম করেছেন। কোন কোন উপন্যাসে জলধর সেন পতিতার প্রতি সমাজের নির্মম ব্যবহারের বিরুদ্ধে "ক্ষীণ অনুযোগ তুলিয়াছিলেন"। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে "এদিক দিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের পূর্বগামী।"[২] শিল্প-রচনায় জলধর সেনের গুরুতর ত্রুটি হল নীতিবোধের প্রাধান্য। তাই চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যাপক সামাজিক সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসগুলি রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে নি।

বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনার নতুন রূপ দেখা গেল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে।

১ বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ১৭৯
২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৫

হিন্দুসমাজের বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কার ও বৈষম্যবোধের ফলে মানবতার নিত্য লাঞ্ছনা দেখে তাঁর অনুভূতিশীল অন্তর পীড়িত হয়েছিল। এই অন্তর্দাহকে তিনি করুণ মাধুর্য দান করেছেন তাঁর কতকগুলি সামাজিক উপন্যাসে ও ছোটগল্পে। এই দিক দিয়ে তাঁর 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' ও 'পল্লীসমাজ' উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তীব্র সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করে সমাজের অবাঞ্ছিত নরনারীর পুনর্মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন তিনি, আবার কোথাও কোথাও তাঁর চেতনার আলোকে সমাজের অনেক অনাবিষ্কৃত দিকও আলোকিত হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা স্পষ্ট। বাস্তবায়নে ও সামাজিক সহানুভূতির বিস্তারে তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের পুরোধাস্থানীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অবশ্য-স্বীকার্য, হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্যের যুক্তিহীনতা এবং বহু যুগের সংস্কারান্ধ মানুষের নিষ্ঠুর পীড়নের চিত্র অঙ্কনে আত্যন্তিক মনঃসংযোগ করায় সমাজ-সমস্যার চিরন্তন রূপ—অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটা তিনি প্রায়ই এড়িয়ে গেছেন।

শরৎচন্দ্রের সামাজিক দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রগতিশীল। রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনার লক্ষ্য যেখানে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ, শরৎচন্দ্রের গভীরতর সমাজ-চেতনা সেখানে বিস্তৃতি লাভ করেছে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনসমস্যার মধ্যে। আজ ঔপন্যাসিকের সমাজচেতনা যখন গণধর্মী হয়ে উঠছে, তখন ভাবানুভূতি ও জীবনচেতনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল পদক্ষেপের যথার্থ তাৎপর্যের কথা হয়তো আমরা স্মরণ করি না। কিন্তু এই প্রগতিশীল সমাজচেতনা নিয়ে সে রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগে শরৎচন্দ্র যদি সবলে এগিয়ে না যেতেন—তা হলে উপন্যাসে আধুনিক প্রগতিশীল সমাজচেতনার আবির্ভাব যে আরও বিলম্বিত হত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ যুগের মহিলা ঔপন্যাসিক, নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর সমাজ-চেতনায় কোন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নেই। প্রাচীন হিন্দুসমাজের আদর্শের জয়গানে তাঁদের উপন্যাস মুখরিত। সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর উপন্যাসে সমাজ-চেতনা পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য। সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালী নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কিভাবে নতুন রূপ পাচ্ছে তারই বিবৃতি ও বিশ্লেষণ সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাস। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী না হলেও সমসাময়িক সমাজ-ক্রান্তির পরিচয় হিসেবে তাঁদের উপন্যাসের মূল্য স্বীকৃত হবে।

বর্তমান শতকের প্রথম তিন দশককে বলা চলে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগ। এ যুগে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বহু বিক্ষোভ বাংলার সমাজ-জীবনকে আন্দোলিত করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবল সংঘাতে অন্যান্য দেশের মত বাঙ্‌লার সমাজ-জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠেছে। কিন্তু এ যুগে বাংলা উপন্যাস-জগতে এমন কোন প্রদীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায় না—যার স্পর্শে সমাজ-চেতনার দিক দিয়ে বাংলা উপন্যাস রবীন্দ্র-শরৎ যুগকে অতিক্রম করে একটা নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছে। এ যুগের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সজনীকান্ত দাস, প্রফুল্লকুমার সরকার, মনোজ বসু, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী ও আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে (যেমন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি), কেউ কেউ রোমান্টিক কল্পনার সাহায্যে (যেমন—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়), আবার কেউ কেউ বঙ্কিম-জীবনাদর্শের প্রভাবে জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করে (যেমন—অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী) আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা কেউ রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে অধিক প্রগতিশীল সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সেজন্য নিপুণ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও আকর্ষণীয় কাহিনী রচনা করেও আজ তাঁরা ঔপন্যাসিক হিসেবে জনপ্রিয়তা হারাতে চলেছেন।

বিংশ শতকের উত্তর-তিরিশে এল বাংলা উপন্যাসে উৎকট আধুনিকতার উদ্দাম প্রবাহ। সমাজ-চেতনার যে বিভিন্ন ধারা বাংলা উপন্যাসে এতদিন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল, এ যুগের আত্মকেন্দ্রিক ভাবালুতায় তা গেল হারিয়ে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সংঘাতে এ যুগের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী-জীবনে সৃষ্টি হয়েছে একটা বিরাট শূন্যতা। এ শূন্যতাকে পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছেন এ যুগের একদল ঔপন্যাসিক যৌনকেন্দ্রিক জীবন-

বিশ্লেষণের সাহায্যে। আধুনিক বিদেশী উপন্যাসের টেকনিক অনুসরণে বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিকে লাগল নতুনের স্পর্শ। কিন্তু মানসিক নৈরাজ্যে বিচরণ করবার ফলে এঁদের অধিকাংশের রচনায় দেখা দিল না সমাজ-চেতনার নতুন কোন ইঙ্গিত।

এ আত্মকেন্দ্রিক জীবনোল্লাসের যুগকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অভিহিত করেছেন 'কল্লোল-যুগ' বলে। আসলে এ যুগের ঔপন্যাসিকেরা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'কে কেন্দ্র করে। অনাবিষ্কৃত জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের নামে ক্লেদ-রতির চর্চাতেই তাঁরা মেতে উঠেছিলেন। এ যুগে উপন্যাসের প্রাচুর্য বাড়ল পাঠকও বাড়ল, কিন্তু যুগোপযোগী সমাজ-চেতনার অভাবে এ যুগের অধিকাংশ উপন্যাস কোন স্থায়ী মূল্য অর্জন করতে পারল না।

এ যুগের কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় সমাজ-চেতনাব ক্ষীণ স্পন্দন যে একেবারে শোনা যায় না তা নয়। উপন্যাস রচনার এক স্তবে সমাজেব নিম্নতম শ্রেণীর জীবন-রহস্য অনুসন্ধান করে সমাজ-চেতনার একটি বিশিষ্ট রূপের সন্ধান দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার (একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী, পাখনা দ্রষ্টব্য)। এ যুগের অন্যতম কথা-শিল্পী প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসও প্রধানতঃ যৌনকেন্দ্রিক। তবে কোন কোন স্থানে সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের ভাঙনের চিত্র অঙ্কিত করে সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা-ধন্য লেখকের 'কলরব' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব বসু তরল কাব্যানুভূতি ও বিশ্লেষণ-প্রধান বহু উপন্যাস লিখলেও তাঁর উপন্যাস বাঙালী-সমাজের প্রাণস্পর্শহীন বলে বাঙালী পাঠককে আর আকর্ষণ করে না। রূপকধর্মী ও উৎকটভাবে যৌন আবেদনমূলক রচনার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক উপন্যাস-জগতে আবির্ভূত হলেও পরিণতিতে সমাজের নিম্নতম স্তরের জীবন-রহস্যের ওপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করে ও শ্রেণী-সচেতনতার পবিচয় দিয়ে বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত প্রসারিত করেছেন (দ্রষ্টব্য : পদ্মা নদার মাঝি, সহরতলী)। সমাজ-ভাবনার দিক দিয়ে শ্রেণী-চেতনা বাংলা উপন্যাসে বোধ হয় সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল। শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁর সমস্ত উপন্যাস রসোত্তীর্ণ না হলেও বিশ্লেষণের নিপুণতা ও চিন্তার স্বকীয়তায় বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন সে আদর্শ এখনও অনতিক্রান্ত।

বুদ্ধিপ্রধান ও হৃদয়প্রধান সমাজ-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্বল্পসংখ্যক উপন্যাসে। তবে উভয় শিল্পীই সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন বহু নিখুঁত ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে। এঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভায়। সে সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় 'উপনায়ন' উপন্যাসে। সমাজের অস্বাভাবিক প্রভাবের চাপে বহু শিশু-জীবন কী করে ব্যর্থ হয়ে যায় তার বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ এ উপন্যাস। দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মননধর্মী সমাজ-চেতনা উপন্যাস রচনায় বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। হলে আধুনিক উপন্যাস যে আরও মূল্য-সমৃদ্ধ হত তাতে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের বৃহৎ পরিধিতে বিস্তৃত সমাজ-চেতনার পরিচয় না দিলেও ছোটগল্পে আঞ্চলিক জীবনের সন্ধান দিয়ে সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনার নতুন ইঙ্গিত দিয়েছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মহৎ কথা-শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যতঃ প্রকৃতি-প্রেমিক হলেও সমাজ-চেতনার একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহুখ্যাত 'পথের পাঁচালি' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসে। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে পল্লীকেন্দ্রিক বাঙলার ভাষাহীন বেদনা কাব্য-সুন্দর দীপ্তি লাভ করেছে তাঁর উপন্যাস দুটিতে। নির্মম কৌলীন্যপ্রথার বিষময় প্রভাবে বাঙালী হিন্দু-নারী-জীবনের ব্যর্থতার চিত্রও অঙ্কিত করেছেন শিল্পী পরম সহানুভূতির সঙ্গে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে পটভূমিকার বিস্তৃতি নেই, ঘটনার চকিত-চমকও অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁর আপাত-বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর মধ্যে পল্লীকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গের বেদনা যেন কথা কয়ে উঠেছে। সে বেদনাবোধকে গভীরতর করেছে বাংলা দেশের নীরব প্রকৃতি। প্রকৃতির পটভূমিকায় বাঙালী জীবনের সুখদুঃখের বাণী আবিষ্কারে বিভূতিভূষণের অমর শিল্পসৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দেয় টমাস হার্ডির উপন্যাসকে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্লোল'-যুগে উপন্যাস রচনা শুরু করলেও আজও তিনি নিত্য-নতুন সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনায় সক্রিয়। শৈলজানন্দের মত তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমিও 'স্থানিক'। কিন্তু এই স্থানিক জীবন-চিত্রের সঙ্গে বিস্তৃত সমাজ-চেতনা ও শিল্প-দৃষ্টি যুক্ত হয়ে তাঁর উপন্যাসকে করে তুলেছে এ যুগে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। শুধুমাত্র শরৎচন্দ্র ও শৈলজানন্দের আবেগ দিয়ে নয়, সুগভীর

সহানুভূতি ও আধুনিক জীবন-বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি প্রবেশ করেছেন সচেতনভাবে বাঙালীর ক্রান্তি-কালীন সমাজ-জীবনের মর্মমূলে। ধনতান্ত্রিক জীবনের কাঠামো যে ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছে তারই নিপুণ আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন লেখক গভীর হৃদয়ানুভূতি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধের যে পরিবর্তন হচ্ছে তাও দৃষ্টি এড়ায় নি এ চিন্তাশীল শিল্পীর। শুধু পুরাতন জীবনধারা নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আদিমধর্মী মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিও যে নড়ে উঠছে,—অন্তহীন সহানুভূতি দিয়ে সে ক্রমবিলীয়মান জীবনের প্রতিও সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন এ সমাজ-সচেতন শিল্পী। ধনতন্ত্র-প্রভাবিত নতুন সমাজেও যে শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করছে তারও শিল্পরূপ দিয়েছেন জীবন-শিল্পী কোন কোন উপন্যাসে। মাটির বন্ধন ছেড়ে পল্লীসমাজের মানুষ যে আজ যান্ত্রিক সভ্যতার আকর্ষণে নগরবাসী হয়ে জীবনের জটিলতা বাড়িয়ে তুলছে, এ সমাজ-বিবর্তনের রূপও ধরা পড়েছে আধুনিক শিল্পীর নিপুণ তুলিতে। তারাশঙ্করের সমাজ-চেতনা শুধু হৃদয়ের আবেগে স্পন্দমান নয়, মননের দীপ্তিতেও উজ্জ্বল। এ আধুনিক শিল্পীর রচনায় বাংলা উপন্যাস শুধুমাত্র আনন্দ আহরণের স্তর অতিক্রম করে যে সচেতন সমাজ-চিন্তার অসমতল ক্ষেত্রে সবলে আত্মপ্রকাশ করেছে—তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বাঙালীর জাতীয়জীবনে তীব্রতম বিপ্লব-বিক্ষোভের যুগ হল বিংশ শতকের চার দশক। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে জাতীয় মুক্তিস্বপ্নে বিভোর বাঙালীও দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করতে এ যুগে এগিয়ে গেছে চরম সংগ্রামের পথে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জীবন পণ করে চরম আঘাত হানল তারা অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শাসন-ব্যবস্থার ওপর। একটা বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে জাতির মুক্তিস্বপ্ন স্পষ্ট রূপ পেল। এ গণ-বিদ্রোহকে প্রতিহত করতে বিদেশী শাসকও মরণ-কামড় না দিয়ে ছাড়ল না। অত্যাচারের স্টীম-রোলার চলল দিকে দিকে। তাতেও যখন মুক্তি-সাধনায় অধীর বাঙালী জীবন-পণ সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হল না তখন কূটবুদ্ধি বিদেশী শাসক বাঙালীকে মর্মঘাতী শাস্তি দিতে উদ্যত হল ক্ষুধার অন্ন কেড়ে—কৃত্রিম মন্বন্তরের সৃষ্টি করে। মানবতার মর্মান্তিক লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল বাঙলাদেশের

সর্বত্র। একদিকে চোরাকারবারীর তৎপরতায় অর্থসঞ্চয়ের বাহুল্য, আর একদিকে বুভুক্ষু মৃত্যু-পথযাত্রী নরনারীর অবিশ্রান্ত মিছিল এবং মৃত্যুযজ্ঞে তাদের নিত্যনিয়ত আহুতি। স্মরণীয় কালের মধ্যে মানবাত্মার এত বড় লাঞ্ছনা বিবেকবান বাঙালী আর প্রত্যক্ষ করে নি।

এ সমসাময়িক বিপর্যস্ত কাল ও ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিকায় সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনায় এগিয়ে এলেন গোপাল হালদার ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), 'উনপঞ্চাশী' (১৯৪৬) ও 'তেরশো পঞ্চাশ' (১৯৪৫) ১৯৪২-এর এপ্রিল-আগষ্ট থেকে ১৯৪৩-এর জানুয়ারী-এপ্রিল—এ এক বৎসরের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার পটভূমিকায রচিত। প্রধানতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা হলেও এ উপন্যাস-ত্রয়ীতে সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে বাঙালী সমাজের ভাঙনের চিত্র জীবন্ত রূপ পেয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তথ্যসন্নিবেশ-ক্ষমতার সঙ্গে বিন্যাস-কৌশলের নিপুণতার অভাবে এ উপন্যাস-ত্রয়ী রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। হলে এ সমস্ত উপন্যাস বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অমর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হত সন্দেহ নেই। মন্বন্তরের পটভূমিকায় তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এখানেও সমসাময়িক সমাজ-জীবনের অবক্ষয়ের ছবি সাংবাদিক-সুলভ নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে—যদিও শিল্পসৃষ্টি হিসেবে উপন্যাস খানি ব্যর্থ।

গোপাল হালদারের সমাজ-সচেতন মনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। এ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালী সমাজের রূপান্তরের চিত্র এঁকেছেন অপর তিনখানি উপন্যাসে—'ভাঙন' (১৯৪৭), 'স্রোতের দ্বীপ' (১৯৫০), 'উজান গঙ্গা' (১৯৫০)। পুরাতন জীবনাদর্শকে ভেঙে চুরে বর্তমান কাল চলেছে ভবিষ্যতের দিকে নতুন জীবন-চেতনার সন্ধানে। যে পুরাতন যুগে বিশ্বাসই ছিল জীবনের একমাত্র অবলম্বন—সে স্থানে এসেছে আজ প্রবল সংশয়। তার ফলে ধীর স্থির সনাতন জীবনবোধের জায়গায় জেগে উঠেছে নিত্যনতুন চাঞ্চল্য। বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে গোপাল হালদার দেখেছেন সে পরিবর্তমান জীবন-প্রবাহকে। সার্থক সমাজ-সচেতন উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে অনবদ্য, কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টির অভাবে এ উপন্যাসত্রয়ীও সাংবাদিকতায় পর্যবসিত।

সমসাময়িক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভে প্রভাবান্বিত না হয়েও এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনা করে সমাজ-চেতনার

প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছেন রামপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মজা নদীর কথা'য় (১৯৪১)। অপরিসীম সহানুভূতি নিয়ে লেখক দৃষ্টিপাত করেছেন আধুনিক জটিল সভ্যতার আঘাতে ধ্বংসোন্মুখ পল্লীর দিকে। শুধু পল্লী-জীবনের ধ্বংসোন্মুখতা নয়, আধুনিক জীবন-পরিবেশ ও চিন্তাধারা নাগরিক জীবনেও যে জটিলতা এনে দিয়েছে—তার নিপুণ স্তর-বিন্যাস করে প্রখর সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর 'মহানগরী' উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের কলাকৌশল আরও উচ্চাঙ্গের হলে এ যুগের সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হতেন তিনি—সন্দেহ নেই।

শিল্পসৃষ্টি হিসেবে উচ্চাঙ্গের না হলেও যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাত্রির তপস্যা'য় সমাজ-চেতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত। দেশের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে মানুষ কিভাবে মানবাদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে—সে বাস্তব আলেখ্য অঙ্কন করেছেন লেখক এ উপন্যাসে। মানুষের হৃদয়-সমস্যাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। সচেতন আদর্শ-চেতনার প্রভাবে প্রেমের উত্তরণ ঘটেছে এ উপন্যাসে। লেখকের শিল্পবোধ আরও গভীর হলে এ উপন্যাসখানি সমাজ-সচেতন উপন্যাস-তালিকায় আরও উল্লেখ্য স্থানের অধিকারী হত।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সামাজিক পটভূমিকায় তীক্ষ্ণ সংলাপের সাহায্যে রচিত জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে' উপন্যাস খানিতে তীব্র সমাজ-চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। সমাজের পুরাতন জীর্ণ মূল্যবোধের স্থানে যে নতুন মূল্যবোধ জেগে উঠছে এবং এ মূল্যবোধের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে যে সম্ভাবনাময় নতুন সমাজের ইঙ্গিত নিহিত আছে—তারই স্বপ্ন দেখেছেন জ্যোতির্ময় রায় এ কাহিনীতে। সন্তোষকুমার ঘোষের সমাজ-চেতনা প্রধানতঃ ছোটগল্পের মাধ্যমে আবর্তিত হলেও তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি' মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র হিসেবে পরম উপভোগ্য। বর্তমান সমাজের সর্বত্র যে অবক্ষয়ের লীলা চলছে তার ভিতর থেকেই উদ্ভূত হবে একটি নতুন দেশ, নতুন সমাজ—এ বলিষ্ঠ আশাবাদের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল বিজন ভট্টাচার্যের সমাজ-সচেতন 'জনপদ' (১৯৪৫) উপন্যাস।

এ যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রদীপ্ত সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন শক্তিমান ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'উপনিবেশ' গ্রন্থে (তিন খণ্ড—

১৯৪৪), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৯৪৫) ও 'স্বর্ণসীতায়' (১৯৪৬)। কোন কোন স্থলে সংহতি ও গভীরতার অভাব থাকলেও তাঁর এ সমাজ-বোধকে সতেজ করেছে বিস্তৃত ইতিহাস-চেতনা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এ সবল আশাবাদের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন জীর্ণ সভ্যতার অন্ধকার গুহা থেকে নতুন যুগের বাণী বহন করে আনবে বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী সংস্কারহীন আদিম প্রকৃতির মানুষ (দ্রষ্টব্য : উপনিবেশ)। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'তে। যে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রী সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর বণিক্-সভ্যতার হয়েছে জয়যাত্রা, সে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি কবেছে সমাজের মধ্যে নবতর বৈষম্য। এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠছে দেশব্যাপী গণশক্তি। চিন্তাশীল সমাজ-ভাবনায় নারায়ণবাবু তারাশঙ্করের সমাজবোধের পথ বেয়ে সবল প্রত্যয়ে আরও অগ্রসর হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত অপর কয়েকখানি উপন্যাসেও তাঁর প্রগতিশীল সমাজ-চিন্তার পরিচয় আরও দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সহানুভূতির বিস্তৃতি ও মননের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাপক সমাজচিন্তা বাংলা উপন্যাসের দিগন্তকে প্রসারিত করবে—এ আশা অহেতুক নয়।

এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল বাংলাদেশ তথা ভারত-বিভাগ। এই অচিন্ত্যনীয় অস্বাভাবিক দেশবিভাগ বাঙালীব অর্থনৈতিক জীবনে যে শুধু চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা নয়—মানবতাব চবম লাঞ্ছনা ঘটিয়ে বাঙালী-সংস্কৃতির মর্মমূলে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীর এ সংস্কৃতি-সঙ্কট ঔপন্যাসিকের ব্যাপক সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয় নি। খুব সম্ভব উদ্বাস্তু-জীবনের স্থিতিস্থাপকতার অভাব সমাজ-সচেতন্ ঔপন্যাসিকের সংহত চিন্তা ও শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। এ কারণে মহৎ উপন্যাসসৃষ্টির বিষয়বস্তু সামনে থাকা সত্ত্বেও খুব কম সমাজ-চেতন ঔপন্যাসিক এ জটিল সামাজিক চিন্তা নিয়ে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এ জটিল সমাজচিন্তা সমসাময়িক স্বল্পসংখ্যক বাংলা উপন্যাসে রূপলাভ করেছে দুই বিভিন্ন ধারায়। এক ধারা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু-জীবনকেন্দ্রিক। এ ধারার উল্লেখ্য উপন্যাস হল প্রবোধ সান্যালের 'হাসুবানু' এবং দীপক চৌধুরীর 'শঙ্খবিষ'। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে রসোত্তীর্ণ না হলেও সাম্প্রতিক বাঙালীর জাগ্রত জীবন-সমস্যা স্থিতিস্থাপকতা লাভ করবার পূর্বেই সে সমস্যা-কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করবার

প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছেন রামপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মজা নদীর কথা'য় (১৯৪১)। অপরিসীম সহানুভূতি নিয়ে লেখক দৃষ্টিপাত করেছেন আধুনিক জটিল সভ্যতার আঘাতে ধ্বংসোন্মুখ পল্লীর দিকে। শুধু পল্লী-জীবনের ধ্বংসোন্মুখতা নয়, আধুনিক জীবন-পরিবেশ ও চিন্তাধারা নাগরিক জীবনেও যে জটিলতা এনে দিয়েছে—তার নিপুণ স্তর-বিন্যাস করে প্রখর সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর 'মহানগরী' উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের কলাকৌশল আরও উচ্চাঙ্গের হলে এ যুগের সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হতেন তিনি—সন্দেহ নেই।

শিল্পসৃষ্টি হিসেবে উচ্চাঙ্গের না হলেও যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাত্রির তপস্যা'য় সমাজ-চেতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত। দেশের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে মানুষ কিভাবে মানবাদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে—সে বাস্তব আলেখ্য অঙ্কন করেছেন লেখক এ উপন্যাসে। মানুষেব হৃদয়-সমস্যাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। সচেতন আদর্শ-চেতনার প্রভাবে প্রেমের উত্তরণ ঘটেছে এ উপন্যাসে। লেখকের শিল্পবোধ আরও গভীর হলে এ উপন্যাসখানি সমাজ-সচেতন উপন্যাস-তালিকায় আরও উল্লেখ্য স্থানের অধিকারী হত।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সামাজিক পটভূমিকায় তীক্ষ্ণ সংলাপের সাহায্যে রচিত জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে' উপন্যাস খানিতে তীব্র সমাজ-চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। সমাজের পুরাতন জীর্ণ মূল্যবোধের স্থানে যে নতুন মূল্যবোধ জেগে উঠছে এবং এ মূল্যবোধের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে যে সম্ভাবনাময় নতুন সমাজের ইঙ্গিত নিহিত আছে—তারই স্বপ্ন দেখেছেন জ্যোতির্ময় রায় এ কাহিনীতে। সন্তোষকুমার ঘোষের সমাজ-চেতনা প্রধানতঃ ছোটগল্পের মাধ্যমে আবর্তিত হলেও তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি' মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র হিসেবে পরম উপভোগ্য। বর্তমান সমাজের সর্বত্র যে অবক্ষয়ের লীলা চলছে তার ভিতর থেকেই উদ্ভূত হবে একটি নতুন দেশ, নতুন সমাজ—এ বলিষ্ঠ আশাবাদের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল বিজন ভট্টাচার্যের সমাজ-সচেতন 'জনপদ' (১৯৪৫) উপন্যাস।

এ যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রদীপ্ত সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন শক্তিমান ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'উপনিবেশ' গ্রন্থে (তিন খণ্ড—

১৯৫৪), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৯৫৫) ও 'স্বর্ণসীতায়' (১৯৫৬)। কোন কোন স্থলে সংহতি ও গভীরতার অভাব থাকলেও তাঁর এ সমাজ-বোধকে সতেজ করেছে বিস্তৃত ইতিহাস-চেতনা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এ সবল আশাবাদের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন জীর্ণ সভ্যতার অন্ধকার গুহা থেকে নতুন যুগের বাণী বহন করে আনবে বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী সংস্কারহীন আদিম প্রকৃতির মানুষ (দ্রষ্টব্য : উপনিবেশ)। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'তে। যে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রী সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর বণিক্-সভ্যতার হয়েছে জয়যাত্রা, সে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছে সমাজের মধ্যে নবতর বৈষম্য। এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠছে দেশব্যাপী গণশক্তি। চিন্তাশীল সমাজ-ভাবনায় নারায়ণবাবু তারাশঙ্করের সমাজবোধের পথ বেয়ে সবল প্রত্যয়ে আরও অগ্রসর হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত অপর কয়েকখানি উপন্যাসেও তাঁর প্রগতিশীল সমাজ-চিন্তার পরিচয় আরও দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সহানুভূতির বিস্তৃতি ও মননের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাপক সমাজচিন্তা বাংলা উপন্যাসের দিগন্তকে প্রসারিত করবে—এ আশা অহেতুক নয়।

এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল বাংলাদেশ তথা ভারত-বিভাগ। এই অচিন্তনীয় অস্বাভাবিক দেশবিভাগ বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনে যে শুধু চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা নয়—মানবতার চরম লাঞ্ছনা ঘটিয়ে বাঙালী-সংস্কৃতির মর্মমূলে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীর এ সংস্কৃতি-সঙ্কট ঔপন্যাসিকের ব্যাপক সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয় নি। খুব সম্ভব উদ্বাস্তু-জীবনের স্থিতিস্থাপকতার অভাব সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিকের সংহত চিন্তা ও শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। এ কারণে মহৎ উপন্যাসসৃষ্টির বিষয়বস্তু সামনে থাকা সত্ত্বেও খুব কম সমাজ-চেতন ঔপন্যাসিক এ জটিল সামাজিক চিন্তা নিয়ে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এ জটিল সমাজচিন্তা সমসাময়িক স্বল্পসংখ্যক বাংলা উপন্যাসে রূপলাভ করেছে দুই বিভিন্ন ধারায়। এক ধারা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু-জীবনকেন্দ্রিক। এ ধারার উল্লেখ্য উপন্যাস হল প্রবোধ সান্যালের 'হাসুবানু' এবং দীপক চৌধুরীর 'শঙ্খবিষ'। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে রসোত্তীর্ণ না হলেও সাম্প্রতিক বাঙালীর জাগ্রত জীবন-সমস্যা স্থিতিস্থাপকতা লাভ করবার পূর্বেই সে সমস্যা-কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করবার

দুঃসাহস নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। এ শ্রেণীর দ্বিতীয় ধারার উপন্যাস পূর্ববঙ্গীয় পল্লী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আনন্দ-বেদনার চিত্রাঙ্কনে প্রাণবন্ত। এ ধরনের উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক জীবন-সমস্যাকে পশ্চাতে রেখে ঔপন্যাসিকের কল্পনা পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অমরেন্দ্র ঘোষ ও রমেশচন্দ্র সেন।

এবার সমকালীন বাংলা উপন্যাসে লেখকের সমাজ-চেতনা কত বিচিত্র পথে অত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে—তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

সমকালীন বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা রূপলাভ করেছে প্রধানতঃ দুটি ধারাকে অবলম্বন করে—একটি নাগরিক জীবনের ধারা, আর একটি পল্লীজীবনের ধারা।

স্বাধীনতা ও বিভাগোত্তর বহু ঘটনা ভিড় করে এসে পাঁচ-দশকের নাগরিক বাঙালী-জীবনকে আলোড়িত করেছে। দলে দলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় এসে আশ্রয় খুঁজেছে। ফলে কলকাতার স্বাভাবিক জীবন-প্রবাহ হয়েছে বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয় বাঙালীর চিন্তাধারাতেও এনে দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। শুধু গত শতাব্দীর নয়, এ শতাব্দীর প্রথম দিককার সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ অবস্থার চাপে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। যৌথ সামাজিক দায়িত্ববোধ ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে। এমন কি যৌথ পারিবারিক জীবনবোধও আজ ক্রমবিলীয়মান। সমাজ ও পরিবারের এ অবক্ষয়ের মধ্যে জেগে উঠছে নতুন এক সমাজ—বাঙলার ও ভারতের পুরাতন জীবনাদর্শের সঙ্গে যে সমাজ সম্পর্কহীন। ফলে জীবনের মূল্যবোধে এসেছে আজ আমূল পরিবর্তন। আজ যে নাগরিক সমাজে আমরা বাস করছি, সে সমাজের ভিত্তি অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—ধর্মনীতি ন্যায়বোধ ও হৃদয়াবেগের প্রশ্ন সে সমাজের কাছে গৌণ। শুধুমাত্র ব্যক্তিক অধিকার-বোধই আজ নাগরিক সমাজকে পরিচালিত করে জীবনের প্রায় প্রত্যেক কর্মে। ব্যক্তিগত অধিকারবোধকে আরও শক্তিমান করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী ভাবধারা। এ ব্যক্তিক অধিকার-বোধ ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে শ্রেণীগত স্বার্থ-রক্ষায়। ফলে যে শ্রেণী-সংগ্রাম একদিন ছিল সাম্যবাদীর স্বপ্ন, আজ তা নাগরিক বাঙালী জীবনে একটি বাস্তব সত্য।

সাম্যবাদী জনসাধারণের দাবি মেটাতে জাতীয় সরকার অং[illegible] সহানুভূতি নিয়মতান্ত্রিকতার পথে—স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় রাজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক[illegible] বহির্ভূত আইন দ্বারা জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে। কিন্তু এ সমস্ত প্রথা [illegible]ফনের হলেও পুঁজিবাদী ও মালিকশ্রেণী একজোট হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে নতুন এক সামন্ত সমাজ গড়ে তুলেছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকারবোধে বিশ্বাসী শ্রমিক ও পুঁজিহীন সম্প্রদায়ের আক্রোশ উঠছে পুঞ্জীভূত হয়ে। এদিকে স্বাধীনতার পরে সমাজে দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হলেও মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের প্রচলিত জীবিকার উপায়—চাকরি-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ভাবে যুগোপযোগী জীবিকা গ্রহণ করেন নি। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ আজ চরম অর্থকৃচ্ছ্রতার সম্মুখীন। নিজের ভালমন্দ অধিকার-অনধিকার বোঝবার মত সামর্থ্য আছে, অথচ প্রচলিত জীবন-সংস্কারেব মোহমুক্ত হয়ে পরিবর্তিত আধুনিক জীবনকে আঁকড়ে ধরবার প্রবল আগ্রহ নেই। এ সমস্ত কারণে উৎকেন্দ্রিকতার লক্ষণ উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে জীবনযুদ্ধে পরাজিত মধ্যবিত্ত সমাজে। এ পরাজয়েব গ্লানিকে ভোলবার জন্যে মধ্যবিত্ত সমাজ আজ মানসিক তৃপ্তি খোঁজবার প্রয়াস পাচ্ছে ক্ষণিক উত্তেজনার মধ্যে—সে উত্তেজনা যেখানেই পা'ক—কী খেলার মাঠে, কী সিনেমা-থিয়েটারে, কী পর্ণোগ্রাফীতে ভরা গল্প-উপন্যাসে অথবা হোটেলে-রেষ্টুরেণ্টে কিংবা তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

সাম্প্রতিক উপন্যাসের আর এক ধারা আত্মপ্রকাশ করেছে পল্লী-সমাজের নানা রূপ-বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে—যে সমাজকে এখনও সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করে নি আধুনিক সভ্য নাগরিক জীবনের অভিশাপ—যে সমাজ নিজের অসংস্কৃত জীবন-চেতনা নিয়ে এখনও বাস করে পূর্বযুগে। সহজাত আবেগবিহ্বলতা ও প্রবৃত্তির তাড়নাই এ সমাজ-জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তি। এ সমাজের মর্মশায়ী ভাবনা-বাসনা আকাঙ্ক্ষা-কামনা এখনও আমাদের নাগরিক সভ্য মানুষের কাছে অনেকাংশে অজ্ঞাত। সে রহস্যাচ্ছন্ন সমাজ-জীবনের মর্ম-উদ্ঘাটন করাই হল বর্তমান আর এক শ্রেণীর গল্প-ঔপন্যাসিকের সচেতন প্রয়াস।

প্রধানতঃ এ দু-ধারায় আবর্তিত হচ্ছে আজ বাংলা উপন্যাস। উভয় শ্রেণীর উপন্যাসেই তথ্যনিষ্ঠা প্রবল সন্দেহ নেই। তাই সমাজ-জীবনের চিত্রণে এসেছে ফোটোগ্রাফিক নিপুণতা। কিন্তু বাস্তবতার তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে সংহত

দুঃসাহস নি এবং সহজ রস-সংবেদনার অভাব অত্যন্ত প্রকট-ভাবে দেখা
পূর্ববঙ্গ ।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসে শিল্পাঞ্চলের নবজাগ্রত গণ-জীবনের ছবি অঙ্কিত এ করে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন সমরেশ বসু, বিমল কর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। (দ্রষ্টব্য : বি. টি. রোডের ধারে, শ্রীমতী কাফে—সমরেশ বসু, ত্রিপদী—বিমল কর)। গৌরীশঙ্করের বৃহদায়তন উপন্যাস 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'-ও শিল্পাঞ্চলের গণজীবন-কেন্দ্রিক। যে জীবন নিয়ে এ সমস্ত উপন্যাস রচিত সে জীবনের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিচয় অনেকটা ক্ষীণ। প্রধানতঃ এ কারণেই নাগরিক জীবনের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এ অনাবিষ্কৃত জীবন-প্রবাহ পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করে। কিন্তু সে জীবনের সঙ্গে লেখকের আন্তরিক পরিচয়ের অভাবের ফলে তাঁদের সৃষ্টি এখনও রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে না। সে পরিচয় যখন আরও ঘনিষ্ঠতর হবে, আর আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-জীবন-সমস্যা যখন স্পষ্ট অবয়বান্বিত হয়ে উঠবে—তখন বাংলা উপন্যাস যে নতুন সমাজ-চেতনার স্পর্শে নবতর মূল্যলাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক নানা আদর্শ-সংঘাতের ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী জীবনে যে ভাঙন-প্রবৃত্তি অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে জীবন-বোধ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'বার ঘর এক উঠান' উপন্যাসে। এখানেও চিন্তার সংহতি ও শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে নি। জীবনের অবতরণের চিত্র অঙ্কিত করতে হলে যে সুকঠোর সংযম-বোধের প্রয়োজন, সেই সংযমের অভাবে শিথিলবদ্ধ কাহিনীতে ক্লেদ-রতিই আত্মপ্রকাশ করেছে বেশী। শিল্প-বোধের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এ নবীন লেখকের হাতে সমাজ-সচেতন বাংলা উপন্যাস নবতর মূল্যলাভ করবে—এমন আশা অহেতুক নয়।

শিল্পদৃষ্টিতে সংহতি ও স্বচ্ছতার অভাব থাকলেও তীব্র-তীক্ষ্ণ মননশীল সমালোচনার সাহায্যে ব্যাপক সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন দীপক চৌধুরী। তাঁর শিল্প-প্রয়াসে আধুনিক বাংলা উপন্যাস নিছক কল্পনা-বিস্তারের স্তর অতিক্রম করে সবলে মননের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্প-উপন্যাসই মননশীল সমাজ-চেতনার পরিচয়বাহী।

শেষোক্ত শ্রেণীর সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সমরেশ বসু (দ্রষ্টব্য : গঙ্গা), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (তিতাস একটি নদীর নাম), প্রফুল্ল রায়

(নাগমতী) এবং আরও কেউ কেউ। এঁদের বিস্তৃত সামাজিক সহানুভূতি আবর্তিত হয়েছে প্রধানতঃ সমাজের নিম্নতম জীবন—এমন কি সমাজ-বহির্ভূত যাযাবব জীবনকে কেন্দ্র করে। আধুনিক সমাজ-জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের প্রয়াস এ শ্রেণীর উপন্যাসে দেখা যায় না। শুধুমাত্র বৈচিত্র্য সৃষ্টির দিকেই এঁদের ঝোঁক বেশী। এঁদের সমাজ-চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—পল্লী অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত ও উপেক্ষিত জীবন-রাজ্যে প্রবেশের ব্যাকুলতা। অনাস্বাদিত জীবনরস উপলব্ধির জন্য তাঁদের এ আত্যন্তিক ব্যগ্রতা যতদিন না কৌতূহলের সামা অতিক্রম করে তারাশঙ্করেব জীবন-ভাবনার মত মননের রাজ্যে প্রবেশ করবে—ততদিন তাঁদের সৃষ্টি জনপ্রিয় হলেও বিশেষ তাৎপযময় বলে বিবেচিত হবে না।

৮

গণ-সচেতন বাংলা সাহিত্য

সাহিত্য কখনও নিরালম্ব নয়। ধর্মচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা ও সমাজ-চেতনাকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করেছে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বর্তমান পৃথিবীর মানুষের মন আজ তীব্রভাবে সমাজ-সচেতন ও রাষ্ট্র-সচেতন হয়ে উঠেছে। সাহিত্যেও তার ছায়াপাত খুবই স্বাভাবিক। যে সাহিত্য শুধু কল্পনাময় ভাববিলাস বা প্রেমের eternal triangle নিয়ে রচিত—সে সাহিত্য আজ সমাজ-সচেতন মানুষের মনকে আর তৃপ্তি দিতে পারছে না। নবজাগ্রত জীবন-বোধের উদ্বোধন এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার রূপায়ণই বর্তমানে সাহিত্য-শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীর সাধনার ক্ষেত্র আজ বড় কঠিন। তাই সিদ্ধিও সকল ক্ষেত্রে আশানুরূপ হচ্ছে না, একথা বলাই বাহুল্য।

বাংলা সাহিত্যের সীমিত পরিধির মধ্যে বাঙালীর গণ-জীবন কতটা সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সে প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করব। অবশ্য গণ-জীবন বলতে বিশিষ্ট রাজনীতিক মতবাদীরা যে অর্থে 'গণ' (Proletariate) শব্দটি ব্যবহার করেন, ঠিক সে অর্থে আমরা শব্দটি ব্যবহার করছি না। কারণ ধনতান্ত্রিক বৈষম্যের ফলে পাশ্চাত্য দেশে 'বুর্জোয়া' ও 'প্রলিটারিয়েট' নামে যে দুটো স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী সমাজের দুই কোটিতে অবস্থিত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বদা যুধ্যমান, শিল্পায়নের (Industrialization) অসম্পূর্ণতার জন্য সে রকম কোন শ্রেণীবিভাগ বা শ্রেণীসংগ্রাম আমাদের দেশে এখনও উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। আমাদের দেশে গণ-সমাজ বলতে এখনও বিত্তহীন সম্প্রদায় বা কারখানার শ্রমিক-শ্রেণী মাত্রকে না বুঝিয়ে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোক বা দেশের জনসাধারণ মাত্রকেই বোঝায়। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে আদি ও মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলার গণ-জীবনের পরিচয় কতখানি ফুটে উঠেছে তার পরিচয় নেওয়া যাক।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নয় শত বর্ষ ব্যাপী এ যুগের পরিধি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বাংলার সমাজ-জীবনের উপর রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়েছে অনেকবার, রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে সমাজ-জীবনও আন্দোলিত হয়েছে বারে বারে। কিন্তু এ সমস্ত আঘাত-সংঘাত সমকালীন কবি-শিল্পীকে তার প্রগাঢ় ধর্মোপলব্ধি বা প্রেমানুভূতি থেকে কেন্দ্রচ্যুত করতে পারে নি কোনদিন। কবিদের উর্ধ্বচারী দৃষ্টি দেবতার বিপুল ঐশ্বর্যের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল এতকাল—মানুষের বিচিত্র বেদনার স্পর্শে সে সাহিত্য হয়ে উঠল না মানবিক-রসাশ্রয়ী। অবশ্য দু-একজন কবির কাব্যে সমাজের গণ-জীবনের খণ্ডচিত্র যে একেবারে পাওয়া যায় না এমন নয় ঃ যেমন মধ্যযুগের সমাজ-সচেতন কবি মুকুন্দরামের "ফুল্লরার বারমাস্যা"-বর্ণনার ছত্রে ছত্রে তৎকালীন বাংলার নিম্নস্তরের অধিবাসীদের দুঃখ-খিন্ন জীবনের চিত্র অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। কবি ঘনরাম কালু ডোমের জীবনের বৈচিত্র্যকেও তাঁর কাব্যে সাদরে স্থান দিয়েছেন। মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলোতেও বাংলা দেশের নিম্নশ্রেণীর জনগণের ছবি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে খেয়া নৌকার মাঝি দরিদ্র অথচ নির্লোভ। ঈশ্বরী পাটনীর চিত্র কবির সহৃদয় লেখনীর স্পর্শে অত্যন্ত সজীব। মধ্যযুগের শেষ দিগন্তে পূর্ব-বাঙলার পল্লীকবিরা গাথা-কবিতার মাধ্যমে গ্রামীণ গণ-জীবনের যে রস-মধুর চিত্র এঁকেছেন তার মাধুর্য বর্তমান সুসংস্কৃত কাব্যামোদীর মনকেও মুগ্ধ করে। কিন্তু মধ্যযুগের বিপুল-প্রসার কাব্যের তুলনায় এ শ্রেণীর চিত্রের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার স্থায়ী পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের অগ্রগতিরও মোড় ঘুরল। দেব-নির্ভর সাহিত্যের স্থান অধিকার করল মানব-নির্ভর সাহিত্য। কিন্তু সে সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনেই কেটে গেল গোটা অর্ধ শতাব্দী। তারপর সৃষ্টিমূলক মানবরসাশ্রয়ী সাহিত্য রচিত হল বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে। কিন্তু কোন মানবীয় ভাবকে রূপ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ? না, মানুষের অন্তরের নিগূঢ় তলদেশে প্রেম ও রূপমোহ নামক যে প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হয়ে তার সমস্ত জীবনকে একটা প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় আলোড়িত করে তোলে—তারই সার্থক রূপায়ণ বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাস। কয়েকটি উপন্যাসে বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িক সমাজের পটভূমিকা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ উপন্যাস রচনা করেছিলেন তিনি ইতিহাসের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে সুদূরপ্রসারী কল্পনা

মিশিয়ে। না হলে সমসাময়িক ইংরেজী-রোমান্সরস-পুষ্ট বাঙালী পাঠকের হৃদয় তিনি জয় করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

তারপর বাংলা সাহিত্যে অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। দেশের মধ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন তখন দানা বেঁধে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উপন্যাসে জাতীয় অভীপ্সার ছবি মূর্ত হয়ে উঠলেও আসলে তিনিও ছিলেন প্রধানতঃ রোমান্সধর্মী শিল্পী। মানবমনের বিশ্লেষণ-ধর্মের পরিচয় বহন করে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস। রবীন্দ্র-নাথের ছোটগল্প প্রকৃত গণ-চেতনাধর্মী না হলেও অনেকগুলি গল্প অতি-সাধারণ বাঙালী-জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ-বর্ণনায় রসোত্তীর্ণ। নাটক রচনায় প্রধানতঃ তিনি তত্ত্বাশ্রয়ী, আর কাব্যসৃষ্টিতে তিনি যে 'খাঁটী রোমান্টিক' তার স্বীকৃতি আছে কবির কাব্যে।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জাতি যে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল—কবি তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার উত্তর-যুগে মানব-দরদী কবি এ কথাও বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সমাজের "উচ্চ মঞ্চে" বসে তিনি সমাজের উপেক্ষিত জনগণের আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকে তাঁর কাব্যে রূপ দিতে পারেন নি। সর্বস্তরের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে যে কোন সাহিত্য-প্রচেষ্টা যে "শৌখীন মজদুরি"তে পর্যবসিত হয়—এ সত্যও তিনি বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য স্বীয় জীবন-গোধূলিতে কবি "ওরা কাজ করে" "ঘণ্টা বাজে দূরে" প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক কবিতায় সমাজের উপেক্ষিত গণ-জীবনের যে অনবদ্য চিত্র উদ্ঘাটিত করেছিলেন তার তুলনা বাংলা কাব্যে বিরল। এ কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়, কবি যদি নীরোগ দেহে তাঁর নবজাগ্রত সমাজ-চেতন মন নিয়ে আরও দীর্ঘজীবী হতেন—তা হলে তাঁর নিপুণ লেখনী-স্পর্শে গণ-জীবনের চিত্র বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিত।

শরৎচন্দ্রের যাযাবর-বৃত্তি তাঁকে বাঙলা ও ব্রহ্মদেশের গণ-জীবনের নিকট-সান্নিধ্যে এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু নরনারীর সূক্ষ্ম মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে রোমান্টিক কাহিনী রচনা তাঁর শিল্পি-মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বলে বাঙলার গণ-জীবনের সর্বাশ্রয়ী বেদনাবোধ তাঁর রচনাকে প্রকৃত গণ-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে নি। বাংলা দেশের তথাকথিত নিম্ন জাতীয় হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণের

হিন্দুদের পীড়নের দুঃসহ বেদনাই তাঁর অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। তাই তাঁর অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পে এ বেদনাকেই তিনি সার্থক বাণীরূপ দিয়েছিলেন। সমাজের আর্থিক অসঙ্গতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে তিনি প্রায় মধ্যযুগীয় শিল্পীর মতই উদাসীন। একমাত্র "মহেশ" গল্পের বেদনার্দ্র কাহিনীটি তিনি রচনা করেছিলেন সমস্ত সমাজের যা চিরন্তন সমস্যা—সে অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এ নিখুঁত নিটোল ক্ষুদ্র গল্পটিই শরৎচন্দ্রকে আধুনিক গণ-সাহিত্য-শিল্পীর সমগোত্রীয় করে তুলেছে। শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙ্লার গণ-জীবনের আনন্দ-বেদনার যে খণ্ডিত বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, প্রেমের ত্রিকোণ রচনার দিকে মাত্রাতিরিক্ত মনঃসংযোগ না করে যদি তিনি সমস্যা-জর্জর বাঙ্লার গণ-জীবন অঙ্কন-প্রচেষ্টায় নিপুণ লেখনী চালনা করতেন—তা হলে আধুনিকোত্তম ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর দাবি অগ্রগণ্য হত সন্দেহ নেই।

'মাটির কাছাকাছি' যে কবির বাণী শোনবার জন্যে ভাবুক কবি রবীন্দ্রনাথ উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন, সে কবি-শিল্পীর আবির্ভাব হল অবশেষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে। এ অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে সংক্ষেপে বলা চলে, শিক্ষিত ও তরুণ হিন্দু-বাঙালী এ সময় যখন জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে বিচ্যুত হল—সমাজের বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের বেদনাব বাণী তখন শিল্পীর কাব্যে উপন্যাসে ও ছোটগল্পে ভাষা পেল। আধুনিক সাহিত্যের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে আমরা দেখি, এ যুগের কবি-শিল্পীরা সচেতন ভাবে নেমে এসেছেন অলস ভাবকল্পনার গজদন্ত মিনার থেকে বাস্তবের কঠোর ভিত্তি-ভূমিতে। এ সময়কার অনেক সৃষ্টিধর্মী রচনা তাই গণ-জীবনেব চেতনায় আবেগ-কম্পিত।

কাব্যের ক্ষেত্রে এ গণ-চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে দুটো স্বতন্ত্র ধারায়: এক শ্রেণীর কবির গণ-চেতনা আবেগধর্মী, আর-এক শ্রেণীর মননধর্মী। আবেগধর্মী গণ-চেতনার আকাশে এ সময় ঝড়ের সংকেত নিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলাম। তাঁর প্রচণ্ড আবেগ-বন্যায় তিনি ভাসিয়ে নিলেন বাঙালী পাঠকের অন্তরকে সমাজের উপেক্ষিত ও বঞ্চিত গণ-জীবনের সান্নিধ্যে। অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির পরিচয় নজরুলের কাব্যে

স্পষ্ট, কিন্তু আড়ম্বরপ্রিয়তা ও প্রচারধর্মিতার জন্য তাঁর এ শ্রেণীর কাব্য সকল ক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ সময়কার কাব্যসৃষ্টিও ('প্রথমা', 'সম্রাট' প্রভৃতি) আবেগধর্মী গণ-চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গণ-জীবনের বাস্তব সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচয়ের গভীরতা নেই, অথচ উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের তরঙ্গাভিঘাতে তিনি পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন একটি নতুন জগতে— যে জগতের অধিবাসী হল কামার, ছুতোর, নাবিক, কুমোর এবং পৃথিবীর অগণিত শ্রমিক জনসাধারণ—যাদের বঞ্চিত জীবনের শ্রমে গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতার বুনিয়াদ। সমসাময়িক কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্তও জীবনের এই অপচয়ের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর ভাবালুতাপূর্ণ রোমান্টিক নৈরাশ্যবাদের মধ্য দিয়ে ('অমাবস্যা' দ্রষ্টব্য)।

মনন-প্রধান গণ-সচেতন কবিতা রচনা করে আধুনিক কাব্য জগতে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেন অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ কবি। তাঁদের কাব্য রিক্ত রুক্ষ বিবর্ণ গণ-জীবনের প্রদীপ্ত স্বাক্ষর। তীক্ষ্ণ স্যাটায়ার এবং তির্যক বাগ্‌ভঙ্গীর সাহায্যে এঁরা আক্রমণ করেছেন পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিদের এবং বর্তমান ধনতন্ত্রী সভ্যতাকে। এঁদের কারও কাব্যে নগর-জীবনের অবক্ষয়ের ছবি (সমর সেনের কাব্যে), আবার কারও কারও কাব্য শ্রেণী-সংগ্রামের অবসানে একটি শ্রেণীহীন উজ্জ্বল জীবনের আশ্বাসে পূর্ণ (যেমন অমিয় চক্রবর্তীর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের)। যথেষ্ট মনন-শক্তির পরিচয় আছে এঁদের কাব্যে, কিন্তু ভঙ্গীকেই রচনায় প্রাধান্য দেওয়ায় তাঁদের কাব্যের আবেদন সর্বাত্মক হয় নি,—এ কথা অবশ্যস্বীকার্য।

জনগণের জীবন-চেতনাকে মননশীল কাব্যের মাধ্যমে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের। স্বল্পসংখ্যক যে কয়খানি কাব্য তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যেই তাঁর প্রতিভার দীপ্তি স্পষ্ট। অকালে তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হওয়ায় বাংলা গণ-সচেতন কাব্য-সাহিত্য যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রবীণদের মধ্যে জনগণের বাস্তব জীবনবোধের রূপায়ণে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য রসোত্তীর্ণ। যে প্রচারধর্মিতার ফলে বিষয়বস্তুর গভীরতা সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা

অনেক স্থলে রসবিচারে মূল্যহীন—সে প্রচারধর্মিতার অনুপস্থিতিতে এবং অন্তরঙ্গ ভঙ্গীর গুণে যতীন্দ্রনাথের কবিতা সুন্দর বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছে।

নাটক-রচনার ক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে প্রথম গণ-সচেতন নাট্য-প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে। ধনতন্ত্রীর নির্মম নিষ্ঠুরতা ও আদিম বর্বরতার আঘাতে তৎকালীন পল্লীবাসী বাঙালীর অসহায়তার করুণ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে এ নাটকে। দীনবন্ধুর অনুকরণে সে যুগে আরও বহু নাট্যকার 'দর্পণ'-জাতীয় নাটক রচনা করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে গণ-জীবন কিরূপ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল তার স্বরূপ প্রদর্শন করেন এঁরা—যদিও এ শ্রেণীর আর কোন নাটকেই দীনবন্ধুর শক্তির পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রবৃত্তি প্রধানতঃ রোমান্টিকতার স্বপ্নাচ্ছন্ন পথে পরিক্রমণ করলেও তাঁর রূপকাশ্রয়ী কয়েকটি নাটকে গণ-সচেতন মনের পরিচয় স্পষ্ট। 'অচলায়তন' নাটকে জীর্ণ কুসংস্কারের দেওয়াল ভেঙেছেন 'অচলায়তনে'র গুরুদেব অন্ত্যজ শোনপাংশুদের সাহায্যে। 'মুক্তধারা'য় যন্ত্র-সভ্যতার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বিরুদ্ধে কুমার অভিজিতের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার মধ্যে কবির গণ-সচেতন মন সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'রক্তকরবী'তে ধনস্পর্ধী যন্ত্র-সভ্যতার নিষ্পেষণে সাধারণ মানুষের রিক্ত বিবর্ণ জীবনের রঙ্-ফলানো বর্ণনার মাধ্যমে যে জীবন-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা অভ্রান্তভাবে গণধর্মী। তত্ত্বাশ্রয়ী 'কালের যাত্রা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেন দ্রষ্টার মত ভবিষ্যৎ জগৎ-পরিচালনা ব্যাপারে শূদ্র বা শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তির জয় ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য গণ-সচেতন কোন নাটক রচিত না হলেও তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' 'ছেঁড়া তার,' সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' প্রভৃতি নাটক উল্লেখের দাবি করতে পারে। এ সম্পর্কে ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের নাট্য-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলার গণ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথা-বেদনার অভিব্যক্তি রস-রূপ পেয়েছে এ যুগের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে। এ ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কথা-শিল্পীর বিস্তৃত ও গভীর মানবতাবোধ বাংলা কথা-সাহিত্যকে একটি নতুন উষার স্বর্ণতোরণের সামনে উপস্থিত করেছে।

বাঙালী-সুলভ তরল ভাবালুতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে 'একপ্রকার রুক্ষ,

আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা'র (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) ক্ষেত্রে এ সময় আত্মপ্রকাশ করেন তরুণ কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র। কাব্য-জগতে যেমন, কথাসাহিত্য-জগতেও এ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল। মধ্যবিত্ত জীবনের অপচয়ের বাস্তব চিত্র অকম্পিত দৃষ্টিতে তিনি এঁকেছেন এবং পূর্বযুগের শিল্পীর মত মনুষ্যত্বের অবমাননাকে আদর্শায়িত করবার চেষ্টা করেননি তিনি কোথাও। প্রেমেন্দ্রের কল্পনা অনেকটা morbid (অপ্রকৃতিস্থ) এবং তাঁর অধিকাংশ গল্প নগরের পটভূমিকায় স্থাপিত হওয়ায় বৃহত্তর গণ-জীবনের স্পন্দন তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। তবে সুকঠোর বাস্তবের আঘাতে মানুষের ধূলি-ধূসরিত প্রেমের চিত্র এঁকে তিনি বাঙালী কথা-শিল্পীর চিত্তে বাস্তবানুভূতির যে প্রেরণা জাগিয়েছেন, সে প্রেরণা বহু শিল্পীকে গণ-জীবনের বেদনা-মধুর ছবি আঁকতে উদ্বোধিত করেছে সন্দেহ নেই।

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের উপন্যাস যদিও যৌনতত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আবর্তিত হয়েছে, তথাপি তাঁর কথা-সাহিত্য রচনার শেষ স্তরে গণ-জীবন-চেতনার আবেদন স্পষ্ট (দ্রষ্টব্য, 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' ও পল্লীসমাজের অতি সাধারণ জীবনকেন্দ্রিক অনেক ছোটগল্প)।

নিজের জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে গণ-জীবনকে যুক্ত করেছেন এ যুগে শৈলজানন্দ। কয়লাখনির কুলি-কামিনদের জীবন-বোধের চিত্র যে সাহিত্যের আসরে স্থান পেতে পারে, এ সত্য আবিষ্কার করে তিনি আমাদের নবজাগ্রত মানবতাবোধের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচন করলেন। সভ্যসমাজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত গণ-জীবনের একাংশের এ রসরূপ সাহিত্যে রূপান্তরিত দেখে তৎকালীন পাঠক-সমাজ চমৎকৃত হল। আরও চমৎকৃত হল তারা সভ্য নগরকেন্দ্র থেকে বহুদূরবর্তী এ 'অসভ্য', নগণ্য ও তুচ্ছ মানুষের আনন্দ-বেদনার বাণী তাদের নিজেদের কথায় ভাষা পেয়েছে দেখে। শৈলজানন্দের গণ-জীবনানুভূতি সার্বভৌম—এ কথা অবশ্য কোনমতে বলা চলে না। কিন্তু বাংলা কথা-সাহিত্য জগতে তিনি যে এক নতুন জীবন-চেতনার পথিকৃৎ, এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত।

আঞ্চলিক ভাষায় দেশের কোন বিশিষ্ট অঞ্চলের গণ-জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের উদ্ঘাটন এ সময় বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিল। এ দিকে প্রতিভাধর শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক কথ্যভাষার মাধ্যমে পদ্মা নদীর মাঝি ও জেলেদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা,

তাদের প্রেমানুভূতি, ঈর্ষা, হিংসা ও অভীপ্সার যে সুন্দর রস-রূপ তিনি দিলেন তা বাঙালী পাঠককে আর একটা নতুন জগতের সন্ধান দিল। বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত যে উপচীয়মান, অনুসন্ধানী বাঙালী পাঠক এ কথা বেশ বুঝতে পারল।

শহর থেকে বহু দূরবর্তী অনাবিষ্কৃত গণ-জীবনের পরিচয় দিয়েই শুধু মানিকবাবু ক্ষান্ত হন নি। ধনতন্ত্রী সভ্যসমাজের ধন অর্জনের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়েও ভেদবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক জনসাধারণ যে বঞ্চিত গ্লানিকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাদের জীবন-দ্বন্দ্ব, তাদের আশা, আশাভঙ্গ ও অভীপ্সার বাণীকে মূর্ত করে তুলেছেন তিনি। সমাজের ধনগত অসাম্যের ফলে যে শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছে—এ সত্যের আভাসও দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে (দ্রষ্টব্য 'শহরতলী')।

আঞ্চলিক গণ-জীবনকে কেন্দ্র করে কথা-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের স্থান একটু স্বতন্ত্র। তাঁর কুশলী লেখনীর স্পর্শে সমাজের অতি সাধারণ জীবনের বিচিত্র কাহিনী মামুলী রচনায় পর্যবসিত না হয়ে পরম আস্বাদ্য শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর ভাষার ভাবব্যঞ্জনাময় শক্তিই হল এ উৎকৃষ্ট শিল্প-রচনার সোনার কাঠি। শুধুমাত্র এ ব্যঞ্জনাময় ভাষা নয়, একটা বিস্তৃত ও গভীর জীবনচেতনাও শিল্পী তারাশঙ্করকে এ শ্রেণীর সাহিত্যজগতে একটি উল্লেখযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস এ উক্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর কবিয়াল নিতাইয়ের সৌন্দর্যপ্রেরণা, তার জীবনের কবি-যশাকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র নারীর সংস্পর্শে এসে তার মানসিক সংঘর্ষের রূপরেখা, যাযাবর কবিয়াল-সম্প্রদায়ের নিখুঁত বাস্তবচিত্র আমাদের কাছে এক অনাস্বাদিত জীবনরসের সন্ধান এনেছে। 'গণ-দেবতা'য় (১৯৪২) লেখক সচেতনভাবে গ্রামীণ জনসমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ঈর্ষা, হিংসা, দলাদলি প্রভৃতিকে সাহিত্যের রস-বস্তুতে রূপান্তরিত করেছেন। 'পঞ্চগ্রামে' (১৯৪৪) জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামের চাষীদের সচেতন বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা এবং স্বাধিকারবোধের চিত্র দৃঢ় রেখায় চিত্রিত হয়েছে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় চাষী গৃহস্থ কিভাবে মজুরে পরিণত হতে চলেছে—সে চিত্রও উদ্ঘাটিত করেছেন তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে। আঞ্চলিক ভাষায় পশ্চিম-বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের রসমধুর চিত্র 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৮)। কথ্য ও অপভ্রংশ ভাষায় লেখা এ উপন্যাসে গণ-জীবন-শিল্পী তারাশঙ্কর মাটির গন্ধে ভরা কাহার-জীবনের

সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রণয়-বিচ্ছেদের চিত্রকে একেবারে প্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'ও স্মরণযোগ্য উপন্যাস।

পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মত নরনারীর প্রেমানুভূতির বিশ্লেষণ তারাশঙ্করও করেছেন, কিন্তু সে বিশ্লেষণ তাঁর সমাজ-চিত্র বর্ণনার লক্ষ্যকে খণ্ডিত করে নি এ সমস্ত উপন্যাসে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে বাংলা দেশের পল্লীর জনসাধারণ যে একটি নবজাগ্রত জীবনচেতনায় জেগে ওঠবার উপক্রম করছে, স্থির দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর সে জীবন-স্বপ্নকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কোন কোন উপন্যাসে। সে জন্য সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করকে "গ্রাম্য জীবনের চারণ কবি" বলে অভিহিত করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে গণ-জীবনের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। পল্লী-পরিবেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে গ্রামের শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কদের জীবনও কিরূপে আন্দোলিত হয়—তার চিত্ররূপ হল 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)। এরূপ কৃত্রিমতা-বর্জিত মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের কাহিনী এ যুগের বাংলা কথা-সাহিত্যে আর নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' হোটেলের ঠাকুরের তুচ্ছ জীবন-কাহিনীও এ শ্রেণীর সাহিত্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এখানে একটা কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে গণ-মানসের স্বাধিকারবোধের চেতনার চাইতে অতি-সাধারণ বাঙালী-জীবনের ব্যথাকরুণ দিকটাই ফুটে উঠেছে খুব বেশী।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর আঘাতে জনগণের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও স্বাধিকারবোধের প্রেরণা আরও প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করল। সৌভাগ্যের বিষয়, এ সময়কার বাংলা কথা-সাহিত্যেও তার প্রতিধ্বনি উঠতে দেরি হল না। এ যুগের কয়েকজন শক্তিশালী কথাশিল্পী গণ-চেতনাকে কথা-সাহিত্যের মাধ্যমে শিল্পসৌন্দর্যে রসময় করে তুলেছেন। এর ফলে বাংলা কথা-সাহিত্য অতি দ্রুত গণাভিমুখী হয়ে উঠছে—এ কথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা চলে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, এ যুগের শক্তিমান কোন কোন কথাশিল্পীর রচনা একটা বিশিষ্ট রাজনীতিক মতবাদ—মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ধনতন্ত্রবাদীর সূক্ষ্ম কৌশলে ও নির্মম অত্যাচারে বিত্তহীন সর্বহারা সম্প্রদায় যে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে

অগ্রসর হচ্ছে—এ-ই হল প্রধানতঃ এঁদের রচনায় বিষয়বস্তু। অবশ্য মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও জনসাধারণের স্বাধিকারের চেতনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি-সচেতন সার্থক কাহিনী রচনাও যে এ যুগে না হয়েছে তা নয়। শক্তিমান কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' নামক গল্পটি এ ক্ষেত্রে অনন্য। এত ব্যঞ্জনাময়, নিখুঁত, নিটোল, রাজনৈতিক চেতনায় পরিপূর্ণ গল্প এ যুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই লেখকের 'তমসাবৃতা' গল্পে গণ-জীবনের রিক্ততা ও সহায়হীনতার যে করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে—তার তুলনাও এ যুগের সাহিত্যে বেশী দেখা যায় না। এ শক্তিমান শিল্পী পরবর্তী কালে তাঁর মনীষা ও শিল্প-প্রতিভাকে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়োজিত না করে কথা-শিল্প রচনার এ ধারা অনুসরণ করলে এ শ্রেণীর রচনা যে বিশেষ সমৃদ্ধ হত তাতে সন্দেহ নেই। এ যুগের গণ-সচেতন আর একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁর 'ঢোড়াই চরিত মানসে' (১৯৪৯) আঞ্চলিক উপভাষার সাহায্যে গণ-জীবনের ছবি আঁকবার প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

সাম্প্রতিক কথাশিল্পীদের মধ্যে শক্তিমান লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রধানতঃ মার্কসীয়। তাঁর ভাষা বলিষ্ঠ, চিন্তাধারা গতানুগতিকতার শম্বুকবৃত্তি ত্যাগ করে শোষণহীন ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর। তবে নারায়ণবাবুর গণ-চেতনা মার্কস্‌ পরিকল্পিত শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হয় নি। তাঁর সবল ও সাবলীল ভাষা এবং অন্তরের পুঞ্জীভূত আবেগ উৎসারিত হয়েছে ধনতন্ত্রী সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশের মধ্য দিয়ে (লেখকের 'হাড়' নামক গল্প দ্রষ্টব্য)। ধনতন্ত্রীর খেয়ালের যূপকাষ্ঠে দরিদ্র জনসাধারণের জীবন কী নির্মমভাবে বলি প্রদত্ত হয় নিপুণ সাংকেতিকতার সাহায্যে তিনি সে চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন 'টোপ' নামক গল্পে। সামন্ততন্ত্র কি করে বণিক-সভ্যতার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণ-শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে—তার চিত্র হল লেখকের 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'। 'তিমিরতীর্থে' নমঃশূদ্র ও বেদে-সম্প্রদায়ের মধ্যে গণশক্তির জাগরণকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখক। অভিজ্ঞতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণবাবু যে আরও উৎকৃষ্ট গণ-চেতনামূলক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন—এ প্রতিশ্রুতি তাঁর প্রতিভায় স্পষ্ট।

সমসাময়িক কথাশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের রচনায় গণ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা গণ-জীবনকে আঁকবার চেষ্টা করেছেন

এঁদের গল্প-উপন্যাসে। কারও রচনায় ধনতন্ত্রী সমাজের ভাঙনের চিত্র, কারও রচনায় অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে নগরবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নৈতিক অবক্ষয়ের ছবি, আবার কোন কোন শিল্পী সচেতনভাবে পুঁজিবাদী মালিকের বিরুদ্ধে পুঁজিহীন শ্রমিকের বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্বকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া কোন কোন শিল্পি-মানস নিয়োজিত হয়েছে শহর থেকে বহুদূরে অবস্থিত দরিদ্র ও নিম্ন সম্প্রদায়ের জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকতে। গণ-জীবন সম্পর্কিত নিত্যনূতন বিষয়বস্তুর আবিষ্কারে, বিশ্লেষণের নিপুণতায়, রচনাভঙ্গীর ঔজ্জ্বল্যে সমসাময়িক কথা-সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়ছে সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে কথা-সাহিত্যের পাঠকসংখ্যাও যাচ্ছে হু-হু করে বেড়ে এও নিঃসন্দেহ। কিন্তু রসবিচারে এঁদের গল্প-উপন্যাস কতটা মূল্য অর্জন করছে—এর বিচার করবে ভবিষ্যৎকাল। তবে সমসাময়িক কালের গল্প-উপন্যাস পড়লে একটা কথা কোনমতে অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্যের আসরে বহুকাল স্থান পায়নি—এ রকম উপেক্ষিত বা নিষ্পেষিত গণ-জীবনের ওপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করে এঁরা বাংলা কথা-সাহিত্যের এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে জাগ্রত করে তুলেছেন।

উপসংহারে এ কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, বিষয়বস্তু যেখানে সর্বাধুনিক, সমস্যা যেখানে জটিল, বর্ণনীয় পাত্র-পাত্রী যেখানে ছড়িয়ে আছে আমাদের এতদিনকার চেনা জগতের বাইরে দেশের অগণিত ম্লান ও মূক জনসাধারণের মধ্যে—সেখানে শিল্প রচনা করে সিদ্ধিলাভ করতে হলে প্রয়োজন গণ-জীবনের বিচিত্র ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে লেখকের বিস্তৃত ও গভীর অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে শিল্পীর সংবেদনশীল অন্তর ও অগ্নিগর্ভ প্রতিভা—যেমন দেখেছি আমরা রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী টলস্টয় বা গোর্কির জীবনে। এ ছাড়া বিষয়বস্তু যেখানে বিরাট ও গভীর সেখানে উপন্যাসের পটভূমিও সেরূপ সুপরিসর হওয়া প্রয়োজন, যেমন দেখা যায় টলস্টয়ের *War and Peace*-এ, টমাস মানের *Magic Mountain*-এ, রমাঁ রলাঁর *Jean Christophe*-এ কিংবা গলসোয়ার্দির *Forsyte Saga*-য়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সাহিত্যে সেরূপ বিস্তৃত দৃষ্টি ও সৃষ্টি-প্রতিভাসম্পন্ন কোন উপন্যাস-শিল্পীর এখনও আবির্ভাব হয় নি বললে বোধ হয় ধৃষ্টতা হবে না। মানব-জীবন সম্বন্ধে খণ্ডিত দৃষ্টি এবং অপ্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা উপন্যাস রচনা করেন

তাঁদের সৃষ্টি উপন্যাস না হয়ে ছোট গল্পেরই দীর্ঘায়ত রূপ হয়ে পড়ে। দেশের বৃহত্তর গণ-জীবনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যে কোন কোন উপন্যাস রচিত হলেও এ শ্রেণীর উপন্যাসকেও বোধ হয় সে long-short-story-র পর্যায়েই ফেলা চলে। তবে এ পর্যায়ের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বর্তমান শিল্পীরা যেরূপ সচেতন বুদ্ধি ও নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে এ আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে ভবিষ্যতে এ শ্রেণীর সৃষ্টিধর্মী রচনা মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হবে।

আধুনিক সাহিত্য-শিল্প

বহুকাল মানুষের ধারণা ছিল—সাহিত্য কল্পনায় ফানুস, ব্যক্তিগত অনুভূতির রূপময় প্রকাশে সাহিত্যের জন্ম, জাতীয় জীবনের উত্থান পতনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। সমাজ-বোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উন্মেষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আজ নতুন রূপ নিয়েছে। সামাজিক মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে সমাজের উত্থান পতনের ওপর সাহিত্যের সমৃদ্ধি বা অবক্ষয় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কারণ ব্যক্তি যখন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তখন সাহিত্যেও সমাজ-মনের ছাপ অনিবার্যভাবে পড়তে বাধ্য। সমাজ-তাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ আজ দেখতে পেয়েছে, জীবনযুদ্ধে জাতির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রেরণা হয়েছে দুর্বল এবং সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের নামে বহু আগাছা সাহিত্যের মুক্ত প্রাঙ্গণকে অপরিচ্ছন্ন করেছে। শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা যে সত্য, তা প্রমাণ করা যায় আমাদের বর্তমান সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে।

তুর্কী আক্রমণ ও পলাশীর যুদ্ধ বাঙালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে দুটো যুগসন্ধির কাল। এ যুগক্রান্তি-কালে দেখা গেছে, রাজনৈতিক জীবনের অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার ফলে বাঙালীর সমাজ-জীবনও হয়েছে বিপর্যস্ত। ফলে ব্যক্তিমনের সুস্থতাও হয়েছিল অন্তর্হিত। সে অবস্থায় বাঙালী যে সাহিত্য রচনা করেছিল তার রূপ, রঙ্, স্বাদ ও মেজাজ সমাজ-জীবনের সুস্থ যুগের সাহিত্য থেকে একেবারে আলাদা। সামাজিক মানুষের অস্থির মনে সাময়িক তৃপ্তি বিধান করাই ছিল সে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। সে জন্যে এ দুই অস্থির যুগের সাহিত্য ক্ষণিকতার লক্ষণাক্রান্ত। অথচ বাংলাদেশে মুসলমান বা ইংরেজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর সমাজ-জীবনে যখন স্থিতি-স্থাপকতা এসেছে, তখনই দেখি মানব জীবনের মহৎ আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে ক্লাসিকধর্মী প্রাণবন্ত সাহিত্য—যে সাহিত্যের আবেদন পাঠকচিত্তে সর্বযুগে ও সর্বকালে সমভাবে বিস্তৃত।

প্রায় দু'শো বছর ইংরেজ শাসনের পর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ফলে আমাদের সমাজ-জীবনে আর একটা যুগক্রান্তির লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

এ ক্রান্তিকালে অর্থনৈতিক সংকটে, নীতিধর্মের বিপর্যয়ে, এবং যুগোচিত আদর্শ শিক্ষার অভাবে বাঙালী আবার মানসিক সুস্থতা হারিয়েছে। মন্তব্যটি শুনতে কঠোর হলেও বোধ হয় অসত্য নয়। এ মানসিক অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ হল জীবনের মূল্য উপলব্ধিতে আপেক্ষিক ভারসাম্যজ্ঞানের অভাব। আজ অস্থিরচিত্ত সামাজিক মানুষ জীবনের শ্রেয়োবোধের প্রতি লক্ষ্যহীন, প্রেয় লাভের জন্যেই আজ তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। আদর্শ জীবনের স্বপ্ন আজ ক্ষণিক জীবন-বিলাসী সমাজ-মন থেকে অন্তর্হিত, শুধুমাত্র পরিবেশ-সচেতন সীমাবদ্ধ জীবন-চেতনা নিয়েই স্বাতন্ত্র্যধর্মী ব্যক্তিমন আজ চঞ্চল।

এ একপেশে জীবন-চেতনা যে সমসাময়িক সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করবে—তাতে আর সন্দেহ কী? আজ বাংলা সাহিত্যের আপাত-সমৃদ্ধির অন্তরালে জীবনের প্রতি স্রষ্টার এ খণ্ডিত দৃষ্টি উঁকি মারছে। ফলে যে সাহিত্য ছিল একদিন স্রষ্টার সাধনার বস্তু, সে সাহিত্য আজ পরিণত হয়েছে শিল্প-বিলাসীর পণ্য-সামগ্রীতে। যে যুগে সাহিত্য এ দুরবস্থায় পতিত হয়, সে যুগকে ইংরেজ সাহিত্যিকেরা বলেন—barren period এবং সে অধঃপতিত সাহিত্য-শিল্পকে বলেন—decadent art। জনৈক ইংরেজ সমালোচকের মতে সে Decadent Art-এর প্রধান লক্ষণই হল :

"...........When any particular one of the elements which go to its making occurs in excess and disturbs the balance of forces which keep up the work a co-herent and intact whole."

শিল্প-সৃষ্টির উপকরণের মধ্যে এ ভারসাম্যের অভাব কি এক শ্রেণীর সাহিত্য-শিল্পে আজ আত্মপ্রকাশ করেনি? এ প্রশ্ন আজ চিন্তাশীল সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচকের মনকে আন্দোলিত করছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি স্থাপনের জন্যে স্রষ্টার যে সামগ্রিক দৃষ্টির প্রয়োজন, সে দৃষ্টির পরিচয় আজ শিল্প-সৃষ্টিতে পাওয়া যাচ্ছে কী? নিপুণ শিল্পীর মত বস্তুর সমগ্র রূপের সঙ্গে মানসিক একাত্মতা লাভ করে তার অভিনব ছন্দকে প্রকাশ করবার সামর্থ্য এ-যুগের ক'জন শিল্পীর আছে? সৃষ্টি যাতে নিটোল, সম্পূর্ণ ও অখণ্ড রূপ লাভ করে—তার জন্যে আধুনিক শিল্পীর সাধনা আছে কতখানি? সচেতন শিল্প-সমালোচকের এ সমস্ত প্রশ্ন আজ আর বিদ্রূপ ও অভিসন্ধিপূর্ণ সমালোচনা বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। আজ সৃষ্টির

প্রাচুর্যের যুগে শিল্প-সমালোচকের এ সমস্ত সঙ্গত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। না হলে শিল্পসৃষ্টির নামে সাহিত্যে আবর্জনার স্তূপ বেড়েই চলবে।

আধুনিক সাহিত্য-শিল্পী নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, তাঁদের শিল্পরচনা কী একান্তই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত? অনাবিষ্কৃত অচিন্তিত-পূর্ব জীবনের প্রতি সীমাহীন কৌতূহল ও অদম্য ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়নি কী তাঁদের জীবন-সচেতন শিল্প রচনায়? উজ্জ্বল ভঙ্গী ও চমকপ্রদ টেকনিকের সাহায্যে রূপদান করা হয়নি কী জীবন সম্পর্কে শিল্পীর সে অদম্য কৌতূহল?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলা ছাড়া উপায় নেই। আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীর শিল্প-রচনায় বহুমুখী বৈচিত্র্য আছে, কথা বলবার বিদগ্ধ ভঙ্গীতে আছে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ, শিল্প-প্রবৃত্তির (technique) উৎকর্ষ সম্পর্কে দ্বিমতেরও বোধ হয় অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যে জীবনকে আশ্রয় করে শিল্প-সৃষ্টি, সে জীবনের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় কিংবা তার রস-রূপের প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের শিল্পে কতখানি? শিল্প কি শুধু বাস্তব জীবনের ছবি, সংবাদপত্রের রিপোর্ট? অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত জীবনের নিখুঁত বর্ণনাই কী শুধু শিল্প-রচনার চরম পরিচয়? সাহিত্য-শিল্প কী গল্পভুক্ অর্ধশিক্ষিত জীবন-চিন্তাহীন পাঠকের কৌতূহল-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার বাহন মাত্র? আধুনিক সাহিত্য-শিল্পে, বিশেষ করে কথা-সাহিত্যে শিল্পীর সাংবাদিক-সুলভ মনোবৃত্তি দেখে এ সমস্ত প্রশ্ন প্রশ্নমনস্ক সাহিত্য-সমালোচকের মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়েছে।

ভিতর এবং বাহির উভয়কে অবলম্বন করেই জীবন সম্পূর্ণ। উপরিতল-বিহারী জীবন চঞ্চল, আর অন্তস্তল-বিহারী মন গভীর। মহৎ শিল্পে থাকে জীবনের এ দ্বৈত পরিচয়। স্রষ্টা যিনি তিনি দ্রষ্টাও। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন নতুন আশার জগৎ, আনন্দের জগৎ, বিশ্বাসের জগৎ। সেজন্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শিল্প-স্রষ্টাকে তুলনা করেছিলেন দ্বিতীয় প্রজাপতির সঙ্গে। বাইরের জীবন-চাঞ্চল্যের প্রতি শিল্পীর কৌতূহল যেমন সদাজাগ্রত, তেমনি জীবনের বেদনার প্রতিও শিল্পীর সহানুভূতি অপরিসীম। যে শিল্প যতবেশী বেদনা-সম্ভব, সে শিল্প ততবেশী রসোত্তীর্ণ। Depth but not the tumult of the soul—এ-ই হল জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তির প্রধান পরিচয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক শিল্পীর শিল্প-রচনায় depth-এর পরিচয় অত্যন্ত অল্প, tumult of the soul-ই তাঁদের

শিল্প-চেতনাকে করেছে উদ্দীপ্ত। এ অবস্থায় জীবনের একপেশে রূপই যে তাঁদের শিল্প-সৃষ্টিতে প্রাধান্য লাভ করবে—তাতে আর বিচিত্র কী ?

আরো একটা কারণে আধুনিক বহু শিল্পীর সাহিত্য-শিল্পে দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করছে,—সে কারণটাও বিবেচনার যোগ্য। আমাদের শিল্প-রচনার প্রথম যুগে সাহিত্য-শিল্পীর শিল্প-রচনার প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল বাঙালীর পরিবার, সমাজ ও দেশ। অর্থাৎ যৌথ জীবনবোধের চেতনা ও জাতীয়তাবোধ তাঁদের শিল্প-প্রয়াসে এনে দিয়েছিল একটা উদার বিস্তৃতি। সাম্প্রতিক কালে কোন কোন সাহিত্য-শিল্পীর শিল্প-রচনায় এ যৌথ জীবন-চেতনার পরিচয় থাকলেও অধিকাংশ শিল্পীর সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করেছে একান্তভাবে ব্যক্তিমনের ভাবনা। আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তি-মন যে শিল্পে আত্মপ্রকাশ করবে তা স্বাভাবিক, কিন্তু পারিবারিক জীবন-চেতনাহীন ও সমাজ-প্রগতিবোধহীন অসুস্থ ব্যক্তি-মন যদি সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তা সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে বৈকি !

বাস্তবিক পক্ষে এ অসুস্থ মনের পরিচয় আজ ফুটে উঠেছে শিল্পসৃষ্টির নামে বহু গল্প-উপন্যাসে। আধুনিক কোন কোন জনপ্রিয় শিল্পী গল্প-উপন্যাসকে সাহিত্যের কোঠা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক রস-চর্চার আশ্রয় বলে সদম্ভে প্রচার করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এরূপ একজন শিল্পীর মনোভাব স্পষ্ট রূপ পেয়েছে নিম্নলিখিত সোচ্চার ঘোষণায় :

"আমি নিছক একজন সামান্য গল্প-লেখক। গল্পগুজব ভালবাসি বলেই নিজেও গল্প-স্বল্প করতে পারি। সাহিত্য-কাহিত্য কি ব্যাপার—ও আমি বুঝি না বা বোঝবার বিন্দুমাত্র গরজও আমার নেই।"

[দ্রষ্টব্য, কথাসাহিত্য, বৈশাখ, ১৩৬৬, পৃঃ ৫৮২]

দৈবপ্রেরিত স্রষ্টার মত শিল্প-রচনার আদর্শ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ভান করে পর মুহূর্তেই আবার এ আধুনিক শিল্পী বিজ্ঞের মত বলেছেন :

"আনন্দ থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি—আনন্দেই সাহিত্যের পরিসমাপ্তি। শ্লীলতা কি, অশ্লীলতা কি—এই যদি সাহিত্যের মাপকাঠি হয়, তা হলে পুলিশের হাতের আইনের বইটাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।"

[দ্রষ্টব্য, কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃঃ ৫৮৬]

সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ ও অভিমুখিতা সম্পর্কে উক্ত মতের যৌক্তিকতা

অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এ যুগের সর্বসংস্কারমুক্ত সাহিত্য-শিল্পী তাঁদের শিল্প-প্রয়াসের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ বা বেদনাবোধের সঞ্চার করতে পারছেন কি? না আনন্দের নামে বিচারহীন পাঠকের মনে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে নিজের রচনাকে জনপ্রিয় ও অর্থকরী করবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন? এ প্রশ্ন আজ শুধু বিচারশীল প্রবীণ সমালোচকের নয়—সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সুপরিচিত অনেক রুচিশীল তরুণ-তরুণীর মনকেও নাড়া দিয়েছে। চার বৎসর আগে প্রথম প্রকাশিত এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় 'শ্মশানের মহাকাব্য' নামে পরিচিত একখানি তথাকথিত জীবনধর্মী কাহিনীর (কোন ক্রমে উপন্যাস নয়) কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ কাহিনীখানি কোন কোন খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করলেও এর আদ্যোপান্ত অসংযত কামনার অনাবৃত ও রুচিহীন প্রকাশ—ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে জুগুপ্সা ভিন্ন আর কোন উচ্চতর আবেদনের সৃষ্টি করতে পারেনি। চর্যাসম্পন্ন কোন কোন তরুণ পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে এ বইখানির শিল্পোৎকর্ষ সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি, এ best-sellerখানি (চার বৎসরে নবম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে) তাদের মনেও অনুরূপ ভাবের সঞ্চার করেছে।

শিল্পসৃষ্টির নামে মজাদার রিরংসাপূর্ণ কাহিনী রচনা করে রুচিহীন পাঠকের ক্ষণিক যৌন-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করবার সাধনায় লেগে গেছেন আজ শুধু তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নন,—ডাক্তার, কারা বিভাগের কর্মী, এমন কি শিক্ষাব্রতী অধ্যাপকও। উদ্দেশ্য সকলেরই এক—সাহিত্য-শিল্পকে পাঠ্যহিসেবে লোভনীয় করে তার সাহায্যে অর্থ উপার্জন। বর্তমান বিত্তকুলীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় সাহিত্যের নামে এ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছে আজ অভ্যর্থিত হচ্ছে—এটাই খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়। এর জন্য দোষ দেওয়া যাবে কাকে? সাহিত্য-যশোলিপ্সু স্থূলরুচির সন্ন্যাসী, ডাক্তার ও কারাবিভাগীয় কর্মীকে বরং এ যৌন-উত্তেজনাপূর্ণ রচনার জন্যে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু যখন দেখি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদী অধ্যাপকও স্বীয় বিবেক বিসর্জন দিয়ে এ জঘন্য ব্যবসায়ীচক্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন তখন দুঃখ হয়। সম্প্রতি একখানি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে জনৈক অধ্যাপক পুরাণের কাহিনী নিয়ে ভ্রাতা-ভগ্নীর যৌন মিলনের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করে চরম আধুনিক মনোবৃত্তির (?)

পরিচয় দিয়েছেন। রকম সকম দেখে মনে হয় সাহিত্যে ভারতচন্দ্রীয় টেকনিকে রুচি-বিকৃতির পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। এ শ্রেণীর বিকৃত-রুচির সাহিত্য-স্রষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্যে পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাঁরা ব্যবসা করতে বসেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যে মালের চাহিদা বেশী, তাঁরা সে মালের উৎপাদনকারীদের যে অর্থ দিয়ে এবং মাঝে মাঝে সাহিত্যসভার আয়োজন করে উৎসাহিত ও সম্মানিত করবেন—তাতো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নির্দোষ পাঠক-সমাজ যে এ সমস্ত ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন লেখক সম্পাদক ও প্রকাশক-সম্প্রদায়ের দ্বারা নিত্যনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন—এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি দেখে সমাজ-সচেতন সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রই বেদনা-বোধ করেন।

ওপরে যে শ্রেণীর লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকের কথা বলা হল তাঁরা ছাড়া প্রকৃত বিবেকবান শিল্পী, সম্পাদক ও প্রকাশক যে বাংলা দেশে নেই—এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক বাংলা দেশে আজ ব্যতিক্রম, 'নিয়ম' নয়। যুগ-প্রবৃত্তির সঙ্গে তাল রাখেন না বলে তাঁরা আজ কোণঠাসা হয়ে আছেন। দেশের পাঠক-পাঠিকার প্রকৃত রস-বোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সমৃদ্ধির কোন আশা নেই—একথা শুনতে নৈরাশ্যজনক মনে হলেও বাস্তবসত্য। দেশের মধ্যে মহৎ না হোক, অন্ততঃ সৎ-সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। এ দায়িত্ব শুধু প্রকাশক বা সমালোচকের নয়,—শিক্ষকের, সমাজনেতার, বিভিন্ন শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের—এমন কি সমাজ-সচেতন শিল্পীরও।

বার্ণার্ড শ'র মত আমাদের সমাজ-সচেতন শিল্পীকেও আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে—"শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরে আমি একটি লাইন লিখ্তেও রাজী নই"। শুধু তাই নয় অভিসন্ধিপরায়ণ লেখকদের উৎকেন্দ্রিক যৌন-প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের তীব্র বাণ নিক্ষেপ করতে হবে, আর বলতে হবে সাহিত্যে এ অসামাজিক প্রবৃত্তি 'Paper Satisfaction' (B. Shaw) ছাড়া আর কিছুই নয়।

বস্তুতঃ আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীর শিল্প-রচনায় সব চাইতে গোল বেঁধেছে 'সৌন্দর্যসৃষ্টি' ও 'রসসৃষ্টি'—এ দুটো কথাকে কেন্দ্র করে। সৌন্দর্যসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি প্রত্যেক সার্থক শিল্পকীর্তির মূল প্রেরণা এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু আধুনিক শিল্পী এ দুই সাহিত্য-প্রেরণাকেই গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত স্থূলভাবে। ফলে বাস্তবতার

নামে মানব জীবনের নগ্ন সৌন্দর্যের উদ্‌ঘাটনেই তাঁদের শিল্পপ্রয়াস সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় আধুনিক শিল্প-স্রষ্টার বহু রচনায় যে রসসৃষ্টি হয় তা আর যাই হোক্, সাহিত্য-রস নয়। যে শিল্প-রচনায় সংযম নেই, ব্যঞ্জনা নেই, সেখানে সৌন্দর্য-সৃষ্টির কথা অবান্তর। সাহিত্যের সৌন্দর্য মানেই একটা অনির্বচনীয় আনন্দবোধের আভাস—যে আনন্দ মানব-মনের উত্তরণ ঘটায়। যে রচনা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে চঞ্চল করে—ক্ষণিকের জন্য হলেও পাঠকের মনকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না, শিল্প হিসেবে সে রচনা রসহীন—অতএব নিকৃষ্ট। শিল্পের সৌন্দর্য হল সে সৌন্দর্য যা 'aesthetically beautiful'। কলাকৈবল্যবাদীরা বাস্তব-সত্যের নামে সৌন্দর্যের এ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে উপেক্ষা করে স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনানুভূতিকে প্রাধান্য দেন বলেই আধুনিক সাহিত্যে দিন দিন সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টি বেড়েই চলেছে। কলাকৈবল্যবাদ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীর স্মরণযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

"......art for art's sake means that only what is aesthetically beautiful must be expressed and all that contradicts the aesthetic sense of beauty must be avoided."

বাস্তবিক পক্ষে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে-শিল্প রসের দিক থেকে বা নীতির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়, সে শিল্পকলা মানবমনে স্থায়ী আবেদনের সৃষ্টি করতে পারে না। শরৎচন্দ্রের যুগে উৎকেন্দ্রিক কলাকৈবল্যবাদী শিল্পীরা এ মহৎ শিল্পীকে তাঁদের পুরোধাস্থানীয় বলে মনে করতেন। অথচ শরৎচন্দ্র নিজে কখনও শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ভাবতে পারতেন না। এ মহৎ শিল্পীর মতে শিল্পকলা মানব-কল্যাণের সঙ্গে নিত্যযুক্ত। সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন :

"Art for art's sake" কথাটি যদি সত্য হয়, তা হলে কিছুতেই তা immoral বা অকল্যাণকর হ'তে পারে না এবং immoral বা অকল্যাণকব হ'লে "art for art's sake" কথাটিও সত্য নয়।"

প্রবীণ শিল্পীর এ শিল্পাদর্শের সংকেতটি অন্তরে জাগ্রত রেখে আজ আধুনিক শিল্পীকে সতর্কভাবে শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। না হলে সমাজ-কল্যাণ-পরিপন্থী আপাতসমৃদ্ধ সাহিত্য-শিল্প অতিক্রত অবক্ষয়ের পথে নেমে যাবে। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের এক শ্রেণীর তথাকথিত সৃজনধর্মী সাহিত্যে

অবক্ষয়ের চিহ্ন আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এ মন্তব্য যে কত বড় সত্য আধুনিক সৃজন-ধর্মী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির যাঁরা খবর রাখেন—তাঁদের কাছে প্রমাণের বোধ হয় প্রয়োজন নেই।

কিন্তু প্রমাণ ছাড়া মন্তব্য মূল্যহীন। সেজন্য প্রথম উৎকট আধুনিকতার যুগের ও সাম্প্রতিক কালের দুই একজন সাহিত্য-শিল্পীর রচনা থেকে সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রচেষ্টার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করব। প্রথমটি ব্যঞ্জনাহীন ভাষায় তরুণীর যৌবনোদ্গমের বাস্তব চিত্র!

তার নিধুবন উন্মন
ঠোঁটে কাপে চুম্বন
বুকে পীন যৌবন
উঠেছে ফুঁড়ি
মুখে কামকণ্টক ব্রণ
মহুয়া কুঁড়ি।

অথচ তরুণীর যৌবনাভাসের চিত্র কী অপরূপ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ভাষায় রসরূপ লাভ করেছে একই যুগের কবি-শিল্পীর নিপুণ তুলিকার স্পর্শে:

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়
গন্ধে বিভোর দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জল স্থলের মর্মদোলায় দোল
হেঁকেছিল খোল রে দুয়ার খোল।…

দ্বিতীয় চিত্রটি রবীন্দ্র-শরৎ যুগেরই জনৈক কথা-সাহিত্য শিল্পীর। তাঁর একখানি উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বাস্তবতার যে রূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তা এরূপ:

"……পুরু গদি ও তোষকের ওপর পরিষ্কার চাদর পাতা। তারই ওপর পা ছড়িয়ে একটা মেয়ের আধখানি দেহকে জড়িয়ে ধরে একটি ছেলে শুয়ে রয়েছে। মেয়েটি কোন প্রতিবাদ করছে না…

……মুখের ওপর থেকে মুখ সরিয়ে সত্যেন বলল—আশ্চর্য, তুমি মাটি না পাথর। গায়ে কি এক ফোঁটাও রক্ত নেই?

….. অসংখ্য চুম্বনের কয়েকটা ভিজা দাগ সুলতার সমস্ত মুখখানার ওপর তখনও ফুটে রয়েছে। বলল, হাঁপাচ্ছ কেন?

"...বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তাই রক্ষে, নইলে সত্যেনকে তিরস্কৃত হ'তে হতো।"...

পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে, এ কী বাস্তবধর্মী জীবন-শিল্প, না 'আইন আদালতে'র কলামে সংবাদপত্রের রিপোর্ট পড়ছি? নায়ক নায়িকার কত চরম উত্তেজনাপূর্ণ মূহূর্তকে সাহিত্য-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রকাশ করেছেন সংক্ষিপ্ত, সংকেতধর্মী, ব্যঞ্জনাময় ভাষায়—তার উদাহরণ মিলবে কৃষ্ণকান্তের উইল, চোখের বালি, ঘরে বাইরে, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাসে। এঁদের উত্তরসূরী বহু সাহিত্য-শিল্পীর শিল্পকর্মে সমসাময়িক সমাজ-চেতনা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি কোন কোন কথা-শিল্পী নামধারী এক শ্রেণীর যৌন-সচেতন লেখকের রচনায় যেভাবে রুচি-বিকৃতি সুস্পষ্ট কদর্যরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—তাতে সমাজ-কল্যাণকামী সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেরই সাবধান হবার প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়। প্রথমে একজন বহু পাঠক-সমাদৃত সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যিকের নারীরূপ বর্ণনা উদ্ধার করি। লেখক নাকি একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। রূপ বর্ণনা করেছেন তিনি একজন বৈষ্ণবীর :

"...বোধ হয় গরমের জন্যেই রাত্রে সেমিজটা খুলে ফেলেছে। দু'হাত মাথার ওপর তোলার দরুণ দুই বাহু মূলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয় ভয়ানক রকম জীবন্ত পাতলা চামড়া ঢাকা দুটি রক্তমাংসের ডেলা।"

এরপর বৈষ্ণবী ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে তান্ত্রিক কথকের কাছে। সন্ন্যাসীর আবেগতপ্ত নারী সান্নিধ্যের বর্ণনা আধুনিক বাস্তববাদী সংসারী শিল্পীর বর্ণনাকেও হার মানায় :

"...নিতাইয়ের নিখুঁত নিটোল বাম উরুর ওপর ডান কানটা চেপে শুয়ে আছি।...সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে আমার কপালে হাতে বুলিয়ে দিচ্ছে আর গান গাইছে বোষ্টমী। সামান্য একটু চাপ পড়েছে আমার মাথায়। অতি কোমল নিতাইয়ের বুকের চাপ। কিন্তু শীতলতা নেই সেই মৃদু স্পর্শে। নিতাইয়ের নিটোল উরু আর বোধ হয় তার বুকও জ্বলছে। সর্বাঙ্গ জ্বলছে তার..."।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠ্ছে পাঠক-পাঠিকার মনও আরো একটু উত্তপ্ত মদিরা পান করবার জন্যে। এ মদিরার নেশা পেয়ে বসেছে আজ ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী সকলকে। হু হু করে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে মহাশ্মশানের এ মহাকাহিনীর

সংস্করণের পর সংস্করণ। শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ আশ্চর্য জীবন-স্রষ্টার গলায়। মনে হচ্ছে, তামসিক যুগের কালো ছায়া নেমে এসেছে আজ বাংলা দেশের দিকদিগন্তে।

মানুষের এ তামসিক প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ করার অভিপ্রায়ে শিক্ষাব্রতী আধুনিক সাহিত্য-শিল্পী অগ্রসর হয়েছেন পৌরাণিক তামসিকতার কাহিনী নিয়ে। এ কাহিনীগুলো প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সম্পাদক বলেন: "মানুষ আপনাপন মনোমুকুরে এঁদের (তামসিক ভাবাপন্ন চরিত্রগুলির—লেখকের মন্তব্য) প্রতিবিম্ব দেখে সাবধান হতে পারবেন, সমাজে তাদের ব্যভিচার দেখে সমাজকে এদের কবলমুক্ত করায় তৎপর হবেন—এই উদ্দেশ্যেই এই তামসিক পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির অবতারণ।"

উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই—বিষে বিষক্ষয়। সুপরিজ্ঞাত চিকিৎসা প্রণালী! সমাজ দেহে আজ যে বিষ প্রবেশ করেছে তা সমূলে উৎপাটিত করার অভিপ্রায়ে সাহিত্যশিল্পী ও সম্পাদকের এই সম্মিলিত অভিযান জয়যুক্ত হলে দেশের পক্ষে তা পরম মঙ্গলজনক সন্দেহ নেই। এ সংগ্রামের প্রথম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন অধ্যাপক-শিল্পী ভ্রাতা-ভগ্নীর যৌন সম্ভোগের চিত্র! আগেই বলেছি, অধ্যাপকের শিল্প-রচনার টেকনিক ভারতচন্দ্রীয়, অতএব নিন্দার কোন কারণ নেই!

সমাজের পাপ-প্রবৃত্তিকে তার উৎস সহ ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে সমাজ-সচেতন অধ্যাপক-শিল্পী কাহিনীর পরিণতিকে সজীব রূপ দিয়েছেন এ ভাবে:

"...সহসা কে তাকে আলিঙ্গন করল, উষ্ণ—জ্বালাময় আশ্লেষ! রোমাঞ্চিত নিঋতি, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, চোখের পাতায় কী নিদারুণ ক্লান্তি। ...নিঃশেষে নিজেকে সে সমর্পণ করে কামনার নিবিড় বাহুপাশে। ...সর্বাঙ্গে রক্তকণার উত্তাল নৃত্য। আজ নির্ঋতির রভস-রজনী। আজ নির্ঋতির উল্লাস।...

...উষার গোধূলিতে চোখ মেলে তাকাল রমণক্লান্ত, তৃপ্ত নির্ঋতি কিন্তু মুহূর্তেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে বসল সে। এ কি! কার আলিঙ্গন-পাশে ধরা দিয়েছে নির্ঋতি! আতঙ্কে আর্তকণ্ঠে পাগলের মত চিৎকার করে উঠে নির্ঋতি, 'কে, তুমি! কে তুমি!' উত্তর আসে 'আমি অনৃত'।

অনৃত! অধর্ম-নন্দন, নিঋতির সহোদর অনৃত! হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নির্ঋতি। একি সর্বনাশ হল তার।"

নির্ঋতির চরম সর্বনাশ ত হলই, কিন্তু আমাদের একমাত্র আশঙ্কার কথা, এ

ধরণের সর্বনাশা কাহিনী পড়ে আমাদের অপরিণত পাঠক-পাঠিকার মন বিভ্রান্ত না হয়ে যায়। পুরাণ থেকে খুঁজে খুঁজে এ ধরণের কাহিনী প্রকাশ করবার মনোবৃত্তির তাৎপর্য কোথায়—তা বুঝতে চতুর পাঠকের দেরী হয় না। এ সমস্ত কারণে আজ সমালোচক-মাত্রেরই পবিত্র কর্তব্য হল—তামসিক মনোভাবাপন্ন আধুনিক শিল্পীর ছলনাজাল থেকে অপরিণত পাঠক-পাঠিকার মনকে মুক্ত করে মহৎ সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

১০

সাহিত্যে শক্তির আয়োজন

আমার এক সমালোচক-বন্ধু সাহিত্য-বিচারে একদম নেতিবাদী। সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে কোন কথা আলোচনা করতে গেলে প্রবল নৈরাশ্যে তিনি বলে ওঠেন: "সাম্প্রতিক সাহিত্য 'সাহিত্য' পদবাচ্যই নয়, ও সম্পর্কে আলাপ করব কী? ডাস্ট্‌বিনের ময়লা ঘেঁটে লাভ কী?"

তাঁর মতে সাম্প্রতিক কবিতা পাশ্চাত্য ভাববস্তুর অজীর্ণ উদ্গার, সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাস বৈচিত্র্যহীন পান্‌সে প্রেমের ছিঁচ্‌কাঁদুনীতে পূর্ণ, বর্তমান নাটক পাশ্চাত্য নাটক থেকে চুরি-করা ঘটনা নিয়ে Stunt দেবার উদ্দেশ্যে রচিত, বর্তমান ভ্রমণ-কাহিনী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নয়—কল্পনা-প্রধান রম্যোপন্যাস, রম্য-রচনা নামে প্রচলিত এক শ্রেণীর লেখা রম্যও নয়, রচনাও নয়, আর আধুনিক সমালোচনা বলে যাকে অভিহিত করা হয় তা কোন ক্ষেত্রে বন্ধু-কৃত্যের নিদর্শন, আবার কোন ক্ষেত্রে পরস্পর পিঠ-চুলকানি-সমিতির ইস্তাহার!

বহু চিন্তা-গবেষণার পর বন্ধুবর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—বর্তমান সাহিত্যের যুগ একটা বিরাট শূন্যতার যুগ। এ-যুগে মানসিক সক্রিয়তার একমাত্র মূল্য আছে পলিটিক্সের জগতে। এ জন্য তিনি স্থির করেছেন, সাহিত্য সমালোচনার পেশা একদম ছেড়ে দিয়ে শিগ্‌গীর তিনি একটি রাজনৈতিক দলে নাম লেখাবেন, এবং সে দলের মুখপত্র 'আবর্ত' নামক পত্রিকায় গরম গরম সরকার-বিরোধী প্রবন্ধ লিখে রাজনৈতিক আকাশে সূর্যের না হোক, অন্ততঃ ধূমকেতুর স্থান গ্রহণ করবেন। এতে যশও হবে, আর আগামী নির্বাচনে বিধান পরিষদের সভ্য হতে পারলে পদমর্যাদার সঙ্গে মাসে মাসে নির্দিষ্ট একটা আয়ও হবে। বন্ধুবরের মতে চিন্তাশীল রাজনীতিক সেজে এভাবে এক ঢিলে দু'পাখী মারার মত উৎকৃষ্ট পথ এ যুগে আর হতে পারে না।

জোরদার রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারলে ব্যবহারিক জীবনে সফলতা যে খুব তাড়াতাড়ি আসে বন্ধুবরের সঙ্গে সে বিষয়ে আমি একমত। কিন্তু বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে বন্ধুবরের একচক্ষু-হরিণের-দৃষ্টিকে আমি সমর্থন করতে পারিনে।

বর্তমান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই হচ্ছে না বলতে তিনি আমাদের পক্ষের আনা লেখক ও পাঠকের মত শুধু সৃজন-ধর্মী সাহিত্যকেই বোঝেন। কিন্তু বন্ধুবরকে আমি জিজ্ঞেস করি, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যই কি সাম্প্রতিক সাহিত্যের একমাত্র পরিচয়? যে জ্ঞানগর্ভ গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, রচনা-আলোচনা স্রষ্টার মনের পরিমার্জন ঘটিয়ে সৃষ্টিকর্মকে সম্ভব করে তোলে, সে কি সাহিত্য নয়? আর এ ধরণের সাহিত্য-প্রয়াস পূর্বযুগ থেকে সাম্প্রতিক কালে কি বহুগুণ বেড়ে যায় নি?

আসলে পাশ্চাত্য লেখকদের তুলনায় আমাদের লেখকদের সাহিত্য সম্পর্কীয় ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—এ অপ্রিয় সত্যটি স্বীকার না করে উপায় নেই। আজ থেকে বহু বৎসর পূর্বে ইংরেজ লেখক De Quincey 'Literature of Power'-এর সঙ্গে 'Literature of Knowledge'-কেও সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ব-সাহিত্যে ইংরেজী সাহিত্যের সম্মাননীয় স্থান শুধুমাত্র বিপুল সৃজনধর্মী সাহিত্যের জন্যে নয়—ইংরেজ লেখকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে সবল পদচারণা করেও সে সাহিত্যের গৌরব বাড়িয়েছেন। সে দেশে সৃষ্টিধর্মী শিল্প-সচেতন লেখক যেমন জনসমাজে আদৃত, তেমনি আলোচনা-সমালোচনা এবং জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের লেখকও সমান শ্রদ্ধেয়। বর্তমান কালে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র আলোচনা ও গবেষণাত্মক সাহিত্যেই ইংরেজ লেখকদের চিন্তার প্রকাশ ঘট্‌ছে না, শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ উপন্যাস সাহিত্যও তাঁদের চিন্তার বাহন হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে মূল্যবান ও মূল্যহীন উপন্যাস সাহিত্যের প্রসার এবং মননশীল সাহিত্যের দৈন্য দেখে সর্বপ্রথম সচেতন হয়েছিলেন গত শতাব্দীর চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। সেজন্য তিনি মুখ্যতঃ রসস্রষ্টা শিল্পী হয়েও জীবনী, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধুমাত্র তিনি নিজে যে জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের সমৃদ্ধি কামনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা নয়, প্রবল উৎসাহ দিয়ে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন এ-শ্রেণীর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে-যুগের কোন কোন মননশীল লেখক জ্ঞানমূলক সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রয়াস পেলেও এ স্বজাতি-প্রেমিক লেখক-প্রদর্শিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান-আলোচনার ধারাটি পরবর্তী কালে তেমন অনুসৃত হয়নি। সেজন্য এ বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও আমরা অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের পথে চল্‌তে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে যে মননশীল লেখক আধুনিক সাহিত্যে জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের দৈন্য দেখে অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করেছিলেন তিনি হলেন স্বনামধন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বীয় শিল্পীজীবনে রস-সমুদ্রে অবগাহন করেও সমকালীন সাহিত্যে 'ভোগের পনের আনা আয়োজন' দেখে তিনি জাতির ভবিষ্যৎ-চিন্তায় শঙ্কিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা বক্তৃতায়' তিনি তাই জাতিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শক্তির আয়োজন' করবার জন্যে আহ্বান জানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি,—নিজেও জীবনী-সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা, ইতিহাস-চর্চা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব আলোচনা, এমন কি বিজ্ঞান আলোচনায় আত্মনিয়োগ করে সাহিত্যাদর্শ-বোধহীন জাতিকে সচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সাহিত্যে 'শক্তির আয়োজন' বলতে তিনি অবশ্য De Quincey-র 'Literature of Power'-কে লক্ষ্য করেন নি ;—যে সাহিত্য শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় প্রতিভাবানের কল্পনানির্ভর নয়, যে সাহিত্যসৃষ্টির জন্য মার্জিত-মানস ব্যক্তির কঠিন প্রয়াসকে সদা-সর্বদা জাগ্রত রাখতে হয়—সে সাহিত্যের সমৃদ্ধি কামনায় আত্মনিয়োগ করবার জন্যে সবল-কণ্ঠে তিনি শিক্ষিত স্বদেশ-প্রেমিক দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন।

এ শতাব্দীর তিনের ও চারের দশকে শিক্ষিত বাঙালীর জীবন ছিল স্বদেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের আঘাতে সংক্ষুব্ধ—নৈরাশ্য-পীড়িত। সে জন্যে জাতীয় সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথের এই উদাত্ত আহ্বানে বাঙালী ব্যাপক ভাবে সাড়া দিতে না পারলেও সাহিত্যের দৈন্য সম্পর্কে তাঁরা যে একেবারে সচেতন হননি—একথা বলা যায় না। তারপরে এ-শতাব্দীর স্মরণীয় বৎসর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের রক্তকলঙ্কিত পথে এল ভারতের ঈপ্সিত স্বাধীনতা ও অনভিপ্রেত ভারত বিভাগ। এ যুগান্তরকারী ঘটনার ফলে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে জাতীয়তার ভিত্তিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল পরম আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর এবং ভারত বিভাগোত্তর জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সংগঠনমূলক জাতীয় কর্মপ্রয়াসের সামনে বিরাট বাধারূপে উপস্থিত হল। স্বাধীনতা লাভের পর সুদীর্ঘ বার বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনে শিক্ষিত বাঙালী এখনও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করা দূরে থাক, স্থিতিস্থাপকতা পর্যন্ত লাভ করতে পারে নি। সমাজে এখনও স্থূলরুচি বিত্তকুলীনদেরই প্রাধান্য। জাতীয় অর্থ এখনও নিত্য নিয়মিত অপচিত হচ্ছে ডিনারে, পার্টিতে, সিনেমা-থিয়েটারে, আর ব্যক্তিগত অবাঞ্ছিত

ভোগ-বিলাসে। জাতীয় জীবন থেকে গত শতাব্দীর আদর্শ-চেতনা সম্পূর্ণভাবে না হোক—আংশিকভাবে অন্তর্হিত। মননশীল সংস্কৃতি-সচেতন ব্যক্তিও আজ আশু লাভ ও যশের আশায় রাজনীতির খুরে মাথা মুড়িয়েছেন।

সব থেকে নৈরাশ্যজনক অবস্থা ঘটেছে বাঙালীর জাতীয়তাবোধের চেতনায়। এই চেতনার অভাব শুধু রাজনীতিকদের মধ্যে নয়—সাহিত্যিকদের জীবনেও অতি প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালীর প্রাধান্যের অন্যতম পরিচয় তার সমৃদ্ধ সাহিত্য। এ সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ সাধনের জন্যে জীবন-মরণ পণ করেছিলেন গত শতাব্দীতে মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র এবং এ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ—এ কথা তো পূর্বেই বলেছি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মধুস্দনের মত এমন কোন জাতীয়-সাহিত্য-সচেতন লেখক বর্তমানে কি আমাদের মধ্যে আছেন—যিনি তাঁর মত বুকে হাত দিয়ে সদম্ভে ঘোষণা করতে পারেন—'যদি আমি স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি করতে পারি তাহলে রাশিয়ার রাজমুকুটও চাই না'। দুঃখ হয় যখন দেখি এ-যুগের ক্ষমতাশালী লেখকও আর্থিক প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে নিজের শক্তি-সামর্থ্য এবং সময়ের অপব্যয় করেন ক্ষণস্থায়ী, অকিঞ্চিৎকর এবং মূল্যহীন সাহিত্য রচনায়।

অথচ আমাদের জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের দৈন্যের পরিমাণ এখনও পর্বতপ্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আরো কোন কোন স্বদেশ-প্রেমিক সাহিত্য-নায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন দেওয়ালে মাথা ঠুকবার পর সাধারণ স্নাতক বিভাগ (Pass) পর্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পরীক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু মানবিক বিদ্যাবিষয়ক (humanities) কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত হলেও বিজ্ঞান বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক এখনও মাতৃভাষায় রচিত হয়নি। এ ছাড়া বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে সেগুলিও সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়। সেজন্য অধ্যাপকেরাও সে সমস্ত বই পড়তে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন না, উচ্চাভিলাষী ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও এ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের ধার দিয়েও যান না। ডাক্তারী, ইন্‌জিনীয়ারিং, সামরিক বিদ্যা, নৌ-বিদ্যা প্রভৃতি টেক্‌নিকেল বিষয়ে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা এবং শিক্ষা-শিক্ষণের ব্যবস্থা বোধ হয় এখনও আমাদের শিক্ষিত লোকদের নিকট কল্পনাতীত ব্যাপার। অথচ কয়েক বছর আগে আগ্রায় একটি পুস্তক প্রদর্শনীতে হিন্দীতে রচিত এ শ্রেণীর গ্রন্থ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। বাংলা ভাষার তুলনায় হিন্দী

ভাষার প্রকাশশক্তি কি এত বেশী যে, যে-সমস্ত জটিল বিষয় হিন্দীতে প্রকাশ করা যায় তা' বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব? স্ব-সাহিত্যপ্রেমিক বাঙালী এ-সম্বন্ধে ভেবে দেখবেন কী?

এ ছাড়া অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল দর্শন বা বিজ্ঞান-বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এখনও তেমন রচিত হয়নি। রস-সাহিত্যে মাতৃভাষার যৌবন-সম্ভাবনা দেখা দিলেও জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের দিক দিয়ে আমাদের স্বদেশীয় সাহিত্য বিশ্বের প্রগতিশীল সাহিত্যের তুলনায় এখনও শিশু। জাতীয় সাহিত্য-সরস্বতীর এক পা সবল আর এক পা দুর্বল হলে তিনি চলবেন কী করে? বাঙালী-মনীষা কী সত্যি এত ভোঁতা হয়ে গিয়েছে সাহিত্যের এ কঠিন প্রয়াসের দিকে তাঁর চিন্তা ও কর্ম সক্রিয় হয়ে উঠতে পারছে না?

কিন্তু বাঙালী-মনীষা যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়নি তা বোঝা যায় এ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে আমাদের সাহিত্যে শক্তির সীমাবদ্ধ আয়োজন দেখে (বাঙালীর এই শক্তি-সাধনার প্রয়াস খুব সম্ভব আমার নেতিবাদী বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি)। ঐ সময় একজন মনীষী বাঙালীর চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস সঙ্কলিত হয়েছে। আর একজন বাঙালী মনীষী কিছুকাল পরেই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে হলেও বাংলা ভাষার আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করে বিশ্বের চোখে বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়িয়েছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র এবং আচার্য সুনীতিকুমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণায় উল্লেখ্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ডক্টর সুশীলকুমার দে, শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং আরো অনেকে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না হলেও সে সাহিত্যের একটি দিককে নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যের ইতিহাস লেখার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন প্রখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা দেশে নব-উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধের (কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য চাকুরী ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের আশায়) প্রেরণায় বিস্মৃতপ্রায় গ্রন্থ এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নিহিত উপকরণের সাহায্যে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নতুন করে লেখবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। এ ধরণের কোন কোন গ্রন্থ-প্রণেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট্ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

অবশ্য বাঙালীর ইতিহাস প্রণেতা ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের প্রাচীন তথ্যানুসন্ধান-তৎপরতা, বিন্যাসকৌশল এবং বাঙালী-চিত্ত ও চরিত্র উপলব্ধির নিপুণ প্রয়াসের কাছে বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক ডক্টরেট্ থিসিস্ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়। শিক্ষায়তনের গণ্ডীর বাইরে থেকে এ যুগে বাঙালী জাতি, সংস্কৃতি এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কীয় তথ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিপ্রধান ইতিহাস লিখে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীবিনয় ঘোষ। অষ্টাদশ ঊনিশ শতকের বাঙালীর ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ সংকলন এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদনা করে ভবিষ্যৎ গবেষণাকারীদের জন্যে আকরগ্রন্থ (Source Book) রচনার গৌরবভাগী হয়েছেন স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীল কুমার দে, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীহরিহর শেঠের মত নিষ্ঠাবান সাহিত্যকর্মী। জীবনী-সাহিত্য রচনায় মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সমালোচনায় এ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে নতুন আদর্শ প্রবর্তন করে বাঙালী-মনীষার সক্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছিলেন স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন এবং মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালেরই সমকালে বিশ্লেষণ-প্রধান ইংরেজী সমালোচনার আদর্শে নবতর সমালোচনা-রীতির সৃষ্টি করলেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান ইংরেজীর অধ্যাপক। এ ধরণের সমালোচনা শুধুমাত্র বহুবিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচায়ক নয়—ভবিষ্যৎ সমালোচনা সাহিত্যের দিক-নির্দেশক। সমালোচনা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর পরে এক শ্রেণীর বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা-রীতির প্রবর্তক স্বর্গীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনার রীতি কোন কোন লেখক কর্তৃক আজ ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সমালোচনা-সাহিত্যে বিস্তৃত পাঠানুশীলন, গভীর চিন্তাশক্তি ও রসবোধ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ধর্মিতা এবং সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে নিরপেক্ষ মত প্রকাশে সৎসাহসের অভাব দেখে নৈরাশ্য বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সাহিত্যের মূলনীতি এবং রস ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মত দুরূহ বিষয়কে বাংলা ভাষায় আলোচনা করে সত্যিকারের মনীষার পরিচয় দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। সাম্প্রতিক কালে কোন কোন প্রবীণ ও তরুণ অধ্যাপক মাতৃভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রসশাস্ত্র আলোচনা ও

অনুবাদ করে সাহিত্য-সাধনায় কঠোর প্রয়াসকে স্বীকার করেছেন। এ ধরণের আয়াসসাধ্য সাহিত্যকর্ম নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক।

বিগত কুড়ি বছর আগের থেকে আজ আমাদের দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সঙ্গে শিক্ষিত-মনের বহুমুখী কৌতূহল বাড়ে নি। এ কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা-গবেষণা মুখ্যতঃ শিক্ষায়তনের চৌহদ্দীর মধ্যেই এখনও সীমাবদ্ধ। মনীষার অধিকারী বাঙালী লেখক এ কথা জানেন, তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা রচনা খুব কম বাঙালী পাঠকই পড়বেন। তাই তাঁরা ইংরেজীতে লিখতে প্রলুব্ধ হন। প্রকাশকেরাও এ কারণে এ ধরণের জ্ঞানগর্ভ বই প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত। তাঁদের কাছে বেশী আদরণীয় আধুনিক শ্রেণীসংঘাত এবং গণচেতনার প্রলেপ দেওয়া সস্তা রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী-নির্ভর বাজার-চলতি গল্প-উপন্যাস। এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও দার্শনিক তত্ত্ব ও আলোচনা-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য বাড়াবার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, তারকচন্দ্র রায়, আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ, ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এবং জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞানালোচনার পরে এ যুগে বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা করে বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। ভারতীয় চিত্রকলা এবং শিল্প সম্পর্কে স্বর্গীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যবান আলোচনা ছাড়াও শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীযামিনীকান্ত সেন, শ্রীঅশোক মিত্র এবং শ্রীকানাই সামন্তের উক্ত বিষয়ক গ্রন্থ ও ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্প সম্পর্কীয় শ্রীনির্মল বসুর গবেষণা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যকে মূল্যসমৃদ্ধ করেছে। ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মূল্যবান আলোচনা দেশবাসীর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসে আমাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত বর্তমান থাকতেও ঐ তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখনও উল্লেখযোগ্য বই বাংলায় রচিত হয় নি। Oxford Companion-এর মত অভিধানও বাংলায় নেই। বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করবার প্রয়াস আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য দেশের মধ্যে প্রকৃত প্রজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যাতে করে এ শ্রেণীর জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের চাহিদা বাড়ে। সাহিত্যে এ শক্তির আয়োজন ছাড়া রাশি রাশি রাবিশ গল্প-উপন্যাসের সাহায্যে সাম্প্রতিক সাহিত্যের উন্নতি-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

১১

রম্য রচনা

রম্য রচনা নামে এক শ্রেণীর রচনার প্রাচুর্যে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। অথচ রম্য রচনার স্বরূপ-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয়। এ আলোচনায় আমি তাই রম্য রচনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব।

রচনা মাত্রেরই আঙ্গিকে দুটো করে রূপ থাকে। একটা হল তার বিষয়বস্তু, আর একটা হল তার বলবার ভঙ্গী। যে রচনায় লেখক বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে রচনাকে গুরুগম্ভীর এবং চিন্তা ও মননের সহায়ক করে তোলেন—তাকে বলা যায় বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় রচনা। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করে মানুষের মানসিক দৈন্যকে দূর করাই হল এ ধরণের রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এ ধরণের রচনাকার বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যদেবের মত জ্ঞান বিতরণ করেন, আর পাঠক যেন শিক্ষার্থীর মত তাঁর বক্তৃতা শুনে জ্ঞান আহরণ করেন এবং জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন। এ ধরণের রচনাকে De Quincey-র ভাষায় বলা চলে "Literature of Knowledge"। রচনার মধ্যে এই যে বস্তু সমাবেশ, তা কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল নয়। একটি সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত সীমারেখার মধ্যে সমস্ত বস্তুকে একটা সংহত রূপ দিতে না পারলে তাকে কিন্তু রচনা নামে অভিহিত করা যায় না। এ ধরণের রচনাকে বাংলায় বলা হয় 'প্রবন্ধ', ইংরেজীতে শিথিল ভাবে বলা হয় Essay, কিন্তু সুনির্দিষ্ট অর্থে বলা হয় article, treatise, discourse, dissertation প্রভৃতি। Aristotle যেমন প্রত্যেক চিন্তাপ্রধান রচনাকে আদি মধ্য ও অন্ত সমন্বিত হওয়া উচিত বলে নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরণের রচনায়ও তেমনি তিনটি সুস্পষ্ট অংশ থাকবে। এ ভাবে মানুষের গভীর চিন্তা ও ভাবনা কোন বিশিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করে স্বল্প পরিসরের মধ্যে একটা সুন্দর ও সুসংহত রূপ পেতে পারে। ইংরেজ সাহিত্যিক Saintsbury এ ধরণের প্রবন্ধকে Works of prose art বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

বিষয়বস্তু রচনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ সন্দেহ নেই, কিন্তু হৃদয়গ্রাহী সুন্দর রচনার জন্য শুধু বিষয়বস্তুটাই চরম ও পরম জিনিস নয়। এ পৃথিবীতে বিষয়বস্তু মাত্রই পুরাতন ও সীমাবদ্ধ। সে পুরনো জিনিসগুলোকে "আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে" বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রকাশ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রচনার সৌন্দর্য ও মাধুর্য। এ ধরণের রচনায় ব্যক্তি-চিন্তা বড় কথা নয়, ব্যক্তি-হৃদয়ই হল প্রধান। লেখক এখানে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে তাঁর চারপাশের বস্তুগুলোকে দেখেন। কিন্তু সেগুলোকে গম্ভীরভাবে প্রকাশ করে আপন অন্তরের নিবিড় ভাবরসে রসায়িত করে তার মাধুর্য পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত করে দেন। ফলে পাঠকের অন্তরের চারিদিকে যেন একটা স্নিগ্ধ, শান্ত এবং কমনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। লেখকের অনুভূতিস্নিগ্ধ এ স্পর্শটুকু আরও সরস হয়ে ওঠে উজ্জ্বল হাস্যরসের সংস্পর্শে। এভাবে একটা গুরুতর বিষয়ও লেখকের অকপট হৃদয়ের সম্পর্কে এসে মধুর হয়ে ওঠে এবং পাঠকের অন্তরেও সহজে রস-সঞ্চারে সমর্থ হয়। যে রচনায় বস্তু ও চিন্তার প্রাধান্য, সেখানে লেখকের চেষ্টা থাকে পাঠকের মনের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ। আর যে রচনায় হৃদয়ের প্রাধান্য সে রচনায় লেখকেব চেষ্টা পাঠকের অন্তরের সঙ্গে নিজ অন্তরের আত্মীয়তা স্থাপন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রবন্ধের সঙ্গে উক্ত ধরণের রচনার পার্থক্য মৌলিক। প্রবন্ধ বস্তুনিষ্ঠ, শেষোক্ত ধরণের রচনা বস্তুনিরপেক্ষ নয় কিন্তু ব্যক্তিপ্রধান। প্রবন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ও তার বিস্তার চেষ্টা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় হৃদয়ানুভূতির সাহায্যে নবসৃষ্টির প্রচেষ্টা। এ ধরণের লেখাকে একটা বিশিষ্ট অর্থে নাম দেওয়া যায় রচনা।

ব্যবহারিক অর্থেও রচনা শব্দটি সাধারণতঃ 'নির্মাণ', 'সৃষ্টি', 'গঠন' প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বাস্তবিকই একটা নবসৃষ্টির ভাব যেন রচনা শব্দটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অথচ বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রবন্ধ ও রচনা এ দুটো জিনিসকে একই অর্থে অত্যন্ত শিথিলভাবে ব্যবহার করে থাকি—যেম্নি করে থাকি Article ও Essay-কে একই অর্থে। Essay শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ফরাসী থেকে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী সাহিত্যিক Montaigne-ও এ Essay শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন একটা নূতন ধরণের সাহিত্যসৃষ্টিপ্রচেষ্টা (attempt) বা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Experiment) অর্থে। Montaigne তাঁর রচনাকে বিনয়বশতঃ

নবসৃষ্টি-প্রচেষ্টা বা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ যাই বলুন না কেন, তাঁর রচনাগুলো সাহিত্য-জগতে যে একটা নূতন সুর নূতন আমেজের সৃষ্টি করেছিল—তাতে কোন সন্দেহ নেই। Montaigne-এর অনুসরণে অনেক ইংরেজ লেখক এ নূতন ধরণের রচনা সৃষ্টি করে ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও এখনও কচ্ছেন।

তা হলে প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে মূলগত পার্থক্যটা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখন রম্য রচনার বৈশিষ্ট্য কি তাই আমাদের আলোচ্য :

'রম্য রচনা' কথাটার দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে এও এক ধরণের 'রচনা'। কথাটির চলন হয়েছে ফরাসী belles lettres কথাটির অনুসরণে। Belles lettres কথাটির ইংরেজী অর্থ হল fine letters। বাংলায় অবশ্য 'রম্য' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে—রম্ ধাতু থেকে—যার অর্থ হল ক্রীড়া করা। অর্থাৎ যে কোন একটা বিষয় নিয়ে লেখক রচনা আরম্ভ করতে পারেন। সে বিষয়ের পরিধি আকাশের গ্রহতারকা থেকে পৃথিবীর ধূলিপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কিন্তু বিষয়টিকে রূপ দিতে গিয়ে লেখক যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার না করে নিজের প্রজ্ঞালব্ধ ভাব ও ভাবনাকে ছড়িয়ে দেন নিজের খুশীমত। সে এলোমেলো কথার রাশি লেখকের ভাব ও ভাবনাকে আশ্রয় করে পাঠকের মুগ্ধদৃষ্টির সামনে সৃষ্টি করে এক বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যময় জগৎ। পাঠকের মনে হতে থাকে তিনি যেন কোন নিপুণ যাদুকরের বিস্ময়কর কোন যাদুক্রীড়া দেখছেন। রম্যরচনা-লেখককে এক কথায় বলা যায়—কথার যাদুকর। কিন্তু শুধুমাত্র কথার মায়াজাল সৃষ্টি করে পাঠকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করাতেই কি রম্য রচনার চরম সার্থকতা? রম্য রচনার art কি fine art নয়? Black art মাত্র?

শুধুমাত্র কথার যাদুতেই যদি রম্য রচনা চরম সার্থকতা লাভ করত তা হলে রম্য রচনাকে কোন মতেই শিল্পসৃষ্টি বলা চলতো না—লোকে তাকে fine letters না বলে black art-ই বলত। কিন্তু এ এলোমেলো কথার মধ্যেও সদাজাগ্রত থাকে আকাশের শুকতারার মতো লেখকের স্থিরদৃষ্টি—যা' একটি অদৃশ্য সূত্রের মত এলোমেলো কথার ফুলগুলোকে একত্র বেঁধে রাখে। এ ছাড়া লিরিক ধর্মাক্রান্ত বলে, রম্য রচনার আয়তন অত্যন্ত স্বল্প। লেখকের যদি পরিমিতি বোধ না থাকে তা হলে তিনি আর যাই লিখুন রম্য রচনা কখনও লিখতে পারবেন না। এ সমস্ত কারণে রম্য রচনাকে কেউ কেউ বলেছেন Lyric in prose, আবার কেউ কেউ বলেছেন Lyrical philosophy.

রম্য রচনার বিষয়বস্তুর বিস্তার যেমন অসীম লেখকের কল্পনাও তেমনি সীমাহীন। স্থান থেকে স্থানান্তরে, বিষয় হতে বিষয়ান্তরে, ঘটনা হতে ঘটনান্তরে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত যেমন তাঁর কল্পনা অবাধে পক্ষ বিস্তার করে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কল্পনাকেও তা টেনে নিয়ে যায় সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্যের পথে। ফলে রম্য রচনা পাঠ করে পাঠকের মনও সন্তরণ করে কূলহীন রস-সমুদ্রে। বস্তু আছে অথচ তর্ক নাই, তথ্য আছে অথচ তত্ত্ব নাই,—এ যেন বাধাবন্ধনহীন এক অপূর্ব, মায়াময় জগৎ—শুধু রূপ, শুধু রস, শুধু গন্ধ! এ মালঞ্চে প্রবেশ করে শুধু মাত্র পুষ্পের সৌন্দর্য উপভোগ করো কিন্তু এ অপার্থিব সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন দার্শনিক চিন্তা করো না, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে কোন গভীর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিও না। রম্য রচনার গায়ে মেঘের বর্ণালী বিভা, প্রভাতের শিশিরবিন্দুর সুষমা। যার অন্তরে সৌন্দর্যবোধ তীব্র নয়, তীক্ষ্ণ নয়, রসানুভূতি গভীর নয়—তার পক্ষে রম্য রচনার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে যাওয়া বৃথা।

এত আলোচনার পর এ প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়—রম্য রচনা বোধ হয় কথার যাদুকরের কথার খেলা, বা গদ্য লিরিক কবির কল্পনার লীলা মাত্র। এ ধারণা যদি কারো হয়ে থাকে তিনিও ভুল করবেন। আধুনিক অভিনব বাংলা গদ্য রচনার প্রবর্তক আচার্য প্রমথ চৌধুরী "বাজে কথার ফুলের চাষ" করা যে কতটা কষ্টসাধ্য সে দিকে নব্য-রীতির গদ্য লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বস্তুতঃ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা সুগভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে রম্য রচনা লেখকের পক্ষে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে অবলীলাক্রমে মানসিক চংক্রমণ কখনও সম্ভব হত না। এ ছাড়া একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবদৃষ্টির সাহায্যে রম্য রচনা লেখক যদি সমস্ত বস্তুকে ও ব্যক্তিকে না দেখতে পান তা হলে তাঁর কথাগুলো হয়ে পড়বে Dr. Johnson-এর কথামত—Loose sally of the mind বা একরাশ অজীর্ণ কথা মাত্র।

রম্য রচনা সম্বন্ধে এ আলোচনার আলোকে বিচার করলে সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা রম্য রচনার মধ্যে কটি রচনা রসোত্তীর্ণ হবে তা সুধী পাঠক সমাজের বিচার্য।

১২

লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত

সমকালীন খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ যে সাহিত্যকে জনসভার সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন বাংলার লোক-সাহিত্যকেও তেমনি চিহ্নিত করা চলে জনসভার সাহিত্য বলে। এর কারণ এ শ্রেণীর সাহিত্য রাজ-দরবারের বাইরে জনসাধারণের মধ্য থেকেই উদ্ভূত এবং এ সাহিত্যের শ্রোতা ও রসগ্রাহীও জনসাধারণ। অধুনা অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত হলেও বাংলা দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ শ্রেণীর সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জাতীয়তাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মবহুল জীবনের এক অংশ বাংলা দেশের এই বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য-সংগ্রহকার্যে ব্যয় করেছিলেন—যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সুবিখ্যাত সাহিত্য গ্রন্থ—'লোকসাহিত্য'। প্রকৃতি অনুসারে তিনি এ ধরণের সাহিত্যকে তিনটি সুবিন্যস্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন: (১) ছেলে ভুলানো ছড়া (২) কবি-সঙ্গীত ও (৩) গ্রাম্য সাহিত্য।

কবি-সঙ্গীতের মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর 'লোকসাহিত্যে' লিখেছেন:

"এই নষ্ট পরমায়ু 'কবি'র দলের গান আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ, এবং ইংরেজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌর-জনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই পথ-প্রদর্শক।" (দ্রঃ—লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৩৮ পৃঃ)।

সাধারণভাবে কবি-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে বর্তমান লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত কতকগুলো কবি-সঙ্গীতের সৌন্দর্য নিরূপণ করাই বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য।

কোন্ বিশিষ্ট কালে এ কবি-সঙ্গীতগুলো রচিত হয়েছিল, কোন্ কবি বা কারা এ সঙ্গীতগুলো সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন। কারণ কবিরা এ সমস্ত সঙ্গীত রচনার সন-তারিখ সাধারণতঃ উল্লেখ করেন নি। অনেক কবি সঙ্গীতের শেষে নিজের নামের ভনিতা পর্যন্ত দেন নি। কত কাল ধরে তারা সৃষ্ট হয়েছিল সে সম্বন্ধেও কিছু জোর করে বলা যায় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন:

"বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অত্যন্ত স্বল্প।" (লোকসাহিত্য—রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৩২)।

প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সন্ধিযুগে এ কবি-সঙ্গীতগুলোর সৃষ্টি হবার অনুমান খুবই সঙ্গত বলে মনে হয় এ জন্য যে, ভাববস্তুর দিক দিয়ে এ কবি-সঙ্গীতগুলোর আদর্শ প্রাচীন কিন্তু তাদের বাণী-ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বৈষ্ণব গীতিকাব্যের মত রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার মাহাত্ম্য বর্ণনাই এ সঙ্গীতগুলোর প্রধান উপজীব্য, কিন্তু কবি-সঙ্গীতে বৈষ্ণব কবিদের "সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।" (রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, কবি-সঙ্গীত, পৃঃ ৬৩২)।

কবি-সঙ্গীতে এই অগভীর ভাব এবং গঠনে নিপুণতার অভাবের কারণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"পূর্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য ও নৈপুণ্য ছিল। তখন কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল; তখন গুণীসভায় গুণাকর কবির গুণপনা প্রকাশ সার্থক হইত।"

(লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, কবি-সঙ্গীত, পৃঃ ৬৩২)

কবি-সঙ্গীতে ভাব-গভীরতা বা গঠন-নৈপুণ্যের অভাবের অপর প্রধান কারণ এই যে, এ শ্রেণীর কবিরা বৈষ্ণব-কবিদের মত এত বিদগ্ধ বা ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের মত 'মহাজন' ছিলেন না। অধিকাংশ কবি-সঙ্গীতের কবিই জনসাধারণের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলেন। অতএব তাঁদের সঙ্গীতে বৈষ্ণব-কবিদের ভাব-সম্পদ বা গঠন-নৈপুণ্য আশা করা যায় না। তথাপি কোন কোন কবি-সঙ্গীতের ভেতর ভাব-গভীরতা ও বাণী-ভঙ্গীর বিদ্যুদ্দীপ্তি হঠাৎ পাঠককে চমকিত করে। রবীন্দ্রনাথ যদিও অধিকাংশ কবি-সঙ্গীতে ভাব-গভীরতার অভাব ও গঠন-নৈপুণ্যের শিথিলতা দেখেছেন, তথাপি 'স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতা' দেখে মুগ্ধও হয়েছেন।

এ জনসভার কবিদের কাব্যে বৈষ্ণব-কাব্যের উৎকর্ষ না থাকলেও তাঁরা ছিলেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবিদের উত্তরসাধক। যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি, কেলিকদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর প্রাণমাতানো সুর ও শ্রীরাধার প্রাণের অনন্ত আকৃতি—শুধু মাত্র মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবিদের নয়—এ কবি-সঙ্গীতের কবিদের কল্পনাকেও সমভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। তবে বৈষ্ণব-কাব্যে চিরকিশোর এ দুজন দেব-দেবীর মিলন-বিরহের লীলা নিয়ে যে গভীর তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় অর্ধ-শিক্ষিত কবিওয়ালার কাব্যে সে তত্ত্বের অভাব। তত্ত্বের অভাব হলেও অনেক কবিওয়ালার কাব্যে যে সুন্দর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া এ কবিওয়ালাদের বলা চলে বাঙ্‌লা দেশের খাঁটি "জাতীয় কবি" এবং তাঁদের সঙ্গীতকে আখ্যা দেওয়া যায় খাঁটি "জাতীয় সঙ্গীত"। জাতি বলতে যে রাজনৈতিক নেশন বোঝায় বাঙালীর জীবনে সে রকম চেতনাসম্পন্ন জাতীয়তাবোধ আধুনিক যুগের পূর্বে ছিল না বললেই হয়। বাঙালীর জীবন চিরকালই সমাজ ও ধর্মকেন্দ্রিক। আর ইংরেজদের 'Rule Britannia, Britannia rules the waves-'এর মত কোন সদম্ভ জাতীয় সঙ্গীতও বাঙালীর জাতীয় জীবনে কখনও ছিল না। রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলা নিয়ে বাঙালী কবিদের সঙ্গীতই বাঙালী জাতির চিত্তকে সজীব ও সুস্থ রেখেছিল বহু শতাব্দী পর্যন্ত। শুধু প্রাক্-আধুনিক যুগে কেন, আধুনিক যুগেও দেশের যে সমস্ত অঞ্চল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিদ্যুতালোকে এখনও দীপ্ত হয়ে ওঠে নি, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক এ কবি-সঙ্গীতগুলো এপর্যন্ত সে সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীর চিত্তকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। অতএব কবি-সঙ্গীতগুলো শুধু প্রাক্-আধুনিক যুগের বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত নয়, আধুনিক যুগেও গ্রামীণ বাংলার জাতীয় সঙ্গীত—এক কথায় জাতীয় সম্পদ। জাতি বলতে যদি আমরা নাগরিক বাঙালী ছাড়াও বৃহত্তর পল্লী-বাঙ্‌লার অধিবাসীকেও বুঝি, তা হলে অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত পল্লীবাসীর এ সঙ্গীতগুলোকেও জাতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয় সাহিত্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মনে করব।

বিস্মৃতপ্রায় খাঁটি বাঙালী কবিদের জীবনী এবং তাঁদের সঙ্গীতগুলোকে পুনরুদ্ধার এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যে আমাদের একটা পবিত্র জাতীয় কর্তব্য, সে সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুকবি ঈশ্বর গুপ্তই বোধ হয়

সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সৌন্দর্যমুগ্ধ হয়ে সেগুলো পুনরুদ্ধার ও প্রকাশের কাজে ব্রতী হন। তাঁর এ অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফল ১৩০১ থেকে ১৩০৫ সালের (১৮৯৪-১৮৯৮ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে রচিত হয় তাঁর প্রসিদ্ধ গবেষণাত্মক গ্রন্থ "লোকসাহিত্য"। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এ বিশিষ্ট দিক নিয়ে অনেক আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডঃ সুশীলকুমার দে রচিত *History of Bengali Literature in the Ninteenth Century* এবং অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য কৃত "লোকসাহিত্য"। এখনও বহু কবির ছড়া ও সঙ্গীত বিস্মৃতির অন্ধকারে লুক্কায়িত আছে। অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-প্রেমিকের চেষ্টায় সেগুলোর পুনরুদ্ধার এবং প্রকাশ হলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা বিশেষ দিক যে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে,—তাতে সন্দেহ নেই।

এখানে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। এ লোকসঙ্গীতের সৌন্দর্যমুগ্ধ হয়ে প্রথম যৌবনে এ শ্রেণীর সঙ্গীত সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার এক প্রবল প্রেরণা অনুভব করি। এ উদ্দেশ্য নিয়ে একবার যাত্রা করি চট্টগ্রামের এক পার্বত্য অঞ্চলে কর্ণফুলী নদীব উৎসের দিকে। কৌতূহল ছিল বাঙ্‌লা দেশের সে প্রান্ত-সীমান্তবর্তী স্থানেও লোকসঙ্গীতের সন্ধান মেলে কিনা দেখা। কৌতূহল চরিতার্থ হল যেদিন গেলাম তার পরের দিন সকাল বেলায়। নদীর ধারে একটা জেলে-বাড়ীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে প্রথমে অন্তরঙ্গভাবে মিশলাম। তারপর তাদের কাছে লোকসঙ্গীতের কথা জানতে চাইলে একজন বয়স্ক জেলে যে অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতগুলো আমাকে শোনালে—তা শুনে অবাক হলাম। দেখলাম, সে নিবিড় পার্বত্য অঞ্চলেও অশিক্ষিত জেলের মুখে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের সেই চিরন্তন মিলন-বিরহ সঙ্গীত—যে সঙ্গীত একদিন উৎসারিত হয়েছিল বাঙালী কবির মুখে আরও বহু বছর আগে। এখানেও দেখি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর সুর, শ্রীরাধিকার প্রাণের অনন্ত আকূতি, বৃন্দা সখী ও যমুনাতীরের বৃন্দাবন-পরিবেশ কবির চোখে এক মোহময় স্বপ্নাবেশ রচনা করেছে—যেমন করেছিল বৈষ্ণব কবিদেরও গভীরভাবে ভাবোদ্বেলিত। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর রাধিকার চিত্তে যে ভাবান্দোলন উপস্থিত করেছে—তা যেমন গভীর তেমন মর্মস্পর্শী। শ্রীরাধিকার জবানীতে অশিক্ষিত পল্লীকবি গেয়েছেন:

বাঁশী বাজাইও না,
নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী নাম লইও না।
নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী শুইনতে বিপরীত,
নীরবে বসিয়া আমি শুইনতাম বাঁশীর গীত।
তরল বাঁশের বাঁশী তাতে সপ্ত ভেদা
বাঁশী কেমনে জানে কলঙ্কিনী রাধা।
তরল বাঁশের বাঁশী যে মূঢ়াতে* পাই
কাটারি কাটিয়া বাঁশী সাগরে ভাসাই।
ভাসিতে ভাসিতে বাঁশী ঠেইকল বালুর চরে,
পবনের বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।

এ সঙ্গীতে গঠনের পারিপাট্যের অভাব আছে, কিন্তু ভাবের আবেদন যে অতি সূক্ষ্ম এবং চিত্তস্পর্শী তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে রাধা নামের আহ্বান শ্রীরাধার মনকে বিকল করে তুলেছে। তাই শ্রীরাধিকা যেখানে যত বাঁশী পান তা কেটে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তবুও ত শ্রীরাধিকার নিষ্কৃতি নেই। কাটা বাঁশী সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে বালুর চরে ঠেকেছে। সেখানেও বাতাসের শব্দে বাঁশীর মধ্যে 'রাধা, রাধা' সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী সঙ্গীতে বাঁশীর সুরে তার নাম উল্লেখ না করবার জন্যে করুণ আবেদন জানিয়েছেন শ্রীরাধিকা :—

নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে রে বঁধুয়া
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম॥
শ্রীচরণে হৈলাম গো দাসী
যার নামে বাজাইলাম বাঁশী
গোপীর মন ভুলাতে জান রে বঁধুয়া
আমার পতির এমনি বান,
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।

* চট্টগ্রামের চলিত ভাষায় ছোট পর্বতকে 'মূঢ়া' বলে।

শ্রীকৃষ্ণের এ প্রাণ-ভোলানো সঙ্গীত শ্রীরাধাকে আজ আনমনা করে দিয়েছে। তাই তিনি সখীকে মিনতি করে বলছেন সে যেন বাঁকা শ্যামকে বলে আসে এ অসময়ে বাঁশী বাজিয়ে তিনি যেন তাঁর কুল মান নষ্ট না করে দেন :

সখী কোন্ বনে মুরলীধ্বনি শুনা যায়,
বাশুিল বনকি (?) বংশী বটে জেনে আয়।
সখী কোন্ বনে ইত্যাদি···

সখী তাকে কর গো মানা
অসময়ে রসরাজে বাঁশী বাজায় না।
ও তার বাঁশীর সুরে বৃন্দাবনে
কুলবধূর কুল মজায়,
সখী কোন্ বনে মুরলীধ্বনি শুনা যায়।

নিম্নলিখিত গানেব মধ্যেও সে মনভোলানো বাঁশীর সুরের কথা। সৌভাগ্য-ক্রমে এ গানটির ভনিতায় পল্লীকবি নিজের নামটি জুড়ে দিয়েছেন :

ওহে নিঠুর কালা বাঁকা,
বাঁকা হয়ে মোহন বংশীধারী
তোমার ব্রজের খেলা অপার লীলা
বুঝিতে না পারি ॥

···

(তুমি) কৈরে বংশীর গান হৈরে নিলা প্রাণ
গোকুলে গোপের নারী।
তোমায় গোপকুলে সবাই বলে
মনচোরা হরি।
তোমার সে কালোবরণ ভুবনমোহন
কিবা অপরূপ হেরি।
নিজে জগৎ বলে রূপের ছটায়
ভুলাও পুরুষ নারী ॥

এদিকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে রাধার অন্তরের এ দহন-জ্বালা, অপর

দিকে তার এ বিরহ-ব্যথাকে লক্ষ্য করে কুটিলার কুটিল ইঙ্গিত—এতে অসহ্য হয়ে শ্রীরাধিকা বলছেন :

কুটিল স্বভাব রে তোর গেল না,
তোর জ্বালায় ত ও-কুটিলা
প্রাণ বাঁচে না।

দাদার কাছে সোহাগিনী রে কুটিলা,
কালার প্রেম ত জানিস না,
তোর জ্বালায় ত ও-কুটিলা ইত্যাদি।
কাউয়া* কালা কোকিল কালা,
আঁখির পুতলি কালা,
কালা তোমার অঙ্গের নিশানা,
কালা রূপে জগৎ জোড়া রে কুটিলা
লোকে করে ঘোষণা,
সেই কালার লাগি প্রাণ ত বাঁচে না।

কুটিলার এ কুটিল ইঙ্গিত সত্ত্বেও শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের জন্য তদ্‌গত-প্রাণা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর দুশ্চর তপস্যা পল্লী-কবির লেখনীতে সজীব হয়ে ফুটেছে :

বৃন্দে সই
আইসবে বলি প্রাণ কালিয়া
নিশি জেগে রই।
আজ আইসবে কাল আইসবে বলে
পথ পানে চেয়ে রই।
বুঝি আমার কপাল মন্দ
না আসিল প্রাণ গোবিন্দ,
আমার মনের দুঃখ মনে রইল
তোমায় বিনে কারে কই।

* কাউয়া—কাক, চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত।

পল্লী-কবির রাধা-বিরহের এ তীব্রতা বৈষ্ণব কবির রাধা-বিরহের চাইতে কোন অংশে কম নয় :

সখী তোরা হৈলে মরতিস প্রাণে
যার জ্বালা সে জানে,
আমি আপন জ্বালায় জ্বলে মরি
শ্যাম বঁধুয়ার প্রেম বিহনে।
যার জ্বালা সে জানে॥

পল্লী-কবির রাধা বৈষ্ণব-কবিব শ্রীরাধিকার মতই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভের জন্য কুল-মান-সমাজ প্রভৃতি সমস্তই উপেক্ষা করে :

মবমসখী গো, বলুক লোকে মন্দ
কাব কথা কে শোনে,
আমি ছাড়ব না সই প্রেমলালসা
এবার যদি বাঁচি গো প্রাণে॥

শ্রীবাধাব প্রেম প্রতিদানহীন নয। আর একটি সঙ্গীতে দেখি শ্রীকৃষ্ণের অন্তবেও শ্রীবাধার মত অন্তহীন বেদনা :

বৃন্দে, অন্তরে মোব নাই রে সুখ
কৈতে নাবি ফেটে যাযরে বুক।
আমি বাইএর কারণে বৃন্দাবনে গো
ওগো বৃন্দে, দিয়েছি প্রেমের তমসুক।

বাই-এর জন্য শ্যামের ব্যাকুলতাবও সীমা-পবিসীমা নেই। শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে শ্রীরাধার কুঞ্জে যাবেন সে জন্য পায়ের নূপুরকে সকরুণ মিনতি জানাচ্ছেন—নূপুর যেন কোন শব্দ না করে :

তোরে বলি ওরে নূপুর
উম্নুর ঝুম্নুর না বাজিও পায়*

* উম্নর ঝুম্নর—রুনু ঝুনু অর্থে—চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত

নিঃশব্দ হইয়া থাক
আমি রাধার কুঞ্জে যাই।
ও প্রেমময়ি রাই।

শ্রীরাধায় বৃন্দাবনের কোন কোন সখী তার কাছে এসে জানিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ তার অজ্ঞাতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অভিসার করে। এ সংবাদ শুনে শ্রীরাধিকার অন্তরে অভিমান জেগেছে। মান ভাঙাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট আপন হৃদয়ের গোপন কথা নিবেদন করছেন :

চিত্তধৈর্য্য ধর রাধে প্রেম রাইখ গোপনে
প্রেম রাইখ গোপনে রাধে ।
প্রেম রাইখ গোপনে।
যাই না চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাধে
মিছা কেন বলগো তুমি,
জন্মে জন্মে আছি বাঁধা
শ্রীচরণ কমলে।
রাধে গো প্রেম রাইখ গোপনে ॥
স্নান করি বসি গো ধ্যানে,
মূলমন্ত্র জপি তোমার নাম
মন জানে প্রাণ জানে আমাব
বিচ্ছেদ জানে।
চিত্তধৈর্য্য ধর রাধে (ধুয়া)।

আমার সংগৃহীত পল্লী-গীতির কয়েকটি মাত্র এখানে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হল। এরূপ মর্মস্পর্শী সঙ্গীত বাঙলার মাঠে ঘাটে অশিক্ষিত পল্লীবাসীর কণ্ঠে নিত্য-নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে। যাঁদের অনুভূতিশীল অন্তর আছে, পল্লীতে গেলেই তাঁরা এ ধরণের সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নেই।

পাঠক এ সমস্ত সঙ্গীতের ভেতর লক্ষ্য করবেন যে, এর মধ্যে ঘটনা সন্নিবেশের অভিনবত্ব নেই, কাহিনীর বিস্তৃতি বা প্রসার নেই কিন্তু এ সঙ্গীতগুলোর বিষয়বস্তুর মূলে আছে বাঙালীর ভাবকল্পনার চিরন্তন বৃন্দাবন, কলস্বিনী যমুনা, কেলিকদম্ব এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সে সনাতন লুকোচুরি খেলা। পল্লী-কবির

এ সঙ্গীতগুলো বৈষ্ণবকাব্যের মত এত ভাবরস-নিবিড় না হলেও একেবারে ভাব-সম্পদহীন—এ কথা কোন মতে বলা চলে না। তাদের রস-সংবেদনা বাঙালী-চিত্তে চিরন্তন। এ জন্যই এ সমস্ত সঙ্গীত সাধারণ বাঙালী-চিত্তকে স্পর্শ করেছে বহুকাল ধরে। এ ধরণের সঙ্গীত রচনা এবং গান করে বাঙালী বহুকাল যাবৎ অন্তরে পেয়েছে অনাবিল সুখ শান্তি ও আনন্দ। এমন কি এখনও পর্যন্ত এ ধরণের সঙ্গীতের আবেদন পল্লীবাসী বাঙালীর চিত্তে ফুরিয়ে যায় নি। সে জন্য বলছিলাম, এ শ্রেণীর সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক অমূল্য ও অবিনশ্বর সম্পদ।

পূর্ব কথার প্রতিধ্বনি করে আবার বলি, পল্লী-কবির এ সমস্ত সঙ্গীত শুধুমাত্র বাঙালীর মর্মসঙ্গীত নয়,—বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীতও বটে। শিক্ষিত বাঙালী যদি nationalism-এর যথার্থ অর্থ বোঝেন তা হলে তাঁরা এ শ্রেণীর সঙ্গীতের আদর করতে শিখবেন এবং সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হবেন।

কিন্তু এ হল গবেষক পণ্ডিত এবং সহানুভূতিশীল স্বদেশপ্রেমিকের কাজ। এখন দেখা যাক লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে আধুনিক কবিরও কোন কর্তব্য এবং ভূমিকা আছে কিনা?

যুগ পরিবর্তন এবং সমাজক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কবির কাব্যাদর্শ, কাব্যরীতি, ও কাব্যবস্তু পূর্ব যুগ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ব্যাপক ধর্মবিশ্বাসের স্থান গ্রহণ করেছে আজ কবির ব্যক্তিচেতনা। ফলে এ যুগের কাব্য ব্যক্তিমনের বিচিত্র প্রকাশে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলেও সার্বজনীন আবেদন হারিয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক কবির বিচিত্র 'মুডে'র অভিব্যক্তি মাত্র। শুধু পল্লীবাসী স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণ নয়, কাব্যপ্রিয় শিক্ষিত নাগরিকও সে কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারছেন না। কবিকে আজ নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে কবিতার বই ছাপাতে হয়, তারপর ডাকব্যয় বহন করে পাঠকের নিকট সে বই পৌঁছিয়ে দিতে হয়। তবুও পাঠক সে কাব্যের বই পড়েন না। ইচ্ছা থাকলেও সময় নেই, সময় থাকলেও মর্জি নেই। প্রকাশকের কাউণ্টারে, দপ্তরীর গুদামে সে বই পোকায় কাটে, ফুটপাথে ধূলিধূসরিত অবস্থায় কবির ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা অসহায় আর্তনাদ করে। পুরাতন বইয়ের শিকার-সন্ধানীরাও সে বই হাতে তুলে নেন না। পরে হয়ত সে বই ওজন দরে বিক্রী হয় এবং ঠোঙাতে রূপান্তরিত হয়ে মুদির দোকানে আশ্রয় পায়।

এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি সকল কবির কাব্য সম্পর্কে সত্য না হলেও অধিকাংশ কবির বেলাতেও যে সত্য—এতে কোন সন্দেহ নেই। এর একমাত্র কারণ জন-জীবনের সঙ্গে আধুনিক কবির সংযোগ বিচ্ছিন্নতা—যে বিচ্ছিন্নতার কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে নিজের কাব্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত করে গেছেন।

কবিকে আবার পূর্বগৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে বুদ্ধির অভিমান ছেড়ে লোকসঙ্গীতকারদের মত ব্যাপক সহানুভূতির অধিকারী হতে হবে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও বিচিত্র বেদনাকে রূপ দেবেন তাঁরা বোধগম্য ভাষায় এবং চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে। তাঁদের কাব্যবস্তু সাময়িকতার চিহ্নাঙ্কিত হতে পারে, কিন্তু কাব্যপ্রকাশে এবং কাব্যের অন্তর্নিহিত সুরে থাকবে সার্বজনীন এবং শাশ্বত আবেদন—যেমন ছিল ভিন্নতর জীবনের প্রেক্ষাপটে পূর্বযুগের বাঙালীর লোকগাথায় এবং লোকসঙ্গীতে। এর পরও হয়ত আধুনিক কবিতা লোকসাহিত্যের মত সর্বলোকাশ্রয়ী হবে না; না হবার কারণ, বর্তমান যুগটাই হল কর্মব্যস্ততার যুগ—কাব্য উপভোগের যুগ নয়। তা হলেও আধুনিক বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তা যে বাড়বে এতে সন্দেহ নেই। সমাজে কবিদের লুপ্ত মর্যাদা আবার ফিরে আসবে।

এ প্রসঙ্গে চিন্তাশীল লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিত এবং ১৩৫৮ সনে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা' নামক প্রবন্ধটির প্রতি আমরা কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পরিশিষ্ট

বাংলা সাহিত্যে শশাঙ্কমোহন সেন

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সমস্ত সাহিত্য-সাধকের অক্লান্ত সাধনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য নবজীবনের তোরণপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল, কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন তাঁদের অন্যতম। প্রতিভার সঙ্গে নিষ্ঠা যুক্ত হলে লেখকের রচনা যে কতখানি শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবি-ভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেনের কাব্য, নাটক ও সমালোচনা। বিশেষ করে শশাঙ্কমোহনকে বলা চলে আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য নির্মাতাদের একজন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, বঙ্গবাণীর এ একনিষ্ঠ সাধকের বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম আজ বিস্মৃতপ্রায়। এ প্রতিভাবান সাহিত্যসেবীর জীবন-সাধনা ও ক্লান্তিহীন সারস্বত-সাধনাকে আধুনিক সাহিত্যামোদীর সামনে তুলে ধরাই বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য।

ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন

শশাঙ্কমোহনেব জীবনের বিস্তৃত পরিচয় কোথাও তেমন দেখা যায় না। কবির সহধর্মিণী মণিকুন্তলা সেনের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা, ১৩১৫ সালে শ্রীযুক্তা সেন লিখিত 'স্বামীকথা' নামক পাণ্ডুলিপি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৎসরের ক্যালেণ্ডার এবং কবির কৃতী ছাত্র প্রথিতযশা অধ্যাপক (বর্তমানে অধ্যক্ষ) শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে আমি যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি—সংক্ষেপে এখানে তার বিবরণ দিচ্ছি।

শিক্ষাজীবন ও বিবাহ

চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাট গ্রামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই বৈদ্যবংশে শশাঙ্কমোহনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ব্রজমোহন সেন। শঙ্খনদীর নিকট ফরেস্ট-আপিসে তিনি ফরেস্টারের কাজ করতেন। তাঁর কাব্যপ্রীতি গভীর ছিল। শশাঙ্কমোহনের বাল্যশিক্ষা হয় গ্রামের স্কুল ধলঘাটে। অতঃপর চট্টগ্রাম শহরের কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯০ সনে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয়

বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়বার সময়েই তাঁর কাব্য-প্রতিভা প্রাথমিক স্ফূর্তিলাভ করে। শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেনের 'স্বামীকথায়' লিখিত আছে :

"১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আমি প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়িবার সময় 'স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে' কাব্যের মূল পত্তন করি ও রচনাতেও কিয়দ্দূর অগ্রসর হই; তখন ওই কাব্যের নাম 'শ্রীমতী ও রাধা' দিয়াছিলাম। ওই কাব্যের চতুর্থ সর্গে শ্রীমতী কৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একাগ্র ধ্যানস্থা হইয়াছে, তাহার ইন্দ্রিয় লয় হইয়াছে; অপর ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার রহিত হইয়া কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ে পর্যবসিত হইয়াছে, এই ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া আমি লিখিয়াছিলাম—

স্নমুখী যে মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে
ভুলিলা পৃথিবী তারা স্বচন্দ্র গগন—
শ্রোত্রত্বক ইন্দ্রিয়াদি পড়িল ঘুমায়ে,
জাগিয়া রহিল শুধু দুইটি নয়ন।

ইহা কবিতা নহে—একটা ভাবের বিবৃতি মাত্র। তবু তিন বৎসর পরে কালিদাসের কুমারসম্ভবের শিবের বিবাহ অভিযানে পুরস্ত্রীবর্গের ব্যাপার বর্ণনায় একটি শ্লোকে ঠিক এই ভাবটিই পাইয়া যে কতদূর ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব ?" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ১৪৮-১৫০)।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কমোহন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পড়বার সময় তিনি চট্টগ্রাম কেলিসহর গ্রামের সরলতা নামে একটি কিশোরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।[১] কয়েক বৎসর পরে তাঁর প্রথমা পত্নী একটি কন্যা-সন্তান রেখে মারা যান। তারপর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রিপন কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম জজকোর্টে ওকালতি করতে শুরু করেন।[২] ওকালতি করবার সময় তিনি চট্টগ্রামের কোয়েপাড়া-নিবাসী অন্নদা দাসের কন্যা মণিকুন্তলা দাসের

১ মণিকুন্তলা সেন—স্বামীকথা

২ উপরোক্ত পরীক্ষাগুলোতে শশাঙ্কমোহনের উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৎসরের ক্যালেণ্ডার থেকে প্রাপ্ত।

পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী এখনও জীবিত এবং কলকাতায় বসবাস করেন। উচ্চশিক্ষিতা না হলেও তিনি অত্যন্ত চর্চাসম্পন্না এবং উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির অধিকারিণী। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে স্বামীর নির্দেশে তাঁর রচিত 'স্বামীকথা' নামক পাণ্ডুলিপিখানি কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহনের বিস্মৃতপ্রায় জীবনের ওপর নতুন আলোকপাত করে। শশাঙ্কমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র পুত্র বর্তমানে অসুস্থ ও বেকার। কবি-জায়া তাই অত্যন্ত দুস্থ জীবন যাপন করছেন।

কর্মজীবন

বাল্যাবধি কাব্য-প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শশাঙ্কমোহন কেন জীবিকা হিসেবে আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন সে সম্পর্কে তিনি তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সেনকে বলেন :

"......সত্য বটে, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা সর্বাংশে আমার জীবনের আদর্শের অনুকূল নহে। সকল দিক চিন্তা করিয়াই এই ব্যবসায় ধরিয়াছি। গভর্ণমেন্টের চাকরী চিরকাল আমার পক্ষে ঘৃণাবহ; উহা আমার মনের স্বাস্থ্য ও আত্মার রক্ষা বিষয়ে নিঃসন্দেহে মারাত্মক হইত। শিক্ষকতাও বহু স্থলে বাঞ্ছনীয় নয়।...পরিশেষে, নানা দ্বৈধবশে, যেন ভগবৎ কৃপাতেই বর্তমান ব্যবসায় জীবিকোপায় স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যবসায় ক্রমে দাক্ষিণ্যযুক্ত ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া আমার জীবনের চিরজন্মপোষিত আদর্শের সহায় হইতেছে। বলিতে কি, আমি এখন স্বীয় জীবনের বহু বহু আপাতদৃষ্ট বিরোধের মধ্যেও এক সুদূর ঐক্য ও অপরূপ কল্যাণপ্রসঙ্গ দেখিতে পাইতেছি।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ৮০-৮৪)

উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে তৎকালে অপেক্ষাকৃত সুলভ অথচ সম্মানজনক সরকারী চাকরির মোহ ত্যাগ করা নিঃসন্দেহে শশাঙ্কমোহনের স্বাধীন চিত্তের পরিচায়ক। শশাঙ্কমোহনের সাহিত্য-চিন্তা ও সাহিত্য-সমালোচনার মূল সূত্র অনুসন্ধান করলেও সর্বত্র এই স্বাধীন চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাবে।

আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম না হলেও শশাঙ্কমোহন মোটামুটি সচ্ছল অবস্থাতেই কাল কাটাচ্ছিলেন। বস্তুতঃ অপর্যাপ্ত ধনাগম কখনও তাঁর কাম্য ছিল না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদ মানুষকে স্ব-ধর্মচ্যুত করে, আত্মার বিনষ্টি সাধন করে। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সেনকে বলছেন :

"বিধাতা যে আমাকে এতদিন অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ প্রদান করেন নাই, যথেষ্ট গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র জোগাইয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট হইতে শিখিতেছি। প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত হইলে আমার কি অবস্থা ঘটিত! আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রথম যৌবনের ইন্দ্রিয়গত সুখে নানা দিকে নানা মতে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতাম ; কেন না আমার চরিত্রে ভাবোন্মত্ততার উপাদান প্রচুর। আমি সমস্ত সংযমরজ্জুর পাশচ্ছেদ করিয়া নিঃসংশয় উৎকট স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া পড়িতাম।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ৮৪-৮৫)

সাহিত্যসেবার প্রথম পর্যায়

শুধু জীবনের ক্ষেত্রে নয়, কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও এই অর্থের প্রাচুর্য কাব্যের উৎকর্ষের কতটা অপহ্নব ঘটাতে পারে তাব সম্ভাবনা সম্বন্ধে শশাঙ্কমোহন তাঁর স্ত্রীকে বলছেন :

"অন্ততঃ পক্ষে আমার 'সাবিত্রী' 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' 'ছায়াজীবন' ও 'ব্যোমসঙ্গীত' আরও পাঁচ বৎসর পূর্বে মুদ্রাঙ্কিত হইত। এই কথা চিন্তা করিলে আমার মনে যে কিরূপ একটা আশঙ্কা ও তৃপ্তির যুগপৎ সঞ্চার হয় তাহা তুমি এখনও প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। উহাদের মধ্যে অনেক দোষ-দৈন্যই থাকিয়া যাইত।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ৮৫)

সাহিত্যরচনায় আদর্শবাদ

গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব পরিবেশে বাস করেও যে প্রবল আদর্শবাদ শশাঙ্ক-মোহনকে প্রচুর অর্থ উপার্জনের লোলুপতা পরিহার করতে সহায়তা করেছিল, সে আদর্শবাদই কবিকে প্রেরণা দিয়েছিল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অমরতার সাধনা করতে। এ সম্পর্কে 'স্বামীকথা'য় শশাঙ্কমোহনের মতামত নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত হয়েছে :

"......অনন্ত কাল ও বিপুলা পৃথিবীর এই বৃহৎ রঙ্গভূমিতে কবি বীণা বাজাইতেছেন। আপন অবস্থা সম্যক্ চিন্তা করিয়া যিনি প্রকৃত অমর রাগিণী আলাপ করিতে পারিবেন, তাঁহারই জয়। ইহার জন্য নিরাকুল ধ্যান ও দীর্ঘকালব্যাপী তদ্গত সাধনা অপরিহার্য। যাহা ক্ষণেকের সৃষ্টি তাহা ক্ষণস্থায়ী। কালপ্রবাহের ঊর্ধ্বে উঠিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিলে অহর্নিশি অক্লান্ত ঊর্ধ্বগতি ও দৃষ্টি স্থির রাখিতে হয়। একদিনে সৃষ্টি করিলেও ছয়দিন বসিয়া

তাহার সমীক্ষণ ও অনুরঞ্জন করিতে হয়। অসূয়া ও অনুকরণের লোলুপ লালসার কর্ষণা হইতে তাহাকে দুষ্প্রাপ্য ঊর্ধ্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। কবিকৃতির মাহাত্ম্য ও স্থায়িত্ব বিষয়ে এ কয়টি গুণ অপরিহার্য, প্রথম হইতেই আমার এই ধারণা ছিল।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ৮৫-৮৬)

এ অমরতার সাধনাই শশাঙ্কমোহনের চিত্তে এনে দিয়েছিল সাহিত্যসাধনায় একাগ্র নিষ্ঠা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ। তাঁর অনুভূতির গভীরতার মূলেও এ অমরতার সাধনা। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় নির্ভীক ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উৎসও এ প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ। 'স্বামীকথা'য় এ সম্পর্কে শশাঙ্কমোহনের কথার অনুবৃত্তি দেখা যায় এ ভাবে :

"সংসার-উদ্যানে আপন সাধর্ম্যে সর্বতোভাবে ফুটিয়া উঠিব ইহাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। নির্গন্ধ জবাফুল হইলাম তাহাতে ক্ষতি নাই; আমার অন্তরগত সমগ্র শোণিতরাগ যদি প্রকটিত করিতে পারি, নিজের সমস্ত দুরাশা ও অক্ষমতা যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। মানুষের সমস্ত অপূর্ণতার মধ্যেও এক অপূর্ব সফলতা আছে, যতক্ষণ সে আপন অপূর্ণতাকে পরম পূর্ণের সমক্ষে আকুল তৃষ্ণায় নিরাবৃত করিতেছে। কবির জীবনেও কাব্যপ্রচেষ্টা এইরূপ একটা আকুল ঊর্ধ্বমুখ বিলাপ মাত্র। ইহার ভিতর যে আনন্দ নাই এমন নহে, কিন্তু সেই আনন্দ ঊর্ধ্বমুখা তৃষ্ণা এবং নিষ্ফলতার আনন্দ। এ নিষ্ফলতার মধ্যেই সংসারে কবিজীবনের সফলতা। হৃদয়েব সেই তৃষ্ণাকে বাণীমুখে বিবৃত করাই আমার কবিতা।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ৮৮-৮৯)

কাব্যরচনার উৎস

কাব্যরচনার ক্ষেত্রে এ সুউচ্চ আদর্শের অনুস্মৃতি ও প্রখর সৌন্দর্যচেতনা শশাঙ্কমোহনের কবিচিত্তে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিল। প্রকৃতির উদার বিস্তৃতি, চট্টগ্রামের শৈলমালা ও অনন্তবিস্তৃত সমুদ্র শশাঙ্কমোহনের কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা। চট্টগ্রামের নৃত্যরতা সুন্দরা কর্ণফুলী নদীও কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করতে কম সহায়তা করে নি। এই কর্ণফুলীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্ত্রীকে একখানা পত্রে লিখছেন—

"আসিতে আসিতে কর্ণফুলীর জলের উপর সূর্য-কিরণের মিলনসৌন্দর্যটা দেখিয়া লইও। দেখিও কেমন ঢেউগুলি উজ্জ্বল মুখে কিরণের চুমো খাইয়া

নাচিতেছে। দেখিও কেমন নীলাকাশ শান্ত নয়ন মেলিয়া চিরকাল চাহিয়া আছে। বিশ্বজগৎ প্রেমের সৃষ্টি—স্রষ্টার অসীম প্রেমের খেলা।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ৫৮)

প্রথম কাব্য প্রকাশ—সিন্ধুসঙ্গীত ও শৈলসঙ্গীত

এ সুগভীর নিসর্গপ্রীতি এবং মানবপ্রেমের ফল এ সময়ে রচিত কবির 'সিন্ধুসঙ্গীত' (১৩০২ বাং ১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ) এবং 'শৈলসঙ্গীত' (১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ)।

আরও কাব্য ও নাট্যকাব্য প্রকাশ

এ দুখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য ছাড়াও তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, 'সাবিত্রী' নামক বিখ্যাত নাট্যকাব্য এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' নামক তত্ত্বসমৃদ্ধ কাব্যখানি প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি 'রূপসুন্দরী' নামক একখানি কাব্য এবং 'স্বপ্নপুরী' ও 'বিশ্বামিত্র' নামক দুখানি নাট্যকাব্যও রচনা করেন। এ তিনখানি গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত। 'বিশ্বামিত্র' নামক নাটকখানি কবির প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কবির মৃত্যুর পরে 'অঞ্জলি' নামক মাসিকে প্রকাশিত হয়।

সুগভীর নিসর্গপ্রীতি যে শশাঙ্কমোহনের মনকে একটা অন্তহীন আনন্দের রাজ্যে উপনীত করত তার পরিচয় আছে শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেনের 'স্বামীকথায়':

"নির্জনে বসিয়া সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে মনকে ডুবাইয়া দিলে একটা অপরূপ আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিলেই দেখিবে, সন্ধ্যার হৃদয় আছে।...সেইদিকে মনকে সমাহিত করিতে পারিলেই মন অবিলম্বে অন্তর্বর্তী আনন্দ-সিন্ধুর তীরে যাইয়া উপনীত হয়।...আমি শৈশব হইতেই এই আনন্দ লুকাইয়া চুরি করিতাম।...নির্জনে বসিয়া এই অপূর্ব রসানন্দে মজিয়া পাগলের মত কাঁদিতাম।...আমার সমগ্র 'শৈল-সঙ্গীতে' বিশেষতঃ উহার ধ্যানভাগে তুমি ইহার পাগলামির ইশারা পাইবে।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ১৭-১৯)

সাহিত্যচর্চা—স্বদেশ চট্টগ্রামে

চট্টগ্রামে আইন ব্যবসা করার সময় শশাঙ্কমোহন যে শুধু কাব্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তা নয়, একজন বিদগ্ধ পাঠক হিসেবেও তিনি চট্টগ্রামের সাহিত্য-অনুরাগী মহলে পরম শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। এ সময় তিনি দেশীয় ও পাশ্চাত্য বহু কবি-মনীষী ও সাহিত্যিকের রচনা গভীর অনুরাগের সঙ্গে পাঠ করেন এবং সাহিত্যের মূল নীতি ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন। 'স্বামীকথা'র পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, এ সময় তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস,

ব্রাউনিং প্রভৃতি ইংরেজ কবি, গেটে, হুগো, বিরেঞ্জার প্রভৃতি কন্টিনেন্টাল কবি-সাহিত্যিক, এবং মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বাঙালী কবির রচনা অত্যন্ত গভীরভাবে পাঠ করতেন। প্রগাঢ় সাহিত্য অনুশীলনের ফলে কোন কোন খ্যাতিমান লেখকের রচনা সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা হয় তিনি সে ধারণাকে প্রবন্ধাকারে লিখে চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের সভায় মাঝে মাঝে পাঠ করতেন।

প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ—বঙ্গবাণী

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কমোহন তাঁর বিভিন্ন সময়ে রচিত সাহিত্য-সমালোচনাকে একত্র গ্রথিত করে 'বঙ্গবাণী' নামক সুবিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ সমস্ত সমালোচনাত্মক প্রবন্ধে শশাঙ্কমোহন যে মননশীলতা, পাণ্ডিত্য, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারপদ্ধতির পরিচয় দেন তা অবিলম্বে সমকালীন বিদগ্ধ বাঙালী সাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরূঢ়। শশাঙ্কমোহন যদিও রবীন্দ্রনাথের কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন, তথাপি স্বাধীন সাহিত্যবিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করেন নি। 'বঙ্গবাণীর' অন্তর্গত "রবীন্দ্রনাথের শিল্পদোষ" নামক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন :

"রবীন্দ্রনাথ সার্থককর্মা কবি,...তাঁহার কবিতা ভাবতত্ত্বে ও মাধুর্যগুণে গরিষ্ঠ, কিন্তু সর্বত্র সম্পূর্ণ সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পেশল নহে।...সেক্ষপীয়র কিংবা স্কট, বাল্মীকি, কালিদাস কিংবা গ্যয়টে, শীলার বা হুগোর মধ্যে যে অনুপাতে বস্তুতন্ত্র বা ভাবের ন্যূনাধিক সামঞ্জস্য আছে, রবীন্দ্রে তাহা নাই। সুতরাং এই কবি মানব-হৃদয়ের একান্ত নির্ভরকল্পে বা সর্বাঙ্গীণ শ্রেয় এবং স্বাস্থ্যকল্পে স্বয়ং পর্যাপ্ত নহেন। অনবধানে বা অসতর্কভাবে এ জাতীয় কবির সাহচর্য অবলম্বন করিলে নানা দিকে বিড়ম্বিত হইতে হয়; অবাস্তব ভাবুকতা, সংসার সম্পর্কহীন দার্শনিকতা এবং অভিমানে আক্রান্ত হইতে হয়।"

শশাঙ্কমোহনের সাহিত্যাদর্শ

সাহিত্যাদর্শের দিক দিয়ে শশাঙ্কমোহন ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান। তাই মাইকেলের কাব্যের ওপর পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব কিংবা

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রধান ছায়াময় ভাবকল্পনা শশাঙ্কমোহনের তীব্র সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

সমালোচনা—বিশ্লেষণধর্মী

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন, সাহিত্যবিচারে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যাদর্শের অনুসরণের ফলেই শশাঙ্কমোহন মাইকেলের কবিকৃতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন নি, যেমন পেরেছেন তাঁর প্রায় দুই দশক পরে কবি-সমালোচক মোহিতলাল। তবে শশাঙ্কমোহনের সমালোচনা যে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সাহিত্যধর্ম বিচারে। এ বিশ্লেষণধর্ম রবীন্দ্র-কাব্যবিচারে আরও প্রত্যক্ষ :

"...তারপর রবীন্দ্রনাথ। এই কবির প্রকৃতিতে নানা প্রকৃতি ব্যামিশ্র হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে শেলীর শিষ্য ছিলেন ; শেলীর মত অরূপ ও ভাবানন্দী কবিতা লিখিতেন। আকার পরিত্যাগ করিয়া নিরাকারে, নির্দিষ্টকে ছাড়িয়া অনির্দিষ্টকে, বিশেষকে বর্জন করিয়া সামান্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্রোতোমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। প্রাচীনদের অনুবর্তনে শেলীর কবিতায় তবু কিছু কিছু নির্দিষ্টের, বিশিষ্টের ও আকারের কাঠামো ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাহাও বহুশঃ অগ্রাহ্য করিয়া ভাবের ব্যাখ্যান ও ব্যবকলনে কবিতা লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি এই বিষয়ে শেলীকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। একই "আমির" মুখে জাতিবর্ণহীন প্রেমের ও প্রেমাত্মক ব্যভিচারী ভাবের কবিতা।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ১৮২-৮৩)

শশাঙ্কমোহনের উক্ত আলোচনা পাঠে দেখা যাবে, বাংলা সমালোচনা ব্যক্তিপ্রধান রীতি ছেড়ে তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক রীতিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। তবে সাহিত্যে একমাত্র ক্লাসিক আদর্শের উপাসক হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনায় যে বিশ্বচেতনার ইঙ্গিত আছে, শশাঙ্কমোহন তার মর্মোদ্ঘাটন করতে পারেন নি। সেজন্য রবীন্দ্র-কাব্যবিচারে শশাঙ্কমোহন বহুস্থলে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। রবীন্দ্র কাব্যের সূক্ষ্ম কলাবিলাস বা সূক্ষ্মতর ভাবব্যঞ্জনা ক্লাসিক আদর্শভক্ত শশাঙ্কমোহনের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে নি (শুধু তাঁর কেন, সে যুগের আরও কোন কোন সাহিত্যিকের নিকটও এ ভাবময় নির্বিশেষের সাধনা কঠোর সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল—যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট)

নির্বিশেষের লক্ষ্য ছেড়ে প্রত্যক্ষ বাস্তব বাঙালীজীবনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যখনই শিল্পসৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তখনই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টা বলে মনে হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি শ্রীযুক্তা সেনকে বলছেন :

"...যা হোক, ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে,...কেন না তিনি ক্রমে প্রাচীনরীতির নিকটবর্তী হইতেছেন। নানা স্থলে 'সামান্য'কে বর্জন করিয়া বিশিষ্টের ভিত্তির উপর কাব্য-রচনাকে পছন্দ করিতেছেন বুঝিতে পারা যায়। শুভযোগে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অতর্কিতে তাঁহার কবিতাপ্রণালীতে এক মহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতর্কিতে—কেননা রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃ কাব্যরচনায় কোনরূপ art বা শিল্পবিজ্ঞান বা শাস্ত্রবিধানের পক্ষপাতী নহেন বলিয়াছি।...কিন্তু প্রাগুক্ত মতে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ক্রমে প্রকৃত জীবনের ও বিশিষ্টের অনুচিন্তনে প্রবৃত্ত হন। উহার ফলে 'চৈতালী'তে ও 'চৈতালী'র পরবর্তী বহু গীতিকবিতায় রবীন্দ্রনাথের বীণা যেন অদৃশ্য মেঘলোক হইতে নামিয়া আসিয়া স্বদেশের পরিচিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও তরু-আচ্ছন্ন পল্লীপথে বাঁশীর সুরে গান ধরিয়াছে। কবির রচনারীতির এই পরিবর্তন বিশেষ প্রণিধানের বিষয়।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ১৮৫-১৮৭)

শুধু মণিকুন্তলা সেনের অপ্রকাশিত 'স্বামীকথায়' নয়, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গবাণীতে'ও রবীন্দ্রমানস, রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনা সম্পর্কে শশাঙ্কমোহনের অনেক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত আলোচনা পড়ে সমসাময়িক বাঙালী পাঠকের ধারণা হয় যে, বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের এক্জন চিন্তা-বিচারশীল ও প্রতিভাবান সমালোচকের আবির্ভাব হয়েছে।

নাট্যপ্রয়াস

চট্টগ্রামে বাসকালে শশাঙ্কমোহন 'সাবিত্রী' নামক একখানি নাটক রচনা করেন (১৩১৬ বাং, ১৯০৯ খ্রীঃ অঃ)। 'সাবিত্রী' নাটকে "পতি-পত্নীর যোগের কথা" ব্যক্ত হয়েছে।

"সেই বিষয়ে ("পতি-পত্নী যোগে") এই গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে আভাস দিয়াছি। কাব্যত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাই উহার প্রণালী স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই। তথাপি মনোযোগ দিয়া পড়িলে ইহাতেই অনেক কথা পাইবে।

সাবিত্রী কিরূপে পতিযোগিনী ও পতিপ্রাণা হন এবং একপ্রাণতার দরুন মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সক্ষম হন, পুরাণাদিতে তাহাব প্রণালী কিছুমাত্র উল্লিখিত নাই।...এই গ্রন্থ আমি ঐকান্তিক ধ্যান ও কবিকল্পনার সাহায্যে লিখিতে পারিয়াছিলাম।" ('স্বামীকথা'—পৃঃ ৮-৯)

'সাবিত্রী' নাটক ছাড়া 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' কাব্যখানিও চট্টগ্রাম বাসকালে বচিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

'বঙ্গবাণী' প্রকাশেব বৎসব চাব পরে অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃভাষা-প্রেমিক সাব্ আশুতোষেব চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে ভাবতীয ভাষা বিভাগ খোলা হয। তখন উক্ত বিষয়ে স্নাতকোত্তব বিভাগে অধ্যাপনা কববার জন্য উপযুক্ত লোকেব অভাব খুবই অনুভূত হতে থাকে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রেসিডেন্সি কলেজেব প্রথিতযশা ইংবেজীব অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অভযচন্দ্র গুহ, বসন্তবঞ্জন বায়, সুশীলকুমাব দে, সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায, যোগীন্দ্রনাথ বসু, বিজযচন্দ্র মজুমদাব, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায প্রমুখ কযেকজন মাত্র শিক্ষক নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগেব কাজ শুরু হয।[১]

'বঙ্গবাণী' প্রকাশিত হবার পব এ কাজেব জন্য একজন উপযুক্ত লোক হিসেবে শশাঙ্কমোহনেব উপর গুণগ্রাহী আশুতোষেব দৃষ্টি পড়ে। তিনি আব কালবিলম্ব না কবে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কমোহনকে বাংলা বিভাগেব লেকচাবাব পদে নিযুক্ত কবেন।[২]

গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা (১৯২২-২৩)

পাণ্ডিত্যেব স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক পদ লাভেব দুই বৎসব পবে ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দেব জন্য শশাঙ্কমোহন বিশ্ববিদ্যালযেব "গোপালদাস চৌধুবী লেকচাবার" পদে বৃত হন।[৩] এ সম্মানজনক কাজে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তেব কবিমানস ও কাব্যধর্ম বিশ্লেষণ কবে বিশ্ববিদ্যালযে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তাঁব বক্তৃতা শুনে সকলে অনুভব কবেন যে ইতিপূর্বে বাংলা

১ দ্রঃ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন—ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৬৪।

২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি বর্তমানে রেজিস্ট্রাব অধ্যাপক শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রদত্ত সংবাদ।

৩ Minutes of the Syndicate, 1922, Part V, p 149.

সাহিত্যে মধুসূদনের কবিকর্মের ওপর এত ভাবগর্ভ আলোচনা আর হয় নি। সৌভাগ্যক্রমে এ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জ্ঞানসাধনা

কলকাতায় এসে শশাঙ্কমোহন সার্পেনটাইন লেনের একটি একতলা বাড়িতে বাস করতে থাকেন। এ গৃহকে শুধু বাসভবন নয়, তাঁর জ্ঞানসাধনার মন্দিরও বলা যায়। চারদিকে রাশি রাশি বই, তার মধ্যে জ্ঞানতাপস ও সাহিত্যসাধক শশাঙ্কমোহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জগতের বিভিন্ন ও বিচিত্র সাহিত্য-সরণিতে মানস-ভ্রমণে ব্যাপৃত। আচার্য শশাঙ্কমোহনের কৃতী ছাত্র অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী মশায় কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলছিলেন, "এখনও কার্যোপলক্ষে সার্পেনটাইন লেনে মাস্টার মশাইয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে বাড়িটিকে নত মস্তকে নমস্কার করি।" ছাত্রদের হৃদয়ে এ জ্ঞানতাপসের আসন ছিল কোথায় এ কথাটির দ্বারা তা প্রমাণিত হবে। তাঁর জ্ঞানসাধনার আরও পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধাভাজন জনার্দন বাবু আমাকে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে যখনই কোন পাশ্চাত্য (বিশেষ করে কন্টিনেণ্টাল) সাহিত্য-বিষয়ক বই আসত, তা প্রথমেই পড়বার জন্য বাড়ি নিয়ে যেতেন জ্ঞানতাপস শশাঙ্কমোহন। আর অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষে তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক ডঃ হীরালাল হালদার। জ্ঞানতপস্যায় আত্মবিস্মৃত এ সদালাপী ও আত্মবিস্মৃত লোকটি ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে ছিলেন সমভাবে প্রিয়।[১]

বাণীমন্দির গ্রন্থ রচনার সূচনা

বৃহত্তর সারস্বতসাধনার ক্ষেত্রে এ বিস্তৃত জ্ঞানানুশীলন ও বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্লোকে প্রবেশের প্রয়াস শশাঙ্কমোহনের ব্যর্থ হয় নি। এ সময় বিদ্যোৎসাহী সার্ আশুতোষ এ আত্মবিস্মৃত জ্ঞানতাপসকে কথা প্রসঙ্গে বলেন :

"বাঙালীর চিত্তবিকাশের সাহায্যার্থে সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্যবিষয়ে 'তুলনামূলক' প্রণালীতে অন্ততঃ তিনখানি গ্রন্থ রচিত হওয়া আসন্ন প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়।...অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শের দিক হইতে এমন অনেক কিছু জানিবার আছে, যে সমস্ত বিশ্বসাহিত্য-দরবারে এতদ্দেশের একটা বিশেষ বাণী ও গৌরবময় বিশেষ দৃষ্টির সমাপত্তিরূপে উপস্থিত করা

১ এ সমস্ত তথ্য শ্রদ্ধাভাজন জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে শোনা।

যাইতে পারে এবং যাহা হয়ত ইয়োরোপের নিকটও উপেক্ষার বস্তু হইবে না”।[১]

সার্ আশুতোষের উৎসাহ পেয়ে শশাঙ্কমোহন ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য আলোচনার জন্য একটি বিরাটকায় গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। তারপর 'বিশ্ববাণী' (অনাড়ম্বর কথায় 'ভারতবাণী') নামে একখানি সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক বিস্তৃত গ্রন্থের বস্তু-সংক্ষেপ ও প্রথম কয়েক অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি তাঁর নিকট উপস্থিত করেন। কিন্তু তার আগে সাহিত্যের প্রাথমিক ধর্মদর্শন স্বরূপে (first principles) বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশই আশু কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। এ প্রচেষ্টার ফল হল 'বাণীমন্দির' গ্রন্থ।[২]

বাণীমন্দিরে সমালোচনার আদর্শ

তুলনামূলক পদ্ধতিতে সাহিত্যালোচনায় 'বাণীমন্দির'ই বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় সর্বপ্রথম সার্থক গ্রন্থ (প্রকাশকাল ১৯২৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

“উচ্চতম আদর্শ সাহিত্যের দিকে মুখ্যভাবে পাঠকের রসবোধিকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ (বাণীমন্দিব) পরিকল্পিত” হলেও “সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে এইরূপ গ্রন্থ রচনার বিপত্তিও কম নহে”—সে সম্বন্ধেও লেখক অত্যন্ত সচেতন। কারণ, “জাতীয় সাহিত্যেও যাঁহারা কৃতিত্বগতিকে হয়তো সমগ্র জাতির প্রিয়, যাঁহারা আমাদের অশেষ প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্র, দোষগুণ উভয়ের দর্শন স্থলে তাঁহাদিগকেই বিচারের কাঠগড়ায় তুলিতে হয়। কেন না সাহিত্যে অমরযোনিরই বিচার।”[৩]

বাণীমন্দিরে সাহিত্যতত্ত্ব

এই নিগূঢ় সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক বিরাটাকার গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সাহিত্যসাধক শশাঙ্কমোহন সেন বলেন—

“...সর্বোত্তম পথে পাঠককে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়াই গ্রন্থকারের পরিতৃপ্তি। সকল কাব্যের পরম 'আত্মা' যাহা, সকল কবি-চেষ্টার পরমার্থ যাহা, সহযোগী পাঠককে তাহার প্রপত্তি এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর করিতে পারিলে এই চেষ্টা সার্থক হইবে।”[৪]

১ বাণীমন্দিরের মুখবন্ধ।
২ ,, ,,

সাম্প্রতিক বস্তুতন্ত্রবাদী সাহিত্যাদর্শ প্রচারের পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্কমোহনের সাহিত্যালোচনা যে সহৃদয় পাঠককে বহুকাল পর্যন্ত সাহিত্যের উচ্চ ও সনাতন আদর্শের সঙ্গে সার্থকভাবে পরিচিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাহিত্যচর্চায় মহৎ সাহিত্যের পূজারী যাঁরা তাঁদের নিকট এ গ্রন্থখানির সমাদর চিরকালই থাকবে। এ বৃহদাকার সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ শশাঙ্ক-মোহনকে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় করে রাখবে।

কাব্যরচনা ঃ বিমানিকা

সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনায় আত্মনিমগ্ন থাকলেও শশাঙ্কমোহন এ সময়েও কাব্যসরস্বতীকে একেবারে বিদায় দেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবার সময় তাঁর 'বিমানিকা' নামক কাব্যখানি প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

মৃত্যু

১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সন পযন্ত শশাঙ্কমোহন সুস্থ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়েব কাজে আত্মনিমগ্ন ছিলেন। ১৯২৪ সন হতে অসুস্থতার জন্য তিনি মাঝে মাঝে ছুটি নিতে বাধ্য হন। ১৯২৮ সন পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালযের কাজ করেছিলেন। ১৯২৮ সনে অসুস্থ অবস্থায় উন্মত্ত ছোট ভাই কর্তৃক ছুরিকাহত হয়ে অতি শোচনীয় অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৬ই এপ্রিল, ১৯২৮)। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গভারতী যে একজন একনিষ্ঠ সেবককে হারিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

শশাঙ্কমোহনের সাহিত্য-প্রতিভা সম্পর্কে বিভিন্ন বাঙালী মনীষীর অভিমত

শশাঙ্কমোহনের মৃত্যুর পরে কলিকাতা ও চট্টগ্রামেব বিভিন্ন শোকসভায় তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবা যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন তার মধ্য দিয়ে শশাঙ্কমোহনের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যসাধনায় একাগ্র নিষ্ঠা এবং তাঁর বিরাট সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অ্যালবার্ট হলের ৫ই মে, ১৯২৮ সনে অনুষ্ঠিত শোকসভায় প্রখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"তিনি বস্তুতান্ত্রিক কবি ছিলেন না। ভাবই ছিল তাঁর সাধনা, ভাবই ছিল তাঁর কাছে বস্তু ; তিনি বস্তু ও ভাবের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন নাই।

সংসার যে দিকে চলে তিনি তাহা বর্জন করিয়া অবিসংবাদিত পথে ভারতীয় তিতিক্ষা, ভাব ও প্রীতির পথে—যে পথে কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি বিচরণ করিয়াছেন—পর্যটন করিয়া যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা 'গৌড়জন করিবে পান সুধা নিরবধি'।"

শশাঙ্কমোহনের সাহিত্য-সমালোচনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—

"বঙ্কিমবাবুর পরে শশাঙ্কবাবুর সাহিত্য-সমালোচনা বাংলা ভাষার একটি অপূর্ব দান।...আদর্শের দ্বারা বাস্তবের বিচারই প্রকৃত সমালোচনা, ইহা উঠিয়া গিয়াছে।...শশাঙ্কবাবু তাহা করিয়াছিলেন। তাঁহাব সমালোচনায় স্তুতিবাদ নাই, তিনি নিক্তির ওজনে গুণাগুণের বিচার কবিতেন। তাঁহাব অভাবে বাংলার সাধনাপ্রাণ সাহিত্যে যে ক্ষতি হইযাছে তাহা পূবণ হইবার নহে।" (দৈনিক বসুমতী, ৬ই মে ১৯২৮)

৭ই সেপ্টেম্বব, ১৯২৮, বৌদ্ধবিহার হলে তাঁব মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করবাব জন্য যে জনসভা হয় সে সভায় সভাপতিত্ব কবেন সার্ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—

"আমার মনে হয়, তিনি দার্শনিক দৃষ্টিতে যে কবিতাবলী বচনা কবিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনাব যে পন্থা প্রদর্শন করিযাছেন তাহাই তাঁহাকে অমর কবিয়া রাখিবে।"

শশাঙ্কমোহনের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদক শশাঙ্ক-মোহনের সাহিত্য-প্রতিভার বিস্তৃত পবিচয় দেন। এই পরিচিতি থেকে প্রয়োজনীয অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

"...শশাঙ্কমোহনের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে তাঁহার কাব্যজীবন ও বাস্তব-জীবনের মধ্যে এমন একটা সমসূত্রতা ও সামঞ্জস্য আছে যাহা জগতে বিরল। যেই সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শে তাঁহার জীবনধারা প্রবাহিত সেই আদর্শকে আমরা তাঁহার কাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত দেখিয়া বিস্ময়-পুলকে আত্মহারা হই।

"বিশ্বসাহিত্যের তুলনায় সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শে সাহিত্যের মাপকাঠির অধিকারী বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পরেই ছিলেন শশাঙ্কমোহন এবং শশাঙ্কমোহনের অধ্যয়নজনিত জ্ঞান এত বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছিল যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে আলোচনা বিষয়ে বঙ্কিম-রবীন্দ্র হইতে বেশী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই

রবীন্দ্রপ্লাবিত যুগে রবীন্দ্রনাথের পর্যন্ত শিল্পদোষ প্রভৃতি নির্দেশ করিবার মতন অপূর্ব শক্তি ও পাণ্ডিত্য এক শশাঙ্কমোহনেরই ছিল।

"তাঁহার 'বঙ্গবাণী'র প্রতি ছত্রই তাঁহার গভীর গবেষণা, অনন্যসাধারণ অধ্যয়ন ও অবারিত চিন্তাশক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।...'বঙ্গবাণী' ও 'মধুসূদন' স্বাধীন চিন্তাশীলতা ও গভীর গবেষণামূলক বাংলা সাহিত্যের কোহিনুর বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে হয় না।

"লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহোদয় 'প্রবাসী'তে সত্যই বলিয়াছিলেন যে, 'বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব সাহিত্যের খবর বলিতে পারেন কেবল দুইজন ব্যক্তি—অধ্যাপক ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শশাঙ্কমোহন সেন। বাংলা ভাষায়, শুধু বাংলা ভাষায় কেন, ভারতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যেও এত বড় দার্শনিক সমালোচনা আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা বলা যায় না।

"তাঁহার অপূর্ব সাত্ত্বিকতার জন্য তাঁহাকে Wordsworth-এর সহিত তুলনা দেওয়া হয়। গদ্য আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ সমালোচক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের মত ও পন্থাই বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াই স্বাধীনভাবে কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন।

"তাঁহার সর্বশেষ এবং প্রধানতম কীর্তিস্তম্ভ 'বাণীমন্দির'। এই গ্রন্থে কবি ভারতীয় সাহিত্যের ধারা এবং তাহার উপর বঙ্গসাহিত্যের প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে জগতের বিপুল সাহিত্যের বিচিত্রতার পরিচয় দিয়াছেন।"

শশাঙ্কমোহনের দৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য

শশাঙ্কমোহনের সাহিত্যসৃষ্টি কাব্য, নাটক ও সমালোচনা—এই ত্রিধারায় প্রবাহিত হলেও তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের ভিতর একটা ভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্যকে কখনও ক্ষুণ্ন করে নি। দৃষ্টির গভীরতার তুলনায় তাঁর সৃষ্টির ব্যাপকতা কমই ছিল বলে মনে হয়। ভাষার কৌলীন্য রক্ষায় তাঁর চেষ্টা ছিল সদাজাগ্রত, অথচ প্রাকৃত শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে তিনি একেবারে অনবহিত ছিলেন না।

কাব্যসাধনায় শশাঙ্কমোহন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। প্রাণাবেগের তীব্রতা তাঁর সমস্ত কাব্যসৃষ্টির উৎসমূলে। জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন শশাঙ্কমোহন ভারতীয় দর্শনের নিকট।

সেজন্য কবি সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনাকে একই সূত্রে গ্রথিত দেখেছেন। শশাঙ্কমোহনের কাব্যে দুঃখ ও বেদনাবোধের স্থান আছে, কিন্তু সে দুঃখ তাঁর কবিচিত্তে নৈরাশ্যবোধ এনে দেয় নি। কারণ, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীদের মত শশাঙ্কমোহন বিশ্বাস করতেন দুঃখই দুঃখের চরম পরিণতি নয়। শশাঙ্কমোহনের কাব্য-প্রতিভা আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়াতলে বর্ধিত হয়েও তাঁর কাব্যপ্রয়াস রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি।

শশাঙ্কমোহনের নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হলেও আধুনিকতার নবারুণরাগে রঞ্জিত। 'সাবিত্রী' ও 'বিশ্বামিত্র' নাটকে তাঁর প্রতিভা দীপ্যমান। নরনারীর বলিষ্ঠ প্রেমের স্বরূপ বর্ণনায় এ নাট্যকাব্য বিষয়গুরুত্ব লাভ করেছে। এ নাটকে তিনি যেন ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত স্বরূপ আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন।

সৃষ্টিমূলক ও সমালোচনা-সাহিত্য—উভয় ক্ষেত্রেই শশাঙ্কমোহন তাঁর পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন—প্রাচীন ভারতের কবি-সমালোচক দণ্ডী বা জগন্নাথের মত, বা বর্তমান য়ুরোপের কবি-সমালোচক কোলরিজ ও ম্যাথু আর্নল্ডের মত। এ যুগে রবীন্দ্রনাথও অবশ্য সাহিত্যরচনাব এ উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে পদচারণা করেছেন। কিন্তু সমালোচক হিসেবে ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে শশাঙ্কমোহনের সাধর্ম্য নেই। সমালোচনার দিক দিয়ে ববীন্দ্রনাথ রসগ্রাহী আর শশাঙ্কমোহন বিশ্লেষণধর্মী। সমালোচক হিসেবে শশাঙ্কমোহনের সহমর্মিতা আবিষ্কার করা যায়—ইংরাজ কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে। সমালোচনার প্রকৃতিনির্ণয় প্রসঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ড বলেন—

"A disinterested endcavour to learn and propagate the best, that is known and thought in the world."*

সাহিত্য-সমালোচনায় এই disinterested endeavour-এর ফলেই শশাঙ্কমোহন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শিল্পদোষ প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করেন নি—তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচন-রীতি প্রবর্তনের জন্যও শশাঙ্কমোহন বাংলা সাহিত্যে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 'রসবাদ' এবং 'সত্য, শিব ও সুন্দরে'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন শশাঙ্কমোহন।

---

*M. Arnold, Essays in Criticism—Vol. I.

"তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি একান্তভাবে প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন না। জানতেন—'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্'। তাই তিনি 'পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি' ছিলেন না, অর্থাৎ পরের মুখে কখনও ঝাল খান নি। আবার সমালোচনা-সাহিত্যে 'মিতাক্ষর গাঢ়তা' যে কী বস্তু, তাও শশাঙ্কমোহন দেখিয়েছেন।...তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে কবি-প্রতিভার বিচার করেছেন বলে অনেকেরই দোষক্রুটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। এই সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি কোন দেশের কোন আলঙ্কারিক বা সাহিত্য-বিচারকের মতকে চরম সত্য বলে স্বীকার করেন নি।"—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' (৪ঠা মে, ১৯৫২)

এ হল শশাঙ্কমোহনের কাব্য-নাটক ও সমালোচনা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শশাঙ্কমোহনের বহু মূল্যবান সাহিত্যসৃষ্টি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় বা অপ্রকাশিত থাকায় তার সাহিত্য-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। সেজন্য বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শশাঙ্কমোহনের যে স্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত এখনও তা হয় নি।

শশাঙ্কমোহনেব সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেনেব নিকট শুনেছি, কবির মৃত্যুর পর তাঁব রচিত এক বাক্স পাণ্ডুলিপি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রকাশের জন্য দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে সে বাক্সসহ পাণ্ডুলিপিগুলো নাকি তাঁর গৃহ থেকে চুরি যায়। সেগুলো যথাকালে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্য আবও সমৃদ্ধ হত—এ অনুমান খুবই সত্য বলে মনে হয়।

শশাঙ্কমোহনের পুস্তকাবলী

কাব্য :—

(১) সিন্ধুসঙ্গীত—১৩০২ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ

(২) শৈলসঙ্গীত—১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ

(৩) স্বর্গে ও মর্ত্যে—১৩১৯ বাং, ১৯১২ খ্রীঃ অঃ

(৪) বিমানিকা বা ব্যোমসঙ্গীত—১৯২৪ খ্রীঃ অঃ

(৫) রূপসুন্দরী—(অপ্রকাশিত)

নাটক :—

(১) সাবিত্রী—১৩১৬ বাং, ১৯০৯ খ্রীঃ অঃ।

(২) বিশ্বামিত্র নাট্যকাব্য—(অঞ্জলি পত্রিকায় কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

সমালোচনা :—

(১) মধুসূদন—(গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা, ক. বি. ১৯২২-২৩)

(২) বঙ্গবাণী—১৯১৫ খ্রীঃ অঃ

(৩) বাণীমন্দির—১৯২৮ খ্রীঃ অঃ

২

একজন আধুনিক কবি

সাম্প্রতিক কাব্য-জগতে কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতা আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। কাব্য রচনায় তিনি এখনও সক্রিয়। তাঁর কবিতা সাম্প্রতিক কালের কোন কোন কবির কবিতার মত দুর্বোধ্য নয়, তবে সে কবিতা আধুনিক য়ুরোপীয় কবিদের কবিতার মত অনুশীলন-সাপেক্ষ। আধুনিক কবি তথা নিজের কবি-ধর্ম সম্পর্কে কবি হরপ্রসাদের ধারণা ছড়িয়ে আছে তাঁর 'কবিতার বিচিত্র কথা' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন টুক্‌রো টুক্‌রো মন্তব্যে। তাঁব মতে, জগৎ ও জীবনের প্রতি আধুনিক কবিব দৃষ্টি যেমন অতি-তীক্ষ্ণ ও অতি-সচেতন, তেমনি আধুনিক কাব্য-পাঠককেও জাগ্রত মন নিয়ে সে-কাব্যের রস সন্ধানে অগ্রসর হতে হবে। উক্ত গ্রন্থে কবি মিত্র বলেছেন: 'স্রষ্টা নিবঙ্কুশ নন, পাঠকও প্রয়াসহীন নন। উভয়ের আত্মীযতা চাই, সত্য আত্মীয়তা চাই।' একই গ্রন্থের অন্য জায়গায় তিনি আরো বলেছেন: 'সমকালীন কবি বৃহৎ বিপুল মানব-জীবনের সমস্ত খণ্ডতার মধ্যেও সর্বান্বয়ের সাক্ষী হবেন,—তাঁর কীর্তি তাঁর জ্ঞানের বিপুলতায় নয়,—আনন্দের সৃষ্টিতেই—এইটেই আমাদের কাম্য! তবে আনন্দের ভাষা পাঠকের পক্ষেও শিক্ষণীয়।' আনন্দের ভাষার আবেদন সহৃদয় পাঠকের অন্তরে সহজে সংক্রামণশীল, না তা অনুশীলন-সাপেক্ষ—এ নিয়ে তর্ক আছে। কিন্তু আধুনিক কাব্য-কবিতার মাধুর্য আস্বাদনে পাঠকের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন—এ সম্পর্কে কবি হরপ্রসাদের বক্তব্য স্পষ্ট।

কবি হরপ্রসাদের কাব্য-জগতে প্রবেশ করতে হলে আধুনিক কবিতার বিশেষ প্রবণতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয়ের প্রয়োজন। কারণ আলোচ্য কবির কাব্য-ভাবনাও রবীন্দ্র-ভাবমুক্ত আধুনিক কবির জীবন-চিন্তার পথেই সার্থকতার পথ খুঁজেছে।

পূর্বযুগের তুলনায় আধুনিক জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মনেরও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক কবিকেও বাস করতে হয় বর্তমানের জটিল জগতে। তাই বর্তমানের কবি-মন পূর্বযুগের কবি-মনের মত জীবন-চিন্তার সহজ পথে বিচরণের অবকাশ পায় না। যে জীবন ছড়িয়ে আছে নগরীর রাজপথের

বিরামহীন কর্মতৎপরতায় এবং সীমাহীন ক্লান্তিতে, যে জীবন উত্তেজনা খুঁজছে চায়ের দোকানে আধ কাপ চা খেতে খেতে দেশের বাস্তব সমস্যা সমাধানের নিষ্ফল প্রয়াসে, সপ্তাহের আহার্য-আহরণের বা আনন্দ সঞ্চয়ের আশায় যে জীবন পংক্তিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রেশনের দোকানের দিকে চেয়ে কিংবা সিনেমা-গৃহের সামনে—সে এবড়ো-খেবড়ো জীবন-রূপ জাগিয়ে তুলছে কবির কাব্য-চেতনাকে। স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের ক্রমিক অবক্ষয় কবির মনকে করেছে পীড়িত। জীবন সম্পর্কে নিত্য নতুন প্রশ্ন জেগে উঠছে কবির মনে। ইহ-জীবনোত্তর সুন্দর জীবন-স্বপ্ন কবি-দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত। জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে কবি-দৃষ্টি যেমন আজ খণ্ডিত, তেমনি কবির কাব্যে সে-জগৎ ও জীবনের যে ছায়া এসে পড়েছে সে রূপচ্ছবিও বিচ্ছিন্ন। অনন্ত জীবন সম্পর্কে আশাবাদী ভারতীয় কল্পনা আজ আধুনিক কবির নিকট প্রহেলিকা মাত্র। প্রচণ্ড 'ইহবাদ' এবং জীবনের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে তীক্ষ্ণ 'প্রশ্ন-মনস্কতা' (শব্দটি কবি হরপ্রসাদ-ব্যবহৃত) আজ আধুনিক মননশীল কবির স্পর্শকাতর চেতনার স্তরে প্রবলভাবে আঘাত করেছে। তাই আধুনিক কবির কাব্য-কবিতা সুকুমার ছন্দোনৈপুণ্য ও সুখকাতরতার স্তর অতিক্রম করে উদ্ধত মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে জীবনের বাস্তব অনুভূতির জগতে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-হিল্লোলিত, সুরেলা এবং অধ্যাত্ম-চেতনাময় সূক্ষ্ম কবি-ভাবনা ও কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে যে নতুন কাব্য-চেতনা দেখা দিয়েছিল—তার সঙ্গে পাঠকের মোটামুটি পরিচয় থাকা প্রয়োজন। না হলে কবি হরপ্রসাদের কাব্যের রসাস্বাদন সহজ হবে না।

প্রথমতঃ, এ যুগের কবিতা শুধু যে রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক ভাবাধারামুক্ত তা নয়, এ যুগের কবিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের জীবনদর্শন এবং কাব্যের ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগের কবিরা পাশ্চাত্য আধুনিক কবিদের মত সংহত ভাববিন্যাস থেকে অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করেছেন কাব্যের ভাষার ওপর। তৃতীয়তঃ, এ যুগের কবিতা পাশ্চাত্য কবিদের কবিতার মতই মুখ্যত ইন্দ্রিয় ও ব্যক্তিমন-নির্ভর। চতুর্থতঃ, এ যুগের কবিতা পূর্বযুগের তত্ত্বপ্রিয়তার স্তর অতিক্রম করে প্রবেশ করতে চেয়েছিল সচেতন মনের সহজ অভিজ্ঞতার জগতে। পঞ্চমতঃ, এ যুগের কবিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যের দুরূহতার সমর্থক। দুরূহতার সমর্থনে এ যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় বুদ্ধিদীপ্ত কবি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন : 'কবি বরঞ্চ প্রত্নাস্থিবিদের সঙ্গে তুলনীয়, যিনি টুকরো শিলীভূত কপালে কল্পবিশেষের সমগ্র জীবনেতিহাস দেখেন ; এবং এ কথা স্মরণে রাখলে আধুনিক কাব্যের আপাতবিলগ্ন প্রকাশপদ্ধতি আর প্রলাপের মত শোনায় না, বোঝা যায় স্বয়ংসিদ্ধ বিকল্পনা শুদ্ধ পাকে প্রকারে সাধারণ্যেরই অংশভাক্।' কবি হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর 'কবিতার বিচিত্র কথা'য় তিরিশের দশকের বাংলা কবিতার ভেতর দেখতে পেয়েছেন : 'মনস্তত্ত্ব-সাপেক্ষতা, শব্দদুরূহতা, চিত্র-কল্প, দূরান্বয় ও ক্লিষ্টান্বয় এবং কবিদের আত্মমনোযোগ।' এ ছাড়া এ যুগের কবিতার সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য কবি হরপ্রসাদের চোখে পড়েছে সে হল দার্শনিকতা। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন : 'বিশ্বাস কবি যে বাংলা দেশের বহু বৈচিত্র্যময় কবিতার পথে দার্শনিকতা যত বেশী আন্তরিক এব আগে কখনই সে রকম ছিল না।" এ যুগের কবিতার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সম্পর্কে এ ধরণের উক্তি তর্কাতীত না হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে—একটা দার্শনিক attitude বা ভঙ্গী আলোচ্য কালের বিশিষ্ট কবিদের (যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতির) কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। দার্শনিক ভঙ্গী ছাড়া আর যে-দুটো প্রবণতা এ যুগের কাব্যে ব্যাপক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নতুন যুগ-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিল, সে হল পাশ্চাত্য কবি য়েট্স্ এবং মালার্মেব অনুসরণে রূপকচর্চা এবং প্রতীকতা। একদিকে মননশীল পাশ্চাত্য কবি টি. এস. এলিয়টের প্রভাবে বিকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি দার্শনিক ভঙ্গী, আর একদিকে সে জীবনকে কাব্যে রূপ দিতে গিয়ে হামেশাই রূপকের ব্যবহার এবং প্রতীকতার সাহায্যে ভাবকে ব্যঞ্জনাধর্মী করবার প্রচেষ্টায় এ যুগের কবিতা হয়ে উঠল বাস্তবরহস্য-সচেতন ও দুর্বোধ্য।

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ডে কবি মালার্মেকে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের আদিগুরু বলে অভিহিত করেছেন। এ নতুন কাব্য আন্দোলন ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করে ইংলণ্ডের এবং আমেরিকার বুদ্ধিজীবী লেখক-সমাজে।

য়ুরো-আমেরিকার নতুন ভাবাদর্শের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চিত্র-ধর্মিতা। ভাবচিত্র বা image সৃষ্টি গতানুতিক ধারার পুরাতন কবিতারও একটা প্রধান ধর্ম। কিন্তু পুরাতন কবিদের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন চিত্রসমষ্টিকে একটি অখণ্ড চিত্রে সঙ্গতি দিয়ে একক সুরের সৃষ্টি করা। আধুনিক কবি সে বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে

সঙ্গতির সন্ধান না করে বিচ্ছিন্নভাবেই চিত্রগুলিকে কবিতায় জুড়ে দেন। এ চিত্রগুলি বিশ্লিষ্ট হলেও অখণ্ড ভাবরসসৃষ্টিতে যে অসমর্থ একথা বলা চলে না। কবি-অনুভূতি প্রকাশে চিত্রধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ায় এ ধরণের কবিকে বলা হয় 'ইমেজিস্ট' কবি। এ নবীন চিত্রধর্মী কবিতার প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন : "অসংশ্লিষ্ট ভাবরূপগুলি পাঠকের মনে পর্যায়বদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া অথবা বিশ্লিষ্ট থাকিয়াই, ইউরোপীয় সঙ্গীতের সিম্‌ফনির মত, অনির্বচনীয় অখণ্ড রস সৃষ্টি করিবে। স্থুল উপমা দিয়া বলিতে গেলে ইমেজিস্ট কবি সেই ময়রার মত যে ছানা চিনি ভিয়ান না করিয়া ছানা চিনি অমিশ্রিত কাঁচাগোল্লা বলিয়া যোগান দেয়। ভোক্তাব বসনায তাহার স্বাদ নিশ্চয়ই ভিযান কবা সন্দেশ হইতে স্বতন্ত্র। আরও একটি উপমা দিতে পারা যায়। ইমেজিস্ট কবিতা যেন jigshaw puzzle, এবং সে puzzle-এর সমাধান কবিব মনে, যদি পাঠক কবিব মনে মন মিশাইয়া বুঝিতে পারেন তবেই তিনি কবিতাব মর্ম বুঝিবেন।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬)।

এখানেও আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতাব দুর্বোধ্যতা স্বীকৃত। কিন্তু দুর্বোধ্য বলেই এ শ্রেণীব কবিতাকে আধুনিক কাব্যজগৎ থেকে বিদায় দেওয়া চলে না। আধুনিক কবিতার ভাবকেন্দ্রে দুর্বোধ্যতা এবং অভিনব আঙ্গিক সম্পর্কে পূর্বেও খানিকটা আলোচনা কবা হয়েছে। এখন সে আলোচনাকে আরো স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা যাক :

১. বহির্বিশ্বেব অভিজ্ঞতা কবি-অন্তবে ক্রমশঃ সঞ্চিত হতে থাকে। সে অভিজ্ঞতা যখন অনুভূতি-লোকে উত্তীর্ণ হয় তখন কবিদৃষ্টিতে তার একটা চিত্ররূপ জেগে ওঠে। সে ভাবচিত্রকে যথাযথভাবে কাব্যভাষায় রূপ দেওয়া আধুনিক কবির প্রয়াস। ২. সে ভাবচিত্রকে যথাযথভাবে রূপ দিতে গেলে কবিকে ভাবোচ্ছ্বসিত হলে চলে না। শব্দ-ব্যবহাবে কবিকে সংযত ও সতর্ক হতে হয়। সেজন্য আধুনিক কবিতা অনুভূতি প্রকাশের যথাযথ বাহন হিসেবে অনেকটা গদ্যধর্মী হয়ে উঠেছে। ৩. ভাবপ্রকাশে উচ্ছ্বাসহীনতা ও যাথার্থ্যবোধ আধুনিক কবিব অভিপ্রেত হওযায় সংযত-কথন এবং মৌখিক ভাষাকে আধুনিক কবি অনেক সময় আশ্রয় করে থাকেন। ৪. বহুপ্রচলিত শব্দ ও প্রয়োগের স্থলে আধুনিক কবি নতুন নতুন শব্দ ও প্রয়োগের পক্ষপাতী ৫. ছন্দে গতানুগতিক সুরেলা অভিব্যক্তিও আধুনিক কবিতায় অসমর্থিত; কারণ কাব্য রচনায় আধুনিক

কবির লক্ষ্য ছন্দের দোলা সৃষ্টি নয়, অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ। ৬. আধুনিক কবিতায় ভাবপ্রকাশে চিত্রকল্পের ওপর নির্ভরতাই বেশী। আধুনিক কবিতা প্রচলিত কবিতার মত মাত্রা বা অক্ষর-নির্ভর নয়, অর্থব্যঞ্জনাময় উজ্জ্বল বাক্যাংশের সাহায্যেই কবি একটি অনুভূতিগ্রাহ্য ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করবার প্রয়াসী। সেজন্য আধুনিক কবিতার ছন্দও অসম বা তালকাটা—গদ্যধর্মী। (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ডের ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠায়।)

পাশ্চাত্য প্রতীকী ও শব্দচিত্রময় কাব্যাদর্শকে এ শতাব্দীর ত্রিরিশের দশকে বাংলা কাব্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে কাব্যজগতে যিনি প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেন তিনি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর একখানি কাব্যের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন,—'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট; আমিও মানি যে কাব্যের মুখ্য উপাদান শব্দ।' মালার্মের কাব্যের অন্যতর বৈশিষ্ট্য হল ভাবপ্রকাশে তির্যক ভঙ্গী এবং বর্ণনায় বস্তুসংক্ষেপ। শুধু মালার্মে-শিষ্য পল ভালেরি নয়, সুধীন্দ্রনাথও কাব্যরচনায় সেই একই পথের পথিক। আমাদের আলোচ্য কবি হরপ্রসাদ মিত্রও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত এ নতুন কাব্যরীতির অনুগামী। 'কবিতার বিচিত্র কথায়' তিনিও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: 'কবিতা একরকম সরল বক্রোক্তি! এবং বিশেষ শব্দসমাবেশই কাব্য!'

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি হরপ্রসাদ মিত্রের সাম্প্রতিক কালে রচিত কাব্যের রসাস্বাদনে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত কবিতা থেকে বাছাই করে ১৫ই আগস্ট ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা'। এ কাব্য-সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছেন: ১৯৫২-৫৩ সালে রচিত 'তিমিরাভিসারে'র পর্ব অতিক্রম করে কাব্যজীবনের এ পর্যায়ে তিনি নতুন অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করেছেন। সে কবি-অভিজ্ঞতার স্বরূপ কি কবি তার ইঙ্গিত না দিলেও কাব্যপাঠে অগ্রসর হলে সতর্ক পাঠকের নিকট তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আধুনিক কবির জগৎ বিমিশ্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জগৎ। পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের প্রতি আধুনিক কবির মনে দেখা যায় যেমন একটা তীব্র আসক্তি, তেমনি এ সমস্ত কিছুর প্রতিই সে মনেই দেখা যায় একটা নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততা। কবি হরপ্রসাদের কবিতায়ও এই অতিস্পষ্ট ইন্দ্রিয়সচেতনতা

ও দার্শনিক-সুলভ নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত ভাব একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে সে কবিতাকে সাম্প্রতিক কাব্য-জগতে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়চেতনার প্রভাবে অপ্রত্যক্ষ সুদূরের ভাব ও বস্তু থেকে প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অধিক। প্রত্যক্ষের প্রতি আকর্ষণ যেমন কবিহৃদয়ে তীব্র, তেমনি বিকর্ষণও যে নেই—এ কথা বলা চলে না। এ আকর্ষণ-বিকর্ষণের অনিবার্য পরিণতি কবির বস্তুপ্রীতি ও বস্তুভয়। এ বস্তুনির্ভরতার ফলে জগতের তুচ্ছ মহৎ—সমস্ত দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা কবির নিকট একান্ত হয়ে দেখা দেয় এবং ব্যঙ্গপরায়ণ হয়ে ওঠেন তিনি অতি-সূক্ষ্ম দার্শনিক মনোভাবাপন্ন তত্ত্বদর্শী জীবনবাদীদের প্রতি। 'সাম্প্রতিক স্ব-নির্বাচিত কবিতা'র অন্তর্গত 'এক মর্জির ত্রুটি' কবিতায় কবির এই জীবনদৃষ্টির অভিব্যক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অনন্ত জগৎ ও জীবনে বিশ্বাসী কবি-শিল্পীর প্রতি কবি হরপ্রসাদের সকৌতুক কটাক্ষ পরম উপভোগ্য রূপ লাভ করেছে উক্ত কবিতার প্রথম অংশে :

'আমি যে শিল্পী, আমার মধ্যে'—
কবি বললেন উদার গন্ধে :
'আছে যে গভীর সেই ত মান্যবর !
কারণ, বাইরে কত কিছু ঘটে,
কত না আঁচড় জগতের পটে,
সব ফেলে যাই—
অমৃতেই নির্ভর !'
আমি বললুম, 'অমৃত কোথায়
ক্ষয়ে, ভাবনায়,—প্রেমের ক্ষুধায় ?'
তিনি বললেন : 'সে ত বলবার নয় !'
তারপরে এক বিস্মিত যতি
চুকিয়ে গিয়েছে তর্কের মতি।
এখন যা আছে—
সে শুধু বস্তুভয় !

এখানেই কবি হরপ্রসাদের আধুনিক মনোবৃত্তির সোচ্চার ঘোষণা। যে সীমাহীন জগৎ ও অনন্ত জীবন-স্বপ্নে পূর্বযুগের অধ্যাত্মবাদী কবি মুগ্ধ, আধুনিক

বস্তুবাদী কবির নিকট সে-জগৎ একটা প্রহেলিকা বা মায়া মাত্র! প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণবিলাস পূর্বযুগের কবি বা আধুনিক গতানুগতিক ধারার কবি-মনের মত কবি হরপ্রসাদের মনকেও মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য-সচেতন কবি হিসেবে সে রোমান্টিক স্বপ্নলোকে বিচরণ করে তিনিও তৃপ্তি পান। উক্ত কবিতার দ্বিতীয় অংশে কবি হরপ্রসাদের নিসর্গ-বর্ণনা নিখুঁত পর্যবেক্ষণ-নির্ভর সৌন্দর্যানুভূতির পরিচায়ক :

মিনার, গম্বুজ, বাড়ি, রুক্ষ লাল, ফ্যাকাশে সবুজ,
লোকারণ্য পার হয়ে আরো দূরে নতুন রাস্তাতে—
পৌছেই দেখলুম নদী,—সুখী মাঝি,—ছড়ানো আকাশ,
সজনে ফুলেল মূর্তি,—মেথিবন,—বেগুনি কাঞ্চন,
মনের গানের মীড়ে ঝিরি ঝিরি অড়রের ক্ষেত—
যেন সে স্বপ্নই, যেন কোন এক বাসুদেবপুর!

কিন্তু এ নিসর্গবিলাস পরমুহূর্তেই অন্তর্হিত হয় 'প্রশ্নমনস্ক' কবি হরপ্রসাদের মন থেকে যে মুহূর্তে সে মন সচেতন হয়ে ওঠে সমকালীন বাস্তব-জীবনপরিবেশ সম্পর্কে :

তেমনি প্রশান্ত হোতো যদি সব প্রাপ্তি ও অভাব
রাস্তার সমস্ত ভিড, ঘরে ঘরে সমস্ত ছলনা—
ক্ষয়ে, ভয়ে, বঞ্চনায়, রোগে, শোকে, প্রেমের ক্ষুধায়
যদি বৃদ্ধি হোত শান্ত সপ্তগ্রাম ছায়ার আরাম—
অর্থাৎ, নিসর্গভূমি হোত যদি মানবজীবন—
তা হলে ফুটতুম ঠিকই প্রকৃতির সজনে-কাঞ্চন!
কিন্তু তা হয় না, আহা সে-কথাটা সকলেই জানে,
বাড়ী ফিরে মনে মনে বোঝা গেল সেই সাদা মানে॥

[এক মর্জির ছুটি॥ দুই॥]

বর্তমান জীবন-জটিলতা কবির বোধির মূলে নাড়া দিয়েছে। ফলে নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পৃথিবীর বুকে মানুষের যে বীভৎস ছবি তিনি দেখতে পেলেন সে ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর একদা-লালিত সৌন্দর্যস্বপ্নকে দিল নিঃশেষে অবলুপ্ত করে :

জমেছে বোধের মূলে জীবনের জটিল জঞ্জাল—
যেতে যেতে মনে হয়; তারপর ফটক পেরিয়ে

আরো দূরে যাওয়া, যাওয়া না দেখায়
প্রত্যহ যেমন !
নীল জল, রাঙা মেঘ, সাদা পাখি—
কোথায় কোথায় !
হঠাৎ গলিত কুষ্ঠ পা নাড়ছে দেখলুম রোদ্দুরে
হে জননী বসুন্ধরা,
তোমার আশ্চর্য কোল জুড়ে !   [জননী]

মন থেকে রোমান্টিক স্বপ্ন বিদায় নেওয়ার ফলে বর্তমান সৌন্দর্যপ্রীতি বা অতীত সুকুমার কল্পনা কবির কাছে আজ অর্থহীন ঠেকছে। মানব-সভ্যতার বিকাশের ভেতর কবি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চিত ধ্বংসের ইঙ্গিত :

—অর্থাৎ এই মানুষে জগতে মেলে না, মেলে না, মেলে না আর।
বাতাবি, কোকিল, আকাশ কিংবা মাটির টবেতে পাতাবাহার।
মৃত উপমান, শ্রান্ত কবিতা, জরতী রমণী, শূন্য স্মৃতি।
মেঘদূত আর শকুন্তলারা প্রত্নশালার গলিত চিঠি ॥
আমরা রাস্তা উজিয়ে এসেছি অঙ্কুর থেকে বীজের দিকে।
বিকাশ মানেই বিনাশ বন্ধু, সোনার তরীতে কে থাকে টিঁকে ?
মনে ঝিমধরা বিশাল শূন্য, আদিম প্রৌঢ় অন্ধকার—
মৌনই একা মুক্তসত্ত্ব,
সে গহনে নেই বন্ধদ্বার।   [বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে]

কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে কবির মনের জগৎ বিমিশ্র ভাবের জগৎ। সে জগতের একদিকে নৈরাশ্যের কালো-ছায়া, আর একদিকে ক্ষণিক আশার বিদ্যুৎ-দীপ্তি। বর্তমানে জগতের ভাঙা-গড়ার দিকে চেয়ে কবির মনে যখন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা-বোধ জেগে ওঠে, তখনই প্রকৃতির বুকে হঠাৎ ডেকে-উঠা কোকিলের কণ্ঠ, প্রকৃতির সৌন্দর্য-সৌরভ তাঁর বোধের জগতে এনে দেয় একটা অনির্দেশ্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত :

তবু বিশ্বাস করি না তাকেও
—কোথায় লুকিয়ে কোকিল ডাকে !
বছরে বছরে ফুলে, সৌরভে, স্বপ্নে আশায় বাতাবি জাগে

ঋতুর বদল বোধের আদল কেবলই ভাঙছে—

কেবলই গড়ে—

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র—

কী তার পরে? [বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্তে]

বর্তমান বিজ্ঞান ও যুক্তির জগতে মানবমনের সুকুমার অনুভূতি ও ভাবোচ্ছ্বসিত আবেগ মানুষের কাছে মূল্য হারাতে চলেছে। বুদ্ধিজীবী মানুষ হয়েছে আজ জড়-জগতের দুর্জ্ঞেয়তার রহস্যসন্ধানী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই—বুদ্ধির সাহায্যে বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ যখন দেখছে চারদিকে নিঃসীম অন্ধকার, মানুষের অনুভূতিশীল অন্তরে জাগছে তারই অজ্ঞাতসারে সৌন্দর্যের স্বপ্ন। একদিকে বুদ্ধিজীবী মানুষের মনে চরম বিশ্বাসহীনতা, আর একদিকে হৃদয়জীবী মানুষের মনে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরম আশ্বাস—আধুনিক কবি হরপ্রসাদের মনে জাগিয়ে তুলছে পরম বিস্ময়:

দিচ্ছে তবু অসীম চমক

দুর্জ্ঞেয় এই চতুর্দিক।

আকাশ বোনে মনে মনে

সূর্যমুখী ফুলের বীজ!

* * *

অণু-পরমাণুর লড়াই

ডাইনে বাঁয়ে উচ্চ চড়াই

আমাদের এই সমতলের বিশ শতকের অন্ধকার

ফুটল হঠাৎ সূর্যমুখী

এইখানে প্রাণ মহাত্মার! [মহাত্মা]

প্রাচীন বিশ্বাসের জগৎ আজ ভেঙেই চলেছে, সেই ভাঙনের ঢেউ কবির চিত্তভূমিকে আঘাত করে তাঁর মনে জাগিয়ে তুলেছে এক অস্থির চঞ্চলতা:

আমরা যেখানে আছি, সে বন্দর দুর্জয় ঢেউয়েতে

কেবলই ভাঙছে আর ভাঙবার শব্দেতে, নেশাতে

রক্তেরও প্রশান্তি নেই, মজ্জাও অস্থির বিষে বিষে! [লক্ষ্য]

কিন্তু আধুনিক জীবনের অবক্ষয়ের অনুভবটাই কবি হরপ্রসাদের জীবন-সম্পর্কীয় চরম উপলব্ধি নয়—জীবনের এই দুঃসহ অবস্থা অতিক্রম করে মানুষের

মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ একদিন হয়ত উত্তীর্ণ হবে আশা, বিশ্বাস ও প্রেমের জগতে—আধুনিক মানুষের এ মিশ্র বোধের জগৎই হল কবি হরপ্রসাদের কাব্যজগৎ :

প্রাণের নিশ্চিত লক্ষ্য ধ্রুব এক ! উত্তরণ সুখ।
অন্তরে তাকেই চাই যদিও এ-প্রণয় দুর্মুখ। [লক্ষ্য]

আত্মার এই উত্তরণ-স্বপ্নই কবি হরপ্রসাদকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে আধুনিক একান্ত সংশয়বাদী কবিসমাজ থেকে।

হরপ্রসাদ মিত্র আধুনিক কবি, কিন্তু তাঁর কবিতা অতি-উগ্র আধুনিক কাব্যের আঙ্গিক ও ভাবমুক্ত। তাঁর কবিতা শুধু ছন্দনির্ভর নয়, বহুক্ষেত্রে সুরেলা। এ ছাড়া কবি হরপ্রসাদের কাব্যের ভাববস্তুতে এমন একটা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়—যা উগ্র আধুনিকতাবাদী কবির কাব্যে অনুপস্থিত। 'একটি আরশোলার মৃত্যু' নামক কবিতায় দেখা যায় কবি-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সনাতন ভারতের জীবন-চিন্তা—যে চিন্তা মানব-অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয়তায় বিশ্বাসী :

অদৃষ্টকে যায় না দেখা,—দেখার দূর
বড়োই কাছে, বড়োই ছোট, বড়োই ক্ষীণ।
তা ছাড়া এই একজীবনের বিস্তারে—
যা ছোঁওয়া যায়, সে ত কেবল কয়েকদিন !

পরম পুরুষের চরম রহস্যময় অস্তিত্ব উপলব্ধিতে কবি হরপ্রসাদের মন ভারতীয় :

সবরমতী, পণ্ডীচেরী, বেলুড় মঠ—
যেখানে যাও শেষের সে-জন ধুন্ধুমার।
[একটি আরশোলার মৃত্যু]

কবি হরপ্রসাদ মিত্র মার্কসবাদী কবির মত ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন নন। সহায়হীন মানুষের মনে দেখা যায় ভগবানের জন্যে উদগ্র প্রতীক্ষা, আর তত্ত্বদর্শীর মনে সে রহস্যময় সত্তার স্বরূপ উপলব্ধিতে 'ব্যাকুল জিজ্ঞাসা'। কবি হরপ্রসাদের এ ভগবৎ-অস্তিত্বে বিশ্বাস চমৎকার আধুনিক কাব্যরূপে পেয়েছে হাসপাতালের পটভূমিকায় 'ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে' নামক কবিতায় :

'যেখানে তিনি শুধু কল্পনা'—এই সত্যের ওপরে
'তিনি আছেন' এই দুরাশার অসীম, অসীম, শূন্য—

সেই অনিশ্চিত অনুভূতিলোকে
একটি ভ্যাপসা বিকেলের পটে
চিরকালের সত্য উঠেছিল মূর্ত হয়ে।
স্বামীজিকে দেখলেই সে কথা মনে পড়ে
আলমোড়া নয়, ইমারজেন্সি ওয়ার্ড।

[ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে]

সৃষ্টির বিরামহীন প্রবহমানতায়, আত্মার দুর্গমতায় এবং জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তায় কবি হরপ্রসাদ বিশ্বাসী—ভারতীয় দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে কবিমনের যোগসূত্র এইটুকু। এখানেই যদি কাব্যভাবনা পরিণতি লাভ করতো, তাহলে তাঁকে গতানুগতিক ধারার কবি বলতেও বাধা ছিল না। কিন্তু কবি হরপ্রসাদের আধুনিক মন আত্মপ্রকাশ করেছে সৃষ্টিকে তার সার্বিকরূপে দেখবার মনোবৃত্তির মধ্যে। সে রূপে জগৎ ও জীবনের চিরন্তন অনশ্বর রূপ যেমন সত্য, তেমনি সত্য মানুষের ক্ষণিক অনুভূতি এবং জগতের ধ্বংসশীল রূপ। সৃষ্টির এই ক্রমিক ধ্বংসের দিকে চেয়ে অসহায় মানুষ নিজেকে অনুভব করছে আজ নিঃসঙ্গ। মানুষের এই নিঃসঙ্গ মনোভাবকে লক্ষ্য করে কবি বলেন :

তেমনি নিঃসঙ্গ রাজা!
রাজা, তুমি কেঁদ নাক আর।
ফুল, ঘাস, আবর্জনা—
সৃষ্টি আর সৃষ্টির সংহার
সমস্ত মিলিয়ে দেখো।
চলো, পথে যাই।

[ঘর থেকে পথে]

'ঘর থেকে পথে বেরিয়ে' কবি প্রথমে দেখলেন নিঃসঙ্গ মানুষকে, তারপরে পথে যেতে যেতে কবি যে বিশ্বকে দেখতে পেলেন সে বিশ্বের জীর্ণ রূপ কবির চেতনাকে ক্লিষ্ট করে তুললো। কিন্তু জগতের এ দৈন্য ও মালিন্যের মধ্যেও মানব-অন্তরে হঠাৎ-প্রেমের আবির্ভাব যে সৃষ্টিকে সজীব করে রেখেছে কবি-হৃদয়ের এ সুন্দর অনুভব চমৎকার কাব্যরূপ পেয়েছে অদ্ভুত চিত্রকল্পের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতাংশে :

মর্তে জটলা, কান্না কষ্ট, ঝগড়া, দীনতা, কতো যে কালি!
যা-কিছু দেখেছি,—দেখতে-দেখতে বিঁধছে দুচোখে চোখেরই বালি,

এবং বুড়োটা, ছেলেটা, মেয়েটা জীর্ণ জীর্ণ সে-বিশ্বেতে—
হঠাৎ একশো পায়রা উড়লো—
প্রেম যে তেমনি আকস্মিক হে !

[পথে যেতে যেতে]

বর্তমান বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের যুগে 'জ্ঞানেব ইঁদুর' মানুষের 'বিশ্বাসের মূলে' আঘাত করেছে। তীক্ষ্ণ নখদন্তেব্ সাহায্যে মানুষের 'প্রাণের গানের দোলা', 'প্রেমের সুবাস', আশার আশ্বাস, সৌন্দর্যপ্রীতি এমন কি 'কল্যাণস্বরূপ' 'ঈশ্বর যিনি'—তাঁকেও বিবর্ণ ও মলিন করে তুলেছে বিজ্ঞান ও যুক্তিপ্রভাবিত মানুষের এ বিশ্বাসহীনতা। সুন্দর, সত্য ও কল্যাণের স্বরূপ সম্পর্কে যুক্তিবাদী মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সে সীমিত জ্ঞানের পরিধি নিযে আত্মস্ফীত মানুষ সত্য ও নিত্য স্বরূপেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। মানুষেব এ নাস্তিক্যবুদ্ধি আমাদের আলোচ্য কবি হরপ্রসাদের মনেব নদীতেও ঢেউ তুলেছে। সে ঢেউয়ের আঘাতে তাঁর প্রাণের সহজ সরলতা ভেসে যাওয়ার উপক্রম হযেছে। কিন্তু গভীর বাত্রে সমস্ত প্রাণিজগতের চাঞ্চল্য যখন থেমে যায তখন নদীর বুকে সে চির-পুরাতন চাঁদের হাসি দেখে নিত্যসুন্দব ও সত্যস্বরূপের প্রতি তাঁব মনেব ভূতপূর্ব বিশ্বাস আবার ফিরে আসে। 'বানভাসি খাল থেকে' কবিতায় চিরন্তন মানবেব শুভ আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতি কবি হরপ্রসাদের বিশ্বাস তাঁর কবিকর্মকে স্বাতন্ত্র্য দান কবেছে আধুনিক নিরীশ্বরবাদী ও ভঙ্গীপ্রধান সাহিত্যকর্ম থেকে।

কবি হরপ্রসাদ মিত্রেব আর এক শ্রেণীর কবিতায় দেখা যায় নাগরিক জীবনেব নানা বৈচিত্র্য সম্পর্কে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ-শক্তিব পরিচয় এবং সে জীবনের ভালো মন্দ সব কিছুকে মিলিযে নগরীর প্রতি কবি-অন্তরেব তন্ময ভালোবাসা। এ নগর-প্রীতিতে কবি আধুনিক কোন কোন ইংরেজ কবির সগোত্র। নগর-জীবনের নানা টুকরো ছবির মধ্যে তিনি যেমন দেখেছেন মানব জীবনের বিচিত্র রূপ, তেমনি প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সংস্পর্শহীন এ অপ্রাকৃত জীবন-পরিবেশেও মাঝে মাঝে চিরন্তনী প্রকৃতির অনন্ত উৎস থেকে খসে আসা একটি আশ্চর্য সুন্দর স্পর্শ বা সে-স্পর্শের ইঙ্গিত কবি-প্রাণকে আনন্দ-চঞ্চল করে তোলে। এখানেই বিদগ্ধ নাগরিক কবি হরপ্রসাদের আধুনিক মনের পরিচয় দীপ্যমান। কিন্তু এখানেই তাঁর প্রকৃতি-সচেতন মনের পরিচয় সমাপ্ত নয়। তাঁর অতি-সূক্ষ্ম মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে নগরসীমার বাইরে বিস্তৃত অবারিত প্রকৃতির বিপুল ও বিচিত্র

বর্ণালী-বৈভব। নগর জীবনের হাজারো তুচ্ছ ছবিকে কবি কখনও স্থাপন করেছেন এই বিচিত্র বর্ণময়ী বহিঃপ্রকৃতির পটভূমিকায়, আর অনুভব করেছেন সে চিরন্তনী সত্তা থেকে স্বীয় মনের বিচ্ছিন্নতাকে। আবার কোন সময় দেখি ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ পরিচিত বহিঃপ্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য কবিমনের রুদ্ধ কপাট খুলে তাঁর মননধর্মী কাব্যচেতনার উত্তরণ ঘটিয়েছে।

নগরীর বাস্তব জীবন বর্ণনায় কবি হরপ্রসাদের পর্যবেক্ষণ-নির্ভরতা প্রায় আণুবীক্ষণিক। যেমন :

বুড়োটা খোঁড়ায়, ছেলেটা চেঁচায়, ওগো ডাক্তার
মেয়েটা ভোগে।
পোকারা এসেই বাঁচছে, বাড়ছে,—ফলেরা পেকেই
পচছে রোগে।
লেবুর খোসাতে বিড়ির টুকরো, অবাস্তবের এই যে গতি—
[পথে যেতে যেতে]

মেয়েরা নিচ্ছে জল এই-যে এ বারোয়ারী কলে,
ভাঙা বাটি নেড়ে-নেড়ে পথ বুড়ো ভিখারিটা চলে,
পাড়ার রসিক যুবা লুটিয়েছে কালাপাড় ধুতি,
বিকেল উজ্জ্বল করে হেঁটে গেল যে সব যুবতী,
আগুন নেভানো গাড়ী দমকল গেল দ্রুতবেগে
[নিমন্ত্রণ]

দুটাকা হাওলাত ছিল, বেড়ে বেড়ে হয়েছে একুশ—
ছেলেটা ধুঁকছে—বউ ভুগছেই,
বাসাটাও খাঁচা।
রাস্তায় বটের ছায়া, আকাশেতে বাতাসের স্রোত,
ভেতরে আচ্ছন্ন সব
জীবনের হাসি, খুশি, রোদ। [স্মৃতি, বিস্মৃতি]

পথের পাশে সে ছোট্ট দোকান,
মারবেল-টপ টেবিল জুড়ে—
আমরা ছিলুম,—আরো একজন
চায়ের দোকানে মির্জাপুরে।

চা খেতে খেতেই ছোট্ট দোকানে
লেগেছিল সে যে কী চুলোচুলি
মালিকে চাকরে খিস্তি খেউড়ে
উলুড়ি ধুলুড়ি কী ধুলোধুলি। [চায়ের দোকানে]

আধুনিক নগর-জীবনের এমনি আরো বহু টুকরো ছবি বাস্তবতায় নিখুঁত! ইট-কাঠ-ঘেরা নগর-পরিবেশে বসন্তের হরিৎ বর্ণবিলাস প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য। সে হলুদের আভাস শুধু দেখা যায় ফাল্গুন মাসের শুভ বিবাহের হলুদ খামের চিঠির গায়ে :

যেখানে নিবাস আজ,
—সেখানেও আছে লতাপাতা
ফাল্গুনে হলুদ খামে চিঠি আসে শুভবিবাহের
সানাই ভাঙায় ঘুম সভা জমে গোধূলি-লগ্নেতে।
[নিমন্ত্রণ]

উক্ত প্রকৃতি-বর্ণনায় আধুনিক কবি-মনের প্রকাশ স্পষ্ট। জীবনজটলা-পূর্ণ নগরীর বুকে বিকেল বেলাকার শান্ত স্নিগ্ধ আমেজ কবি-প্রাণে এনে দেয় একটা সুকুমার শান্তির প্রলেপ। এই স্তব্ধ শান্তিতে বসে কবির সমস্ত কথা যেন ফুরিয়ে যায় :

একটু ঠাণ্ডা হাওয়া
তারাদের দিকে চাওয়া
তার বেশী নেই কিছু বলবার।
[বিকেল সম্পর্কিত]

কিন্তু এ শান্তির অনুভূতিও কবিচিত্তে ক্ষণিক। নগর-জীবনের যে রূপ কবি-অন্তরকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করে সে হল সে অপ্রাকৃত পরিবেশে মানুষের খণ্ডিত রূপ। কিন্তু এ ছেঁড়া কাটা জীবন পশ্চাতে ফেলে কবি যখন উন্মুক্ত-প্রসার বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে আসেন তখন তাঁর সৌন্দর্যদৃষ্টি খুলে যায়। নগর-প্রকৃতির তুলনায় পল্লী-প্রকৃতির উৎকর্ষ বর্ণনা বাংলা কাব্যে নতুন না হলেও কবি হরপ্রসাদের আধুনিক ভঙ্গীময় বর্ণনার গুণে সে নিসর্গ-সম্ভোগ চমৎকার কাব্যরূপ লাভ করেছে :

কাল ত ছিলাম যেখানে—সেখানে
মানুষের ছেঁড়া মূর্তি—
বাঁ হাতে বাজার ডান হাতে শুধু
ভিক্ষা, ভিক্ষা, ভিক্ষা।

মনেও ভাবিনি আসব এ পথে
চাঁদনীতে ফাঁকা রাস্তায়
মুখে ঝিম্ ঝিম্, দেহ-মন-প্রাণ,
নদী, গাছ, পথ, রাত্রি—
দুধারে কি যেন চাদর জড়ানো
একা একা গ্রাম স্বপ্ন!

[বালুরঘাটের পথে]

এ নগরপরিবেশমুক্ত প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য-সম্ভোগে নাগরিক কবি হরপ্রসাদ কিন্তু আশ্চর্যভাবে স্বচ্ছন্দ, সহজ,—তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ মন অনাবিল খুশিতে স্পন্দমান :

এই আলো, এই গাছ, এই পাখী আকাশের তাঁবুতে—
এসেছে সবাই শুধু থরো থরো দুদিনের খুশীতে।
আমিও তেমনি এই বাড়ি-গাড়ি-ভাবনার ভিড়েতে
হয়তো আর এক গাছ
হয়তো আরেক পাখী মাত্র। [দুঃখ]

ওরা ডেকে চলে যায়
মেঘ পাখি আলো যায়
বেলা যায়!
সোনার কলমে রোজ কবিতা লিখেই যায় সন্ধ্যা।

[জানালা]

কবি হরপ্রসাদ প্রশ্নমনস্ক, এবং পরিবেশসচেতন বাস্তবতাবাদী কবি সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য-সচেতন মন রোমান্টিক চেতনা-বিমুক্ত নয়। অতীত জীবনের রোমান্টিক সৌন্দর্য-স্বপ্ন তাঁব বাস্তব-সচেতন মনেও বিভ্রমের স্মৃষ্টি করে। অপূর্ব চিত্রসম্পদের সমাবেশে সে অতীত জীবনের সৌন্দর্য-ছবি অঙ্কিত করেছেন কবি হরপ্রসাদ :

হরিতকপিশ, কদমকেশর, নন্দনীকলি, জামের বন,
বেত্রবতীর ঊর্মিভ্রূকুটি, প্রথিত বিদিশা, নারীর মন,

রাজা উদয়ন, দূর অবন্তী, ধূপের ধোঁয়াতে সুরভিচুল
—আজকে আষাঢে আন্-দুনিয়ায় মনের মধ্যে
—সে সব ফুল
ফুটছে এবং ফুটেই ঝরছে, কুঁড়িতে কাদায় কী বিভ্রম······
[মেঘের নীচে আমরা]

অতীত স্মৃতিচারণার ফলে কবির মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে যে একটি সৌন্দর্যময় জগতের দ্বার উন্মোচিত হল শুধু তাই নয়, বিস্মৃত অতীত আদিম অরণ্যজীবনের সুস্থ সবল প্রাণপ্রবাহের তুলনায় আধুনিক হিসেবী সুবিন্যস্ত জীবন তাঁর কাছে মনে হয় আকর্ষণহীন। এ দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে কবির কল্পনা হল সুদূরপ্রসারী, প্রকাশভঙ্গীতে এলো সবলতা, ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রকল্প ব্যবহারে কবিতা হল নবতর মূল্য-সমৃদ্ধ। 'দোর খুলি' কবিতায় প্রত্যয়ান্বিত কবির এই সবল মনোভাব চিত্রকল্প ও শব্দসমাবেশনৈপুণ্যে চমৎকার কাব্যসুন্দর রূপ পেয়েছে :

কোন খরসান বর্শাফলকে নাম লিখে
কোন টান-টান ছিলাতে আমার মন ছিল।
সেই আমি—এই জীবনের কারুকার্যে আজ
পোষমানা প্রাণ, সভ্যমানুষ
সঞ্চয়ী।
ছেড়েছি আমার মুক্ত দিনের আরণ্যক,
শান্ত, খাঁচায়
ঠনঠনে কালি জপ করি। [দোর খুলি]

কিন্তু সে সুস্থ জীবন-স্বপ্ন বাস্তবতার আঘাতে আজ কবিদৃষ্টি থেকে চিরতরে অন্তর্হিত। সে জীবনসন্ধানে কবির সমস্ত প্রয়াস আজ ব্যর্থ :

কোন ঝম্ ঝম্ বিষ্টি ঝরার উৎসবে,
কোন দাউ দাউ আগুন-মেখলা রাত্তিরে
কোন খরসান বর্শাফলকে, খড়্গে, ভল্লে—
কোথায় সে ?
স্তব্ধ মহলে দুহাতে কঠিন
দোর খুলি। [দোর খুলি]

এ চিত্র রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃত অতীত যুগের সৌন্দর্য-প্রিয়া

মালবিকা থেকে বিচ্ছেদের করুণ বেদনাময় চিত্র নয়। এ চিত্র মানুষের একদা-বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকে আধুনিক ক্লিষ্ট ও দুর্বল জীবনচেতনায় বিবর্তনের ছবি। এখানে 'প্রশ্নমনস্ক' আধুনিক কবি হরপ্রসাদেব মননধর্মী কাব্য-ভাবনার পরিচয় স্পষ্ট। কবির মন বর্তমান জীবনের পঙ্গুতা উপলব্ধিতে ক্লিষ্ট। কিন্তু সে মনের সামগ্রিক পরিচয়-প্রসঙ্গে 'এহ বাহ্য'। কবি হরপ্রসাদের মিশ্র জীবনানুভূতিতে অতীত স্মৃতি যেমন সত্য, তেমনি সত্য বর্তমানের বাস্তব। জীবনের খণ্ডরূপ যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার পূর্ণরূপ। ক্ষণিক অনুভূতি যেমন সত্য, তেমনি সত্য চিরন্তন জীবন-উপলব্ধি। কবি হরপ্রসাদ এ বিমিশ্র ভাবজগতের অধিবাসী। বর্তমান নাস্তিক্যবাদেব যুগে বাস করেও তিনি 'ইহবাদসর্বস্ব' নাস্তিক নন, আবার তাঁব আস্তিক্যবুদ্ধিও পূর্ব যুগেব মত অন্ধ নয। তাঁব কল্পনা-জগতে বর্তমান পৃথিবীর কালো ছাযা, আবার ভবিষ্যৎ পৃথিবীব আশার আলো। এ মিশ্র ভাবকল্পনার প্রভাবে তার কাব্যের ফর্ম-ও কোথাও গদ্যধর্মী, আবার কোথাও ছন্দোময়, ধ্বনিময। এজন্যই বলছিলাম, সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে কবি হরপ্রসাদের কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুচিহ্নিত। শুধু তাই নয়, তাঁর কাব্য-জগতে প্রবেশ করে আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি একটা সত্যিকাবের আধুনিক কবি-মনের।